# মুক্ত পাখী

উপন্যাস

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

দুই টাকা

ডি, এম, লাইব্রেরী
৬১নং, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীমতী কোহিনুরমণি কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

বৈশাখ, ১৩৩২

কার্ত্তিক প্রেস
২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সাহিত্য-রসিক বন্ধু

শ্রীমান্ অমরেশ শিকদার

প্রীতিভাজনেষু

ভাই অমরেশ,

আমার লেখা তোমার ভালো লাগে; আমার বই তোমার কাছে আদরের জিনিষ। মুক্ত পাখীকে তুমি সোনার চোখে দেখেছো। ছাপার অক্ষরে এ বইখানিকে দেখবার আগ্রহও তোমার অসীম। তার উপর তোমার মন অন্ধ সংস্কার-পাশ থেকে কতখানি মুক্ত, কি সহানুভূতিতে ভরা, আমি তা জানি। তাই এ বইখানি তোমায় দিলুম।

সৌরীন্দ্র

…সংসার কঠিন বড়, কারেও সে ডাকে না,—
কারেও সে ধরে রাখে না…
যে থাকে সে থাকে, আর যে যায় সে যায়,
কারো তরে ফিরেও না চায়!…

… … … …

তোমার ব্যথা, তোমার অশ্রু তুমি নিয়ে যাবে,
আর তো কেহ অশ্রু ফেলিবে না!

—রবীন্দ্রনাথ

# পূর্ব্ব কথা

মুক্ত পাখী প্রকাশিত হইল।

দীপ্তি-চরিত্রের আভাষ পাইয়াছি গ্রাণ্ট-আলেনের লেখা The Woman Who Did উপন্যাসের হার্ম্মিনিয়ার চরিত্র হইতে। গোড়ার দিকে এ চরিত্রের ব্যঞ্জনায় হার্ম্মিনিয়া-চরিত্রের অনুসরণও করিয়াছি কতকটা। অরুণ উক্ত উপন্যাসের মেরিক-চরিত্রের ছায়ায় রচা। তবে উপন্যাসের গতি; এবং দীপ্তি-চরিত্রের পরিণতি প্রভৃতি সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র নিজস্ব ভঙ্গীতেই রচনা করিয়াছি। ক্ষিতীশ, বিমল, প্রভা, হিরণ প্রভৃতি চরিত্র কাহারো ছায়ায় রচা নয়—সেগুলি সম্পূর্ণ মৌলিক। তাদের ছাঁচ আমারি তৈয়ারী। অর্থাৎ এ বইয়ের outlineএর জন্য মাত্র আমি গ্রাণ্ট আলেনের কাছে ঋণী—এ গ্রন্থকে গ্রাণ্ট আলেনের বইয়ের মর্ম্মানুবাদ বা ছায়ানুবাদ বলিয়া যেন কেহ মনে না করেন।

তবে, অনেকে হয়তো বলিবেন, এ সমস্যার কথা দেশে আজ যখন ওঠে নাই, তখন কেনই বা তোলা! আমি বলি, উপন্যাস-লেখকের কারবার শুধু বর্ত্তমানকে লইয়াই নয়! বহু-দূর ভবিষ্যতের পথে বিচরণ করিবার অধিকার তাঁর অবাধ ও

অব্যাহত, চিরদিন। এ কথা যাঁরা মানেন না, তাঁরা দয়া করিয়া এ উপন্যাস পড়িবেন না, তাঁদের জন্য এ উপন্যাস লিখি নাই। প্রাণ যাঁদের বিশ্ব-প্রসারী সহানুভূতিতে ভরা, কল্পনা যাঁদের মুক্ত গগন-বিহারী, তাঁদের জন্যই মুক্ত পাখী লেখা। তাঁদের প্রাণে মুক্ত পাখী যদি একটু সাড়াও তুলিতে পারে, তাহা হইলেই শ্রম সফল মনে করিব।

৮২।৪ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা,
২০এ চৈত্র, ১৩৩১

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

# মুক্ত পাখী

— ১ —

যদুপতি সেন দার্জ্জিলিঙে ওকালতি করিতেন; সেখানেই একটা পাহাড়ের উপর ছবির মত তাঁর বাড়ী দার্জ্জিলিং-বাসী বা প্রবাসী বাঙালীদের কাছে মস্ত আরামের জায়গা। বাড়ীর সামনে ছোট-বড় পাহাড় সিঁড়ির মত কোথায় কত নীচে নামিয়া এক ক্ষেত্রে গিয়া মিশিয়াছে—সেখানে পাহাড়ীদের ছোট-ছোট ক্ষেত; আর বাড়ীর ঠিক পিছন-দিকে দেওয়ালের মত আড়াল তুলিয়া পাহাড় উঠিয়াছে। পাহাড়ের মাথায় বরফ জমিয়া থাকে, তার উপর সূর্য্য-কিরণ পড়িলে বাহার যা হয়, তা দেখিয়া নিতান্ত নীরস চিত্তও আনন্দ-রসে ভরিয়া ওঠে।

যদুপতি সেন এখন পরলোকে। তাঁর দুটী ছেলে বিলাত গিয়াছে, আইন পড়িবার জন্য। বাড়ীতে ভৃত্য-পরিজন লইয়া যদুপতি বাবুর স্ত্রী মাতঙ্গিনী দেবী একা বাস করেন। তাঁর আতিথ্যে মুগ্ধ নন, দার্জ্জিলিঙে এমন বাঙালী আজ পর্য্যন্ত পদার্পণ করেন নাই!

## মুক্ত পাখী

যদুপতি সেন ছিলেন অমায়িক নব্য মতের লোক। আমাদের চিরাচরিত কুসংস্কার ঠেলিয়া, তিনি, যাহা সত্য, সংস্কার-মুক্ত, উদার, তাহারি সমাদর করিতেন। স্ত্রী-শিক্ষা বা স্ত্রীলোকদের স্বাধীন অব্যাহত বিচরণ—এগুলার সম্বন্ধে কলিকাতার বাহিরে যে সব শিক্ষিত বাঙালী বাস করেন, তাঁদের মত সাধারণতঃ একটু উদারই হইয়া থাকে। যদুপতি বাবুর সে উদারতা তো ছিলই,—তাছাড়া তিনি এমন মতও প্রকাশ করিতেন যে, স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মেলামেশায় সর্ব্বপ্রকার সহায়তা করা সকলেরই উচিত—কারণ তাহা হইলে উভয়েরই মনের ভিতরকার যা-কিছু মিথ্যা কুণ্ঠা বা সঙ্কোচ, সে-সব দূর হইয়া পরস্পরের মধ্যে এমন সখ্যের সম্পর্ক স্থাপিত হইবে, যাহা দেশে বহু কল্যাণের সৃষ্টি করিবে। তার উপর নর-নারী এ দৃশ্য দেখিয়া তাহাদের সঙ্কীর্ণ চিত্তকে শুদ্ধ করিয়া নীচ গ্লানি বা কুৎসার কালিতে নিজেদের মনুষ্যত্বকে গাঢ় কালো করিয়া তুলিবার কল্পনাও কখনো করিতে পারিবে না। মাতঙ্গিনী দেবীকে তিনি এই ভাবেই গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। তাহারি ফলে তাঁর বাড়ীটি অতিথিবর্গের একটি রমণীয় সুখ-নীড়ে পরিণত হইয়াছিল। মাতঙ্গিনী দেবী সে নীড়ে অভ্যাগতদের তৃপ্তি-সাধনে আপনাকে যেন উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন।

ধর্ম্ম-সম্বন্ধেও যদুপতি বাবুর মত কোনো সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। দেব-দেবীর প্রসাদ-ভিক্ষা বা মন্দিরে গিয়া বক্তৃতা শোনা কি উপাসনা করা ছাড়িয়া তিনি মনুষ্যত্বের পূজাই মানব-জীবনে সার ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। মানুষকে

ঘৃণা না করিয়া তাহার সেবায় মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশ লাভ করে, ইহাই ছিল তাঁর অভিমত; এবং এই অভিমত-মত কাজ করিতে কোন দিন তিনি পরাঙ্মুখ ছিলেন, এমন কথা অতি-বড় নিন্দুকও নিন্দার ছলে তুলিতে পারে না! মাতঙ্গিনী দেবী স্বামীর মতকে শিরোধার্য্য করিয়া আজ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছেন,—সে বিষয়ে এতটুকু কুণ্ঠা তাঁহাকে কোনদিন বিচলিত করে নাই!

বাড়ীর বাহিরের বারান্দায় বসিয়া মাতঙ্গিনী দেবী এক তরুণ যুবার সহিত কথা কহিতেছিলেন। কাল প্রভাত—পাহাড়ের গায়ে তুষার-স্তূপের উপর রৌদ্র-কিরণ পড়ায় তাহা সোনার মত ঝক্‌ঝক্ করিতেছিল!

যুবার নাম অরুণ মিত্র। অরুণ কলিকাতায় ব্যারিষ্টারী করে; পূজার বন্ধে সে আসিয়াছে দার্জ্জিলিঙে বেড়াইতে। আইভি লজে একটা সজ্জিত কামরা সে ভাড়া লইয়াছে। অরুণের পিতা অভয় মিত্র কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার। অভয় মিত্রর সঙ্গে যদুপতি বাবুর খুবই অন্তরঙ্গতা ছিল।

মাতঙ্গিনী দেবী তাই অনুযোগ করিতেছিলেন, তাঁর বাড়ীতে যথেষ্ট জায়গা থাকা সত্ত্বেও অরুণের স্বতন্ত্র বাসায় ঘর ভাড়া লইয়া থাকায় তিনি ভারী ক্ষুব্ধ হইয়াছেন!

অরুণ একটু কুণ্ঠিতভাবে কহিল,—আপনার এখানে হয়তো নানা অতিথি এসে ভিড় জমিয়ে আপনাকে ঘর-ছাড়া করেছে, এই ভেবেই আমি আলাদা বাসা নিয়েছি...না হলে আপনার স্নেহ ঠেলে কে দূরে থাকতে চায়, বলুন!

মাতঙ্গিনী দেবী বলিলেন,—তোমাদের আজকালকার ছেলেদের মুখখানিই সব। মুখ-সর্ব্বস্ব হলে চলে কখনো, বাবা! তোমাদের স্বাধীনতার মাত্রা এমনি বে-ওজনে তোমরা চালাও যে এর দরুণ প্রীতি-আত্মীয়তায় কতখানি আঘাত লাগে, তা তোমরা ভেবেও দ্যাখো না!...তুমি আসবে আমার এখানে, তাও কি খবর দিতে হবে, না, এখানে জায়গা হবে কিনা, তার খোঁজ নেবে! এ বাড়ী তুমি নিজের বাড়ীর মত ভাবতে পারো না, সেইটেই আসল কারণ...নয় কি? কথাটা বলিয়া মাতঙ্গিনী দেবী মৃদু হাসিলেন।

অরুণ বলিল,—সত্যি তা নয়।...

মাতঙ্গিনী দেবী বলিলেন,—বেশ, তা যদি নয়, তাহলে এখানে না এসে যে-অপরাধ করেছ, তার প্রায়শ্চিত্ত কর।

—কি করতে হবে, বলুন...

—আইভি লজের ডেরাডেণ্ডা তুলে এখানে চলে এসো।... তোমার বাবাই বা কি ভাববেন, বল দিকি...যে, এখানে আমি থাকতে ছেলে গিয়ে উঠলো হোটেলের মত একটা বাসায়! ...ত্যাখো, ইংরেজের যে স্বাধীনতা শোভা পায়, আমাদের তা সাজে না। আমাদের ধাতুই যে আলাদা ভাবে গড়া।...ওদের রক্ত বলছে, ছাড়ো, ছাড়ো! শুধু নিজে, নিজের হাত, নিজের পা...দাঁড়াও কেবল আপন-জোরে, আপনার মাথা উঁচু করে... আশে-পাশে চেয়ো না! নিজেকে খাড়া করতে যদি আশপাশ ছেঁটে ফেলবার দরকার হয়, তাও ছাঁটো! আগে নিজেকে

ত্থাখো, তারপর আর-সবের কথা ভেবো—আর তাও ভাববে, সে-সব যদি তোমার কাজে লাগে, তবেই...! আমাদের ধাতে তা পারা যাবে কেন! আর-পাঁচজনকে নিয়েই আমরা দাঁড়াই। সে-পাঁচজনকে ছাড়লে আমরা বড় একা, বড় নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ি। আমরা চাই চারিদিক নিয়ে উঠতে...আমার সঙ্গে সবাই চলুক—নিঃসঙ্গতা যে আমাদের বিষের মত বাজে! এই ত্থাখো না, ট্রেণে কলকাতা থেকে সিম্‌লে যেতে গেলে কামরায় যদি তুটি বাঙালী থাকে তো তাদের কত আলাপই হয় তুজনে,—কি মেলামেশা হয়ে যায়! তুদণ্ডে পরস্পরকে কত কালের আপনার বলে ভাবি, সুখ-তুঃখের কথায় কত দরদ জাগে! আর ওরা? পাঁচজন থাকলেও, সেই একটা খবরের কাগজ নিয়ে আড়াল তুলে সেটা তিরিশ বার পড়বে, তবু পাশের সহযাত্রীটির সঙ্গে ভুলেও আলাপ করবে না! আমাদের মত সামাজিকতা কারো আছে আর? পুরোনো চাকর-বাকরকে অবধি খুড়ো জ্যাঠা দাদা বলে আপনার করে নি! ওদের কাছ থেকে ভালো পাবার ঢের আছে, মানি, সেগুলো নাও! তাবলে নিজেদের ভালোগুলোকে বিসর্জ্জন দিয়ে…? তা নয়! বুঝলে বাবা।

অরুণ অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। সে বলিল,—আমার অন্যায় হয়েছে…

মাতঙ্গিনী কহিলেন,—গুলু, টেপু, এরা থাকলে কি তোমায় ওখানে থাকতে দিতো! জোর করে এখানে টেনে আনতো!

আমি মেয়ে-মানুষ,—প্রাণে মমতাই আছে, গায়ে জোর তো নেই!

অরুণ বলিল,—আচ্ছা, যখন ঘর নিয়েছি, তখন রাত্রে গিয়ে সেখানে শোবো। আমার খাওয়া-দাওয়া এখানেই হবে, আপনার এই স্নেহের নীড়ে। তবে বাসাটা নিয়েছি, টাকাও দিয়েছি যখন, তখন সে হক্ ছাড়বো কেন!

মাতঙ্গিনী দেবী সে কথার কোন জবাব দিলেন না। তাঁর দৃষ্টিপথে তখন এক তরুণীর উদয় হইয়াছিল। তরুণী পথ দিয়া এই দিকেই আসিতেছিল।

মাতঙ্গিনী দেবী বলিলেন,—তোমার সঙ্গে একটি মেয়ের আলাপ করিয়ে দেব। বেশ মেয়েটি···আসছে ঐ···

অরুণ চাহিয়া দেখিল, এক তরুণী রূপের হিল্লোল তুলিয়া পাহাড়ের গায়ের উপর তৃণাস্তীর্ণ পথ ধরিয়া চারিদিকে বিদ্যুৎ-দীপ্তি বিকশিত করিয়া এই দিকেই আসিতেছে।···তার গতি কি কুণ্ঠহীন!···

মাতঙ্গিনী দেবী কহিলেন,—এর সঙ্গে বনবেও তোমার! শুধুই কি অপূর্ব্ব রূপে রূপসী ও···তোমাদের সমাজ-স্বাধীনতার সম্বন্ধে যা মত, এ মেয়েটি যেন সেই মতই সজীব হয়ে উঠেছে!··· ব্রাহ্ম-সমাজের একজন মস্ত প্রচারকের মেয়ে, এই দীপ্তি!

—ব্রাহ্ম। অরুণ একটু কুণ্ঠিত হইল। সে কহিল,—একটা গণ্ডীঘেরা জীবনের মধ্যে···বলিয়া সে একটু থামিল। পরে কহিল,—দেখুন, এই যে ধর্ম্মের নামে ভেদ টানা, আমি এর

বিরোধী। এতে মনের স্বাধীন অব্যাহত গতি তার স্বচ্ছন্দ লীলায় অগ্রসর হতে বাধা পায়!...আমরা হিন্দু বা ব্রাহ্ম কিছুই থাকতে চাই না। আমরা মানুষ, এইটেই শুধু আমাদের একমাত্র পরিচয় হবে! তাছাড়া আর-একটা উপাধির উপসর্গও আমাদের আক্রমণ করবে না—আমি এই চাই।

মাতঙ্গিনী বলিলেন,—তা দীপ্তিও ঐ নামেই ব্রাহ্মর মেয়ে! ...সে যে কোন্ ধর্ম্ম মানে, তা বুঝি না!

শুনিয়া অরুণ খুসী হইল, এই তো চাই! যে-তরুণীটি দেখিতে এমন রূপসী, তার মনটাও তেমনি রূপের আলোয় ভরপুর না হইলে চলে! সেখানে বদ্ধ সংস্কারের অন্ধকার জমা থাকিলে পরিতাপের যে সীমা থাকে না!

তরুণী বাড়ীর ফটক পার হইয়া লনে আসিলে মাতঙ্গিনী দেবী উঠিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিলেন,—এসো মা...

তরুণী কহিল,—একটু বেলা হয়ে গেল আজ! আমার ঐ ম্যাথরের বৌটির অসুখ করেছে, ম্যাথর এসে বললে। তাই দেখতে গেলুম তাকে। তা সর্দ্দি-জ্বর, ভয় নেই।...তাকে দেখে বাড়ী ফিরে তার জন্যে একটা হোমিওপ্যাথি ওষুধ পাঠালুম, তাতেই দেরী হয়ে গেল।...

অরুণ দেখিল, সে একজন অপরিচিত যুবা এখানে থাকিলেও দীপ্তির কথায় বা ভঙ্গীতে এতটুকু সঙ্কোচ ফুটিল না! কি অম্লান অকুণ্ঠিত তার ভঙ্গী! সে তো নব্য সমাজের বহু তরুণীর সঙ্গে মিশিয়াছে, কিন্তু তাদের সেই যে একটা লোক-দেখানো

লজ্জার ভঙ্গী! কি বিশ্রী, কুৎসিত! তা দেখিলে লজ্জায় মাথা হেঁট হইয়া যায়। তাদের সে লজ্জা, সে সঙ্কোচ এমন ব্যবসাদারী বেসাতির মত দেখায়! এই তরুণীর ভঙ্গীর কাছে সেটা অত্যন্ত কৃত্রিম মনে হইল!...

মাতঙ্গিনী দেবী বলিলেন,—দীপ্তি, তোমার সঙ্গে এর আলাপ করিয়ে দি, এসো মা। এ আমাদের অরুণ... সম্পর্কে আমার ভাওর-পো...কলকাতায় থাকে, ব্যারিষ্টার। অল্প দিন বেরুলেও পশার বেশ করেছে!...করবে না কেন! বুদ্ধিমান ছেলে! তাছাড়া তোমাদের দলেরই, মা...স্বাধীনতা সম্বন্ধে তোমাদের মত একই কি না। আর এটি হলো দীপ্তি... এঁর বাবা পশুপতি চক্রবর্ত্তী ব্রাহ্ম-সমাজের একজন গণ্যমান্য আচার্য্য।

মৃদু হাসিয়া দীপ্তি বলিল,—কিন্তু আমি ব্রাহ্ম নই, পিশিমা...

মাতঙ্গিনী দেবীকে দীপ্তি পিশিমা বলিয়া ডাকে।

মাতঙ্গিনী দেবী বলিলেন,—সে কথা অরুণকে বলেছি আমি। তা অরুণও তাই...ভুলেও কখনো কোন দেবতার মন্দিরে প্রণাম করে না, কেউ ব্রাহ্ম বললেও ক্ষেপে তাকে মারতে ওঠে!... আর সমাজ-ধর্ম্ম সম্বন্ধে মতামত এমনি যে তোমাদের মধ্যে কে সেরা, তার বিচার করা এক শক্ত ব্যাপার।...তোমরা আলাপ কর—আমি খাবার আনি।

দীপ্তি বলিল,—তোমার হাতের রসগোল্লা যদি থাকে তো দিয়ো, বিস্কুট-মিস্কুটগুলো ভারী একঘেয়ে লাগে, পিশিমা।

অরুণ এই তরুণীর ব্রীড়াহীন স্বচ্ছন্দ কথা-বার্ত্তায় মুগ্ধ হইয়া তাহার পানে চাহিয়া ছিল।

মাতঙ্গিনী দেবী হাঁসিয়া বলিলেন,—রসগোল্লার উপর তোর একটু দরদ বেশী,—না রে দীপ্তি? বলিয়া তিনি উঠিয়া ঘরের মধ্যে গেলেন।

দীপ্তি বলিল,—পিশিমাকে আমি রোজ জ্বালাতন করি! ...তা কি করি বলুন, পিশিমার হুকুম কি, না, আমাকে মুখ ধুয়ে একেবারে এখানে আসতে হবে! চা বলুন, খাবার বলুন, এখানেই খেতে হবে!...পিশিমা ভারী স্নেহ করেন আমায়!...কাকেই যে না করেন! আপনার কথা পিশিমার কাছে আমি প্রায় শুনি। আপনি ওঁকে লিখেছিলেন, ছুটীতে এখানে আসতে পারেন বেড়াতে,...তা আপনি বুঝি কাল এসেছেন? খপর দেন নি তো!

অরুণ বলিল—না, আমি এখানে উঠিনি। আমি এসে উঠেছি আইভি লজে।

দীপ্তি কহিল—কেন, এখানে রইলেন না যে! পিশিমা তো এমনি কথাই বলছিলেন—

অরুণ বলিল—ভাবলুম, এখানে হয়তো অনেক যাত্রী এসে ভিড় জমিয়ে দেছে। এঁর বাড়ী তো বারোমাসই অতিথ-শালা। অরুণ হাসিল।

দীপ্তি বলিল—সে কথা সত্যি! পয়সা থাকে ঢের লোকের—কিন্তু তার সদ্ব্যবহার জানে ক'জন! তাছাড়া পয়সা থেকেও

যদি মানুষ সামাজিক হতে না শিখলে, আর-পাঁচজনকে নিজের চরিত্রের প্রভাব না জানিয়ে দিলে, তাহলে তো মানুষ হয়ে জন্মাবারও কোন সার্থকতা থাকে না।

অরুণ কহিল,—আপনি কি এখানেই থাকেন?

দীপ্তি কহিল,—না, আমিও ছুটীতে বেড়াতে এসেছি।

অরুণ কহিল,—আপনি কি বেথুনে পড়ছেন? কথাটা বলিয়া যেন একটু কুণ্ঠিতভাবেই সে উত্তরের প্রতীক্ষায় দীপ্তির পানে চাহিল।

দীপ্তি কহিল,—না। পড়তুম বটে, তবে…ছেড়ে দিয়েছি! …ফোর্থ ইয়ারে পড়তে পড়তেই ছেড়ে দিলুম। বলিয়া সে একটু থামিল, পরে কহিল,—ইউনিভার্সিটির একটা ডিগ্রী কুড়িয়ে কি বা এমন লাভ হবে, তাও বুঝি না।…জীবনটা কেমন চারিধার থেকে নাগপাশে জড়িয়ে পড়ছিল। বাঁধা রুটীনের চাপ—তাছাড়া যাদের সঙ্গে পড়ছিলুম, দেখলুম, তাদের লক্ষ্য শুধু এই ডিগ্রী নেওয়ার দিকেই—মনটার প্রসার হবে কি করে, তার কথা কারো মনে স্থানও পায় না! অর্থাৎ দেখুন, চারিধারে এই যে মস্ত একটা কলরব পড়ে গেছে,—সাম্য-সাম্য, মেয়েদের পুরুষের সঙ্গে সমকক্ষ করে তোলো, সব দিক দিয়ে মুক্ত আলো, মুক্ত বাতাস ছিটিয়ে প্রাণটা ওদের ভরে দাও,—এই যে মুক্তির জন্য আকুলতা, এটা কি সত্যই অন্তরের জিনিষ, না, এ শুধু লোক-দেখানো ঠাট মাত্র! দীপ্তির কথার সঠিক

অর্থ ঠিক বুঝিতে না পারিয়া অরুণ তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

দীপ্তি কহিল,—এই যে শিক্ষা দেওয়া চলেছে, এ শিক্ষা মনকে কতখানি গড়ে তুলছে! একটুও না। সেই বদ্ধ সংস্কারের মধ্যে মন যেমন আচ্ছন্ন ছিল, তেমনই থাকচে! তারপর মুখে যত আন্দোলনই চলুক—মেয়েদের বেঁধে রেখো না, বাঁধন থেকে মুক্তি দাও, তাকে মুক্ত আকাশের পাখী করে তোলো—আসলে কাজে তা হচ্ছে কি! বি, এ পাশ করেও তারা সেই দাম্পত্যলীলায় জীবনকে চুবিয়ে ধরছে! সেই ঘরকন্নার পাঠ, সেই রেঁধে-বেড়ে স্বামীর পথ চেয়ে বসে থাকা—গৃহে স্বামী সেই প্রভুর মত আদেশ করছে, আর স্ত্রী নির্ব্বিচারে তা পালন করে চলেছে! কোথায় সে বন্ধুত্ব, সখ্য! কলেজে পাশ করে মেয়েরা জীবনে তার কি ফলটা পাচ্ছে, বলুন তো?

অরুণ কহিল,—আমারো ঠিক ঐ মত।...তবে তার বেশী এটুকুও আমি বলি যে, পুরুষদের শিক্ষাই বা কি হচ্ছে, বলুন তো! মানুষ তৈরি হচ্ছে? ইউনিভার্সিটি থেকে ছাপ নিয়ে বেরিয়ে ওকালতি করতে গিয়ে নির্ম্মম চাপে হয় সব মক্কেলের হাড়-পাঁজরা ভেঙ্গে চূর্ণ করে দিচ্ছি, না হয়, ডাক্তারী, কি পাটের দালালি! এতে টাকাকড়ি হলো তো লোকে বললে, হ্যাঁ, একটা মানুষ হয়েছে বটে! মানুষের মাপকাঠি ঐ টাকার বস্তা! তাহলে তো আদর্শ মানুষ—আমাদের টাকশাল! কি টাকাটাই সে চাঁদি ভেঙ্গে ছেঁকে নিত্য বার

করছে! তাছাড়া দেখুন, ভালো ছেলের আদর্শ কি? না, যে কোঁৎ-কোঁৎ করে পড়া গেলে, আর একজামিনের সময় তা হুড়-হুড় করে বমন করে দিতে পারে! সে এত-বড় বিশ্বজগৎ সমাজ যে আছে, এ-সবের কোন খোঁজ রাখে না—দুনিয়ায় যে মানুষ আছে, তা তার হুঁসও নেই! তার পর ললিত-কলা খেলাধুলা এদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখে না! তার পর পাশ-টাশ সেরে, দেখি, সে দিবারাত্র ওষুধ খাচ্ছে, আর ঘর ছেড়ে খোলা একটু হাওয়ায় আসতে হলে গলায় কম্ফর্টার জড়াচ্ছে! না জানলে কখনো খেলতে, না জানলে প্রাণ খুলে চেঁচিয়ে হাসতে! এই আমি অক্সফোর্ডে ছিলুম তো—তা সেখানে প্লেটো আরিষ্টটল মিল, এ-সব পড়ার সঙ্গে সঙ্গে খেলাও ছিল কি প্রচুর! এখানে ছেলের দল একত্র হলে শুধু একই কথা, বার্কখানা কতদূর হলো? Dynamicsটা দেখা হচ্ছে না—ঐ নিয়েই মত্ত সব চব্বিশ ঘণ্টা! আর সেখানে ও-সব বার্ক Dynamics কলেজে বা ক্লাশের মধ্যে—কলেজের বাইরে ক্রিকেট বিলিয়ার্ড রোয়িং। তারপর বুড়োধাড়ি সব ছেলে একজনকে ধরে পাঁজা-কোলা করে জলে চুবোচ্ছে! কি চীৎকার, কি মাতামাতি! এখানকার আট-দশ বছরের ছেলেগুলো সে-রকম কিছু করলে বাড়ীতে বাপ-মার চোখ কপালে উঠে যায়! এই তো জীবন! জীবনটাকে ফেলে ছড়িয়ে ঠিকভাবে ভোগ করতে যদি না পেলুম তো জীবনের সৃষ্টি হয়েছিল কেন! গাছ-পাথর হয়ে থাকলেও চলতো তো!

দীপ্তি কহিল,—ঠিক তাই। মানুষের মাথাটাই তো তার এক-মাত্র অঙ্গ নয় যে শুধু ঐ মাথাটাকে গড়ে তুললেই মানুষ গড়া হবে। মানুষ গড়তে হলে তার হাত-পা, তার প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, তার প্রকৃতিটাকেই যে সঙ্গে সঙ্গে গড়ার দরকার! ভাবুন তাহলে, ছেলেদের সম্বন্ধেই যখন এই ব্যবস্থা, তখন মেয়েদের দশা এদেশে কি ভয়ানক সাংঘাতিক!

অরুণ কহিল—আমার কি মত, জানেন?...আমি বলি, শিক্ষা দেবার আগে সকলকে বাঁধনের নিগড় থেকে মুক্তি দাও। আগে মনকে মুক্ত কর, তার পর শিক্ষা দিলে তবেই না তার গড়ে ওঠবার সম্ভাবনা ঘটবে!

দীপ্তি কহিল—এইটেই খাঁটি কথা।—তারপর দরদী শ্রোতা পাইয়া সে তার মনটাকে একেবারে আবেগে-উত্তেজনায় খালি করিয়া অরুণের সামনে ধরিয়া দিল। সে বলিল,—এই যে রাজ-নীতির ক্ষেত্রে আমাদেব চেষ্টা বিফল হচ্ছে, এত বিরোধের মাঝে বারবার পথ হারাচ্ছে, এর মানে আর কিছু নয়! আমাদের মন শিক্ষার অভাবে স্বাধীনভাবে গড়ে উঠতে পারে নি, কাজেই আমাদের চেষ্টাকে আলোয় আমরা ভরিয়ে তুলতে পারছি না। তার কারণ, মনের মধ্যটা সংস্কারের বদ্ধ অন্ধকারে ভয়ানক জমাট বেঁধে আছে—নিবিড় ছায়া! আলোর এ ক্ষীণ রশ্মি সে আঁধারকে ঠেলে হঠাতে পারছে না। তার উপর নারীর জাগরণ বলে যে চীৎকার উঠেছে —এ কি জাগরণ! জাগবার আগে চাই নিজেদের চেনা। তা

কৈ সে নিজেদের চেনবার চেষ্টা···পলিটিক্সের আগে চাই সমাজে তুমুল পরিবর্ত্তন, ভেঙ্গে-চুরে তাকে একেবারে স্বাধীনভাবে নতুন করে গড়ে তোলা। আর এই যে জাতিভেদ সামাজিক আচারের পার্থক্য, ধর্ম্মের পার্থক্য, এ সব গণ্ডীও মানুষকে এক হ'তে দিচ্ছে না। এ সব বাঁধন ভেঙ্গে মানুষ যদি একবার মিলতে পায় যথার্থ প্রাণে-প্রাণে, তাহলে তাদের সেই সম্মিলিত শক্তি যে-কাজে হাত দেবে, তাতে জয় তার হবেই!

অরুণ কহিল—আপনার বাবা কি বলেন এ-সম্বন্ধে? তিনি···

দীপ্তি কহিল—বাবা! তাঁর মত! আপনি কি বলতে চান, আমার এতখানি বয়স হয়েছে, আমার নিজের কোন মত থাকবে না! বাবার যেমন মত আছে, আমারো তো একটা মত আছে তেমনি! আমার স্বাধীন মতে তিনি কি বলে হস্তক্ষেপ করবেন! আমাদের দেশের পণ্ডিতের কথাই তো—প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রমিত্রবদাচরেৎ। আমি যে স্বাধীনতার কথা বলছি, তার মানে স্বাতন্ত্র্য! আচারে কাজে, সব বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা...এ শুধু প্রকাশ্য রাজপথে নারীর অবাধ বিচরণ নয়··সমাজে জীবনের প্রতি কাজে, প্রতি চিন্তায় স্বাধীনতার কথা বলছি আমি!

অরুণ কহিল,—কিন্তু,—তবু মেয়েরা যতই স্বাধীন থাকুন, পুরুষের কাছে একটু মাথা তো নোয়াতেই হবে!—ভাবুন, আপনিই আপনার বাবার অধীন···তাঁরই পয়সায়···

দীপ্তি কহিল,—মোটে নয়। ঠিক ঐখানেই বাধছিল বলে আমি লেখাপড়া ছেড়ে দিলুম। বাবার অর্থে আমার দিন

চলছিল,···ভাবলুম, কেন, আমি তো পয়সা নিজেই উপার্জ্জন করতে পারি। যদি কেউ স্বাধীনভাবে নিজেকে গড়তে চায় তো তাকে সর্ব্বদিক দিয়ে পর-নির্ভরতা ছাড়তে হবে। নারীর এই অসহায়তার জন্যেই তো সমাজে এত সব বিধি-নিষেধের সৃষ্টি হয়েছে। আমি চাই, জীবনে কখনো পুরুষের অধীন হব না, নিজের স্বাধীন সত্বায় দিন কাটাবো,···চির কাল। তাই আমি বেথুনে পড়া ছেড়ে মেয়ে-স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কাজ নিয়েছি...কাগজেও কিছু কিছু লিখি...তাতেও কিছু রোজগার হয়। তাতে আমার বেশ স্বচ্ছন্দেই দিন চলে যায়!··· বিলাসিতা! তার কোনো প্রয়োজনও তো নেই, জীবনে! না-ই হলো বিলাসিতা!···

অরুণ কহিল,—তাহলে এখানে আপনি একলাই এসেছেন! আপনার বাবা-মা···

দীপ্তি কহিল,—একলাই এসেছি। ভেলু পাহাড়ের ধারে হেজ-হাউস্ বলে ছোট বাংলা, সেই বাংলায় আমি থাকি। লোকালয়ের একটু বাইরে, তাহলেও সেখানকার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য এমন যে লোকজনের সঙ্গ পাবার জন্য মন একটুও চঞ্চল হয় না!···কলকাতার মরুভূমি ছেড়ে এই শ্যামল বিজন গিরি-গুহায় এসে প্রাণটা যেন মুক্তির নিশ্বাস ফেলে বেঁচেছে!

অরুণ কহিল,—কিন্তু, একলা ঐ নির্জ্জন জায়গায়,—

দীপ্তি মৃদু হাসিল। হাসিয়া কহিল,—আপনি আশ্চর্য্য হচ্ছেন কেন, বলুন তো! নারী একলা থাকতে পারবে নাই বা কেন—?

অরুণ ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিল,—না, তা পারবেন না কেন! আমি সে কথা বলছি না—তবে পাঁচটা লোকে কি ভাববে, কি বলবে···তাদের কৌতূহল···

হাসিয়া দীপ্তি কহিল,—লোকের বলা কি ভাবার দিকে আমি ভ্রূক্ষেপও করি না। আমি যেটা সত্য বলে মনে করবো, যেটাতে ভাববো কোন দোষ নেই,—তা করতে আমি কখনো কুণ্ঠিত বা বিচলিত হবো না! লোকে আমার কি জানে! তাদের বলা বা ভাবার পানে চেয়ে থাকলে, দুনিয়ায় নড়া-চড়া করাই যে অসম্ভব হয়ে পড়বে!···বিবেচনা করার শক্তিমাত্র নেই, এমন অবিবেচক বক্তার কখনো অভাব নেই, কোনো দেশেই!..

অরুণ কহিল,—আপনি কতদিন এখানে থাকবেন?

—আরো তিন হপ্তা। স্কুলের ছুটীটা আর কি এখানেই কাটাবো। কাজের ঢের কথা ভেবে আলোচনা করারও অনেক সুযোগ পাই এখানে!...

মাতঙ্গিনী দেবী ফিরিয়া আসিলেন,—ভৃত্য একটা ট্রেতে করিয়া দুইজনের মত চা ও জল-খাবার আনিয়া টী-পয়ের উপর রাখিল।

মাতঙ্গিনী দেবী হাসিয়া বলিলেন,—দুজনে খুব আলাপ হয়ে গেছে যে এরি মধ্যে!···কেমন, আমি তো বলেছিলুম, যে, তোমাদের দুজনে বনবে খুব।

দীপ্তি কহিল,—এই তো পিশিমা আমার কথা শুনে তুমি বল, আমি পাগল! এঁরও তো ঐ মত!

মাতঙ্গিনী দেবী বলিলেন,—কে? অরুণ! ও-ও কি কম না কি! বলেছি তো, তোমাদের মধ্যে কে সেরা, তা বলা শক্ত!

চা-পানের সঙ্গে সঙ্গে আরো নানা কথাবার্ত্তা হইল। তার পর দীপ্তি বেড়াইতে যাইবে বলিয়া উঠিল। উঠিয়া অরুণকে কহিল,—তাহলে বিকেলের দিকে আমার বাড়ী দেখতে আসছেন তো! সেখানে গেলে খুসী হয়ে যাবেন। পাহাড়ের ভীম-গম্ভীর মূর্ত্তি—সবুজ ঘাসের শ্যামল শোভা!···আসছেন তো বিকেলে?

অরুণ মুগ্ধ কৃতজ্ঞ চিত্তে কহিল,—নিশ্চয়!

—বাড়ী চিনতে পারবেন?

—ঐ তো ভেলু পাহাড়ের কাছে। তা চিনতে পারবো বৈ কি!

—আপনারা তাহলে বসুন—বলিয়া মাতঙ্গিনী দেবীকে প্রণাম করিয়া দীপ্তি চলিয়া গেল। অরুণ বিমূঢ়ের মত বসিয়া রহিল—এতক্ষণ সে যেন স্বপ্ন দেখিতেছিল!

— ২ —

বেলা দুইটা বাজিতেই অরুণ বৈকালিক নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্য বেশ-ভূষা আরম্ভ করিয়া দিল। যৌবনের ধর্ম্মই এই—তরুণীর আহ্বানে তরুণ চিরদিন নিজেকে সজ্জিত সুন্দর করিয়া তুলিতে চায়। বেশভূষা সারিয়া অরুণ দেখিল, এখনো অনেকখানি দেরী। সময় যেন আর কাটিতে চাহিতেছে না! দুই-চারিটা

পোষাক আবার নাড়িয়া-চাড়িয়া আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া এতবার সে নিজেকে দেখিল,—তবু ঘড়ির কাঁটা কিছুতে যেন আর অগ্রসর হইতে চায় না! অরুণের মনে হইল, হাত দিয়া দার্জ্জিলিঙের ভেলু পাহাড়ের ধারের সেই পরিচ্ছন্ন বাঙলার সব ঘড়িগুলার ছোট কাঁটা যদি সে ঘুরাইয়া চারটার ঘরে সরাইয়া দিতে পারিত!…সে জানিত না, যে-সময়টায় নিজেকে সে এত করিয়া সাজাইয়াও ঠিক মনের মত করিয়া তুলিতে পারিতেছে না, সেই সময়টায় দীপ্তি মাতঙ্গিনী দেবীর ঘরে বসিয়া তাহারি কথা শুনিতেছে।

মাতঙ্গিনী দেবী বলিলেন,—চমৎকার ছেলে এই অরুণ! মনটা শুধুই যে শিক্ষায় ভরপূর, তা নয়, মা—ওর মনে যেমন দরদ, তেমনি স্নেহ! তাছাড়া কুসংস্কারের ছায়াও ওর মনে নেই!…মানুষের মধ্যে সব বৈষম্য কেটে দিয়ে সবাই মহা-মানবের অংশ হয়ে গড়ে উঠুক—এই ও চায়। তোমার সঙ্গে মতও মেলে ওর খুব!…তাছাড়া কত বড় বংশের ছেলে ও। ওর বাপ কলকাতার একজন মস্ত ডাক্তার। অগাধ পয়সার মালিক হলেও গরীব-দুঃখীর কাছ থেকে একটি পয়সা নেন্ না। শুধু তাই নয়, গরীবের ডাকটিতে পয়সা না থাকলেও সেটিকে অগ্রাহ্য করেন না। মা মাটির মানুষ ছিলেন, নেই; আজ দু'বছর স্বর্গে গেছেন!… আর ব্যারিষ্টারীতে এই অল্প দিনেই ও যা পশার করেছে, তাতে মনে হয়, ভবিষ্যৎ ওর খুবই উজ্জ্বল!

ঘড়িতে বেলা তিনটা বাজিয়া গেল, তবু মাতঙ্গিনী দেবীর

কথার আর শেষ নাই।—শুধু এই! অরুণ খুব ভালো ছবিও আঁকিতে পারে। শুধু গাছপালা বা পাহাড়-নদীর ছবি নয়! তুমি বসিয়া আছো, পেন্সিলের দুটা আঁচড়ে তোমার এমন ছবি মুহূর্তে আঁকিয়া দিবে, যে, তার কাছে ফটোগ্রাফ কোথায় লাগে! তাছাড়া কাব্য-উপন্যাসের কত বিষয় লইয়া কত ছবিই যে সে আঁকিয়াছে! ও একজন মস্ত গুণীন্ আর্টিষ্ট!

মাতঙ্গিনী দেবী হঠাৎ থামিয়া দীপ্তির পানে চাহিয়া রহিলেন, তারপর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কতক আত্মগতভাবেই কহিলেন, —দুটীকে মানায়ও বেশ। তা কি হবে! এ বন্ধুত্ব কি ওদের দুটীকে চির-জীবনের মত এক করে দেবে! শেষের কথাটা দীপ্তির কানে গেল। দীপ্তি শিহরিয়া উঠিল, ডাকিল,—পিশিমা—

—কেন দীপ্তি?

দীপ্তি মাতঙ্গিনীর পানে চাহিয়া কহিল,—কি যে বল তুমি!

হাসিয়া মাতঙ্গিনী বলিলেন,—কি বলি?

দীপ্তি হাসিয়া অবিচল কণ্ঠেই কহিল—আমায় তাহলে তুমি আজো চেনোনি পিশিমা। বিয়ে আমি কখনো করবো না, কখনো না!...এ আমার পণ!

মাতঙ্গিনী দেবী হাসিয়া কহিলেন,—অনেকে ঐ কথা বলে রে! তারপর ঠিক লোকটি যখন এসে চোখের সামনে দাঁড়ায়...! ...একজনকে না ভালবেসে এমনি নিঃসঙ্গ একলা থাকবি?...

দীপ্তি একটু নীরব থাকিয়া কহিল,—কাকেও...ভালো বাসবো না, এমন কথা বলা যায় না! বলা চলে না। আমাদের

জীবন এত দীর্ঘ, আর ঘটনাও এত রকম ঘটে!···তবে বিয়ে নয়! সেই চিরকেলে দাস্য···তার চিন্তা আমি করতে পারি না! তাহলে আমার স্বাধীনতা রৈল কোথায়, পিশিমা? সেই তো তাহলে সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-প্রথাকে মাথায় তুলে নিয়ে দাস্যব্রত গ্রহণ করাতে হবে···! তোমায় বলে রাখছি, পিশিমা, এ কাজ আমার দ্বারা কখনো হবে না। আর তুমি জানো, আমি মুখে যা বলি, কাজেও তা করি। যখন একটা পণ আমি করি, তখন তা পালন করতে যদি আমার বুক ভেঙ্গে যায় তবু আমি তা পালন করি! আমার নিজের মনের কাছে কখনো বিশ্বাসঘাতক হবো না আমি, নিশ্চয়!

মাতঙ্গিনী দেবী শিহরিয়া উঠিলেন! দীপ্তি এ বলে কি! দুই-চারিটা মেয়ের মুখে এমনি কথা শুনিয়া তাঁর ভয়ও যেমন হয়, তেমনি এই স্বাধীনতার চেষ্টার প্রতি তাঁর সমস্ত নারী-হৃদয় ক্ষোভে-রোষে বিদ্রোহী হইয়া ওঠে! এ কি ভালো! নারীর এই পুরুষ-সম্পর্কবিহীন স্বার্থপরের মত জীবন বহা...? তার চেয়ে যে ঢের ভালো ছিল সেই পর্দ্দার আড়ালে অল্পে-তুষ্ট সরল নির্লোভ জীবন-লীলার স্নিগ্ধ প্রবাহ!

হঠাৎ ঘড়ির দিকে চোখ পড়িতেই তিনি কহিলেন,—আর নয় মা, অরুণকে চারটের সময় আসতে বলেছ। একে তো সে বাড়ী জানেনা, তাতে তোমায় না দেখতে পেলে কোথায় ঘুরে বেড়াবে! বাড়ী যাও এখন। কাল সকালে এসো। কালকের জন্যে রসগোল্লা করে রাখতে হবে, না?

দীপ্তি হাসিয়া বলিল,—তোমার রসগোল্লার রসের লোভেই বুঝি এখানে আসি শুধু! আমি কি এমনি পেটুক!

মাতঙ্গিনী হাসিয়া কহিলেন,—রসের লোভে বৈ কি মা! স্নেহ তো করি, তা সে স্নেহটাকে কবিরা কি বলে? স্নেহ-রস তো...তবে?

দীপ্তি হাসিয়া বলিল,—তাহলে আমি পেটুকই হতে চাই পিশিমা! তোমার স্নেহ-রস যে কি, তা যে তার স্বাদ পেয়েছে সেই জেনেছে! এ রসের রসিক যে নয়, সে বড় দুর্ভাগা!

মাতঙ্গিনী দীপ্তিকে টানিয়া বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিলেন; পরে তাহার মাথায় চুম্বন করিয়া কহিলেন,—চিরসুখী হও মা।

গৃহে ফিরিয়া দীপ্তি মাথার বিস্রস্ত চুলগুলাকে আঁচড়াইয়া গুছাইয়া গৃহ-সম্মুখের বাগানে বেড়াইতে লাগিল। ও গাছটা গোলাপে ভরিয়া উঠিয়াছে, ওধারে ঐ হনি-সাক্‌লের ঝাড়ে কি বাহার! ঐ মালতীর গুচ্ছ···চারিধারে নিবিড় পুষ্প-কুঞ্জগুলি যেন কে ফুলের রাশে সাজাইয়া রাখিয়াছে!

অরুণ আসিয়া সেই পুষ্পকুঞ্জের মধ্যেই ঢুকিল এবং দীপ্তিকে দেখিয়া কহিল,—বনদেবী বনে ফুল তুলছেন!

দীপ্তি কহিল,—বাঃ, আপনি তো বেশ! একেবারেই বাগানে এসেছেন! কোথায় এই একধারে ঝোপের মধ্যে ঘুরছি...! তা চারটে কি বেজে গেছে?···আমি এগুলোর সন্ধানে এসে ঘড়ির কথা ভুলেই গেছি।

অরুণ কহিল,—না, এখনো চারটে বাজতে একটু দেরী আছে। তা আমি যে বাঙালী, কথায়-কথায় ঘড়ি দেখতে মনেও থাকে না!

দীপ্তি হাসিয়া কহিল,—তাহলে তো আপনার বিলেত যাওয়াই মাটী হয়ে গেছে!

অরুণ কহিল,—নিজে না মাটী হলেই ভাগ্য বলে মানবো।

দীপ্তি অরুণের পানে ফিরিয়া চাহিল, এ কথার মানে?

অরুণ বুঝিল, রসিকতাটার কোন অর্থ নাই! তবু সে কহিল,—অর্থাৎ, ঘড়ির একটু এদিক-ওদিক হলে ক্ষতি নেই! মনের গতির না নড়-চড় হয়।

দীপ্তি মুগ্ধ দৃষ্টিতে আশপাশের বুনো লতায় সাজানো ছোট-খাটো বিচ্ছিন্ন ঝোপ-ঝাপগুলার দিকে দেখাইয়া কহিল,—দেখুন তো, যা বলেছিলুম, তা ঠিক কি না! সৌন্দর্য্যের ছড়াছড়ি চারিধারে, কেমন!... ওঃ, কলকাতায় সেই ধুলো আর ধোঁয়ার তুলনায়, এ যেন স্বর্গপুরী...

অরুণ কহিল,—কবি তো বলেই গেছেন,

Many a green isle needs must be

In the deep .wide sea of misery,—এ না থাকলে মানুষ বাঁচত! কলকাতায় থেকে থেকে দম্ আটকাবার মত হলে, ভাগ্যে এই-সব জায়গা ছিল, নইলে মানুষের মনগুলো পাথর হয়ে যেত!...

কথাটা বলিয়া সে দীপ্তির পানে চাহিল। দীপ্তির মুখে-চোখে

সকালবেলার চেয়েও আরো মধুর দীপ্তি ফুটিয়াছে! একখানি সবুজ রঙের শাড়ী তার নিটোল অম্লান তনুখানিকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। হাফ-হাতা সবুজ ব্লাউসটি গায়ে আঁটিয়া বসিয়াছে—আর গোলাপী রং এমন আভায় বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িয়াছে যে, তরুণের মনে হইল, সবুজ পাতা-ঘেরা এ যেন সদ্য-ফোটা তাজা গোলাপটি!...যৌবনের বিদ্যুৎ-স্পর্শে তার সারা অবয়ব অপরূপ মাধুরীতে পরিপূর্ণ!...অরুণ মুগ্ধ দৃষ্টিতে দীপ্তির পানে চাহিয়া রহিল। এই তরুণীর দেহখানিকেই শুধু যৌবন সবুজ শ্রীতে মণ্ডিত করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই, ইহার মনটাও যৌবনের এই শ্রীতে অপরূপ সমুজ্জ্বল!

হঠাৎ দীপ্তি তার পানে চাহিতেই অরুণের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল সে কহিল,—চমৎকার জায়গাটি। আপনার রুচির তারিফ করতো হয়! সারা সহরটাকে বাদ দিয়ে কেন যে এ নির্জ্জন বনের কোলে বাসা নিয়েছেন, তা এখন বুঝলুম!—আইভি-লজের আশপাশের শোভা দেখে আমিও বিহ্বল হয়েছিলুম—কিন্তু এখানকার তুলনায় সে জায়গাকে কত খাটো বলে মনে হচ্ছে। দেখ্‌চি, বিদেশী আমরা এখানে এসে যে-সব জায়গা বেছে নিয়েছি, নয়ন-মনকে তৃপ্তি দিয়ে বাস করবো বলে, তার চেয়ে গরীব বাসিন্দারা ঢের ভালো জায়গায় এসে আস্তানা পেতেচে! ...ঐ নীচেকার ছোট কুঁড়ে ঘরগুলি...দেখুন তো, ও যেন মানুষের হাতে গড়া নয়। ওগুলি যেন কোন্ পরীর স্বপ্ন দিয়ে গড়া...! ঐ খাদ, ঐ এব্‌ড়ো পাহাড়ের গা, ঐ

ডোবাটি—তাদের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে কি চমৎকার শোভায়—ঝল্‌মল্‌ করছে !

দীপ্তি কহিল,—ছবি আঁকবেন

অরুণ একটু অবাক হইয়া দীপ্তির পানে চাহিল। দীপ্তি কহিল,—আশ্চর্য্য হচ্ছেন ! মানুষের আসল পরিচয় কখনো লুকোনো থাকে না ! পিশিমার কাছে আপনার গুণের পরিচয় পেয়েছি। আপনি যে একজন ওস্তাদ চিত্রকর, তা শুনেছি !...তা আঁকুন না ছবি। এখানকার মধুর স্মৃতি নীরস কলকাতায় অনেক সান্ত্বনা দেবে !...চলুন, সন্ধ্যা হবার আগে ঐ পাহাড়ের ওপরটা ঘুরে আসি ! সূর্য্যাস্তের যে শোভা দেখবেন, তা আর ভুলবেন না কখনো !

অরুণ সম্মত হইল। তখন দীপ্তি ছুটিয়া বাঙলায় গিয়া একটা গরম জাম্পার গায়ে দিয়া আসিল। তারপর দুইজনে পাহাড়ের গায়ে পাইন-ঝাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেল।

সারা পথ কথার আর অন্ত নাই ! দুজনে যেন কত কালের আলাপ—দুটী অন্তরঙ্গ বন্ধু ! যৌবনের প্রদীপ্ত আলোয় দুজনেরই প্রাণ উজ্জ্বল, ভরপুর...এবং মনের গতি দুজনেরই এক বলিয়া এক-নিমেষে দুজনের মধ্যে এমন সখ্য গড়িয়া উঠিল, যাহা বহু বহুবর্ষের আলাপেও একান্ত দুর্লভ !

অরুণ কহিল,—এই বয়সেই জীবনটাকে এত দিক দিয়ে আপনি নেড়ে-চেড়ে দেখেচেন যে, আপনার চিন্তা করবার

শক্তি দেখে মন শ্রদ্ধায় ভরে উঠছে! অন্ত মেয়ের কথা ছেড়ে দি, পুরুষও যে এভাবে জীবনটাকে ভেবে দেখে না!...

দীপ্তি কহিল,—আমার বয়স তখন পনেরো বছর—ম্যাট্রিক দি। দিয়ে নানা বই পড়তুম! সে-সময় বাবা একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়। প্রবন্ধটির নাম, সত্য ও মুক্তি। সেই প্রবন্ধ বিদ্যুতের মত আমার মনকে এক নিমেষে এমন চান্‌কে দিলে!...বাবা তাতে লিখেছিলেন,—সব ছেড়ে পৃথিবীতে আমরা একমাত্র সত্যের সন্ধান করবো—এবং যতদিন না এই সত্যের দর্শন পাবো, ততদিন আর-কিছুর পানে ফিরেও চাইবো না। সত্যকে পাচ্ছিনা বলে, একটা ছোট মিথ্যাকে ধরে অলস হয়ে বসে থাকবো না। আকুল প্রাণে সত্যের সন্ধান করা চাই। এর জন্য সমাজের বুকে যুগ-যুগ ধরে লালিত আচার-সংস্কার, রীতি-নীতির মোহ কাটিয়ে তাকে এ-সবের ঢের উর্দ্ধে নিয়ে যেতে হবে। এই সত্যকে পেলেই আমরা মুক্তি পাব...সত্য ছাড়া মুক্তির কোন আশা নেই!...এ পড়ে আমার মনে হলো, ঠিক কথা! সত্যই তো মুক্তি। মিথ্যা নিয়ে থাকার মানে, শৃঙ্খলে জড়িত থাকা—হাতে-পায়ে কঠিন শৃঙ্খল! সামাজিক নৈতিক যা-কিছু আচার মিথ্যাকে জড়িয়ে পড়ে আছে, সে-সব কেটে ছিঁড়ে মনকে মুক্ত করতে হবে, তবেই তার স্বাভাবিক বিকাশ হবে।...সেই দিন থেকে আমি মনকে প্রস্তুত করেছি, যেদিক থেকে পারি, এ বাঁধন কাটাবো। সেদিন থেকে আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, সত্যকে সন্ধান করা...সত্যকে জানা, সত্যকে

পাওয়া—বলিতে বলিতে দীপ্তি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। হঠাৎ থামিয়া পড়িয়া হাসিয়া সে আবার কহিল,—কিন্তু আমি কি, বলুন তো! কেবলি নিজের কথা কইছি। আপনাকে বেড়াতে নিয়ে এলুম, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-লীলা দেখাবার জন্য! কোথায় তা দেখবেন, না, আমার বকুনি শুনচেন!

অরুণ কহিল,—কিন্তু আপনার কথা আমার ভারী ভালো লাগচে। এই মুক্ত আকাশের তলায় মুক্তির এই বাণী—এ যে ভারী চমৎকার খাপ খাচ্ছে! তাছাড়া এ তো আপনার ঘরের কথা নয়, এ যে মুক্তি-প্রয়াসী মানবাত্মার জীবন্ত ইতিহাস। আপনি যে বিশ্বাস করে আমায় এ-সব কথা বলছেন, এর জন্য আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ!...আমি পুরুষ, আপনি নারী, এ কথাগুলো যদি আপনি আর-একজন নারীকে ডেকে শোনাতেন তাহলেও কথা ছিল! কিন্তু আমি পুরুষ বলেই নারীর মনের এ আকাঙ্ক্ষার কথা শোনবার আমার অধিকারও আছে। কেননা, যুগ-যুগ ধরে পুরুষ নারীকে শুধু বশে রেখে এসেছে—তার প্রাণের কথা শোনেনি, শুনতে চায়ওনি! আর এ তো আপনার নিজের কথাও নয়। এ যে বিশ্ব-নারীর প্রাণের কথা, তার ব্যাকুল মনের আর্ত্ত আবেদন এ!

দীপ্তি ভাবিতে লাগিল, ঠিক! এ কথাগুলা কোনো নারীর কাছে সেও তো বলিতে পারিত না এমন করিয়া!......

— ৩ —

সেদিন হইতে অরুণ ও দীপ্তির মধ্যে অন্তরঙ্গতা এমনি বাড়িয়া উঠিল যে, দীপ্তি যখন-তখন অরুণকে তার গৃহে ডাকাইয়া আনিত, এবং অরুণও সর্ব্বক্ষণ দীপ্তির এই আদর-আহ্বানটুকুর জন্য ব্যাকুলভাবে প্রতীক্ষা করিত।

দীপ্তির গৃহ-সংলগ্ন কানন-ভূমিতে বসিয়া অরুণ চারিদিককার ঐ মূক গাছপালা, গিরি-নির্ঝরের বহু ছবি আঁকিয়া ফেলিল। এই কঠিন উপত্যকা, ঐ শ্যামল বনানীকে তুলির লিখনে রঙে রঙাইয়া সে যেন কাব্য রচিয়া তুলিল।

দীপ্তি কখনো অরুণের পাশে আসিয়া বসিয়া তার ছবি আঁকা দেখিত, কখনো চঞ্চল মৃগের মত ছুটিয়া আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়াইত। এই তরুণ পুরুষটিকে তার ভালো লাগিত। তার হাসি, কথা, তার মনের স্বচ্ছন্দ ভঙ্গী দীপ্তির ভালো লাগিত। তার প্রাণ যে কত দিন ধরিয়া পিয়াসী হইয়া এমনি-একজন বন্ধুর সন্ধান করিয়াছে!

এমনি ভাবে আরো পাঁচ-সাত দিন কাটিয়া গেল। মাতঙ্গিনী দেবীর গৃহে সকালে একবার গিয়া চা ও জল-খাবার খাইয়া দুজনে বাহির হইয়া পড়িত। মাতঙ্গিনী দেবী মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাদের এই অন্তরঙ্গতা লক্ষ্য করিতেন, এবং তাঁর মনে এই অন্তরঙ্গতা এক সুমধুর সম্ভাবনার কথা বারম্বার জাগাইয়া তুলিত। তা কি হইবে…!

অরুণ এখনো বিবাহ করে নাই।...এ-বয়সে তরুণ-তরুণী দুজনেরই প্রাণে একটা কামনা কোথা হইতে জাগ্রত হইয়া ওঠে —সঙ্গ-লাভের কামনা। এ সময় মন এমন-একজনের সঙ্গ-প্রয়াসী হয় যে মনে-প্রাণে সহচর হইবে,—যাকে নিজের মনের অতি-গোপন কথাটি অনায়াসে বলা যায়, এবং যার কথাও তেমনি নিঃসঙ্কোচে শুনিবার সাধ হয়! আর সেই কথার মধ্যে নিজেকে যদি একটি ভালো আসনে অধিষ্ঠিত দেখি, তাহা হইলে তৃপ্তির আর সীমা থাকে না! এ বয়সটাই যে ভালো বাসিবার বয়স! এ-বয়সে যে ভালোবাসিবার সুযোগ বা প্রাণের জন না পায়, তার মত দুর্ভাগা আর নাই!...আহার-নিদ্রা জিনিষগুলা শরীরকে যেমন গড়িয়া তোলে, তেমনি তাকে সুখ দেয়, বাঁচাইয়াও রাখে! মন তেমনি যৌবনে যখন সঙ্গ-প্রয়াসী হয়, আর-একজনকে ভালো বাসিবার জন্য আকুল হয়, তখন তার সে গতি রোধ করিতে যাওয়া মূঢ়তা। তাহাতে মন তার স্বাভাবিক ভাবে বাড়িবার পথ না পাইয়া কুণ্ঠিত সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, এবং কাজেই অসুস্থতায় ভরিয়া ওঠে!

অরুণ যে এখনো বিবাহ করে নাই, তার কারণ, সে ব্যাপারটার দিকে তার খেয়াল হয় নাই। সমাজে এক শ্রেণীর লোক আছে, যারা বলে, সামর্থ্য হইলে বিবাহ করিব। ইহারা হিসাবী লোক, চারিদিক খতাইয়া শুধু স্বার্থ দেখে, ভালোবাসিবার তাদের শক্তি নাই, ভালোবাসিবার যোগ্যও তারা নয়। সংসারে জীবন-সঙ্গিনী খুঁজিতে গিয়া লাভ-লোকসানকে যারা আগে

খতাইয়া দেখে, তাদের প্রাণে প্রেমের উদার আলো-বাতাস ঢুকিবার উপায় কৈ !

সেদিন অপরাহ্নে অরুণ আর দীপ্তি দুরারোহ গিরিশৃঙ্গে চড়িয়া বসিয়া ছিল। পায়ের নীচে পাহাড়ের শ্রেণী সোপানের মত নামিয়া গিয়াছে। পথে বিচিত্র পোষাক-পরা নর-নারীর বিরাট মেলা···তাদেব কল-কোলাহল অস্ফুট রাগিণীর মত মাঝে-মাঝে ভাসিয়া আসিতেছে, ঐ দূরে পাহাড়ী মেয়েরা রঙীন ফুলে বেণী রচনা করিয়া, পিঠে শিশু ঝুলাইয়া পথ চলিয়াছে। অদূরে সূর্য্য পশ্চিমে হেলিয়া পড়িয়াছে, তার বিদায়ের অশ্রুময় দৃষ্টি হিমগিরিকে রক্তবর্ণে অভিষিক্ত করিয়া তুলিয়াছে। আশে-পাশে সবুজ পুষ্প-লতায় প্রকৃতির গা ঢাকা···চারিদিকে অপরূপ মাধুর্য্য !

এ মাধুর্য্যের মাঝে পাশে রূপের দীপ্তি-ভরা তরুণী দীপ্তি ! অরুণের মন মাতাল হইয়া উঠিল। দীপ্তির পানে সে চাহিয়া দেখিল। তার শরীর-মন কাঁপিয়া উঠিল। তারপর সে রুদ্ধ কণ্ঠে ডাকিল—দীপ্তি···

দীপ্তির মুখের উপর ছলাৎ করিয়া রক্ত-স্রোত বহিয়া গেল। তার দুই গাল আপেলের মত লাল হইয়া উঠিল।...সে ফিরিয়া চাহিল···

অরুণ পাগলের মত আকুল কণ্ঠে কহিল,—কি শুভক্ষণে যে এবার দার্জ্জিলিঙে এসেছিলুম, দীপ্তি...

দীপ্তি কোন জবাব দিল না, অরুণের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। তার বুকের মধ্যে কি-একটা দুলিয়া উঠিতেছিল !

অরুণ আবার বলিল,—না এলে তোমায় তো বন্ধু পেতুম না···এ যে আমার জীবনে কত-বড় লাভ—

দীপ্তির বুক আনন্দে-গর্ব্বে দুলিয়া উঠিল! সে নারী, তরুণী! তরুণের মুখের এ কথায় তার নারীত্ব একনিমেষে জাগিয়া বিপুল সার্থকতায় ভরিয়া উঠিল! পুরুষের চিত্ত-জয়ের বাসনা···নারীর যে তা প্রকৃতিগত, নারীর যে তা প্রাণ-অংশ। গর্ব্বে লজ্জায় দীপ্তি মুখ নামাইল; তারপর ধীরে ধীরে বলিল,—আপনার বন্ধুত্বও তো আমার কাম্য···

অরুণ কহিল,—আমি নাম ধরে তোমাকে 'তুমি' বললুম—আর তুমি 'আপনি' বলে এখনো সম্ভ্রমের ব্যবধান রাখচো, দীপ্তি! তুমিও 'তুমি' বলে কথা কও...

দীপ্তির বুকটা প্রচণ্ডভাবে দুলিয়া উঠিল। হাসিয়া সে অরুণের পানে চাহিল। কোথা হইতে কে যেন তার মাথাটাকে আবার জোর করিয়া নামাইয়া ধরিল! তারপর মুখ নীচু করিয়াই সে বলিল,—আপনাকে আমারো ভারী ভালো লাগে, সত্যি। মন আমার স্বীকার করছে এটা মস্ত সত্য, কাজেই তা বলতে আমার কুণ্ঠা হচ্ছে না।

অরুণ কহিল,—তোমার এ করুণা আমি কখনো ভুলবো না, দীপ্তি!···এই ক'দিন ধরে বিরল অবসরে তোমার কথাই আমি কেবল ভাবচি।···তুমি সর্ব্বক্ষণ আমার মন ভরে আছ!···এ যদি অপরাধ হয়ে থাকে, ক্ষমা করো—আমিও মনের এ নিবিড় সত্যকে তোমার কাছে আজ প্রকাশ করতে কুণ্ঠা বোধ করছি না।

দীপ্তি একটা নিশ্বাস ফেলিল,—তারপর কহিল,—আপনাকে…

—না, না, আপনি না। তুমি বল। তুমি, তুমি…

দীপ্তি হাসিল। হাসিয়া কহিল,—তোমাকেও যে যখন-তখন ডেকে পাঠাই,—কি তুমি ভাবো, জানিনা, বুঝিও নি কখনো…তবে শুধু এটুকু জানি যে, ডাকলে তুমি বিরক্ত হবে না!…তারপব সে মুখ নামাইল, মুখ নামাইয়া কহিল,—সত্যি, যতক্ষণ তুমি কাছে থাকো, এমন ভালো লাগে…তোমাব কথা আমিও সারাক্ষণ ভাবি…

দীপ্তি মুখ তুলিল। অরুণ দেখিল, সরমের রক্তিম রাগে দীপ্তির মুখ আবো রাঙা হইয়া উঠিয়াছে!

দীপ্তি কঠিন শিলাবক্ষে তৃণাচ্ছাদিত জায়গাটায় একটা হাত রাখিয়াছিল, অরুণ উচ্ছ্বসিত আবেগে সেই হাতখানি নিজের হাতে তুলিয়া দীপ্তির পানে চাহিয়া কহিল,—একটা কথা বলবো, দীপ্তি…যদি অভয় দাও তো বলি,…

—বল…

—তোমায় চির-জীবনের মত সাথী পাবার আশা করতে পারি…? বল দীপ্তি, বল, তুমি আমার হবে—?

—তোমার হবো?…

দীপ্তি যেন চমকিয়া উঠিল, স্থির দৃষ্টিতে অরুণের পানে চাহিয়া কহিল,—আমিও তাই ভাবছিলুম, অরুণ বাবু…যে তোমায় একেবারে নিজস্ব করে এঁটে রাখবার অধিকার আমার

আছে কি না ···!' এ যে স্বার্থপরের সাধ! তবে, এও ভেবে দেখেছি, আমার মন চায়, তোমার বন্ধুত্বের সেরা আসনখানি অধিকার করতে। তোমার বন্ধুদের মধ্যে আমি সেরা হয়ে থাকতে চাই, সবার আগে···! আমার মনের এ দুর্নিবার লোভকে কিছুতে আমি থামাতে পারছি না। তোমায় আমি ভালো বাসি!...তুমি আজ যখন আমায় ঐ স্বরে ডাকলে, যখন আমার হাত নিজের হাতে তুলে নিলে, তখন একটা শিহরণে আমার অঙ্গ বিবশ হয়ে এল...আমি বুঝচি, এ মনের ডাক। 'মনও এটা চায় এবং পেলে তৃপ্ত হয়'। এ সত্যের ডাক। নারীর প্রাণের অতি-সত্য কথা,—তাই তাকে আদর করে গ্রহণ করতেও আমি প্রস্তুত···

অরুণ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। দীপ্তির হাত ধরিয়াই সে আবেগ-ভরা কণ্ঠে কহিল,—আমায় তুমি ভালবাসো! দীপ্তি, দীপ্তি···

অরুণ উদ্ভ্রান্তের মত দীপ্তিকে একেবারে বুকের মধ্যে টানিয়া নিবিড় আলিঙ্গনে তাকে চাপিয়া ধরিল। দীপ্তির বুক উত্তেজনায় সঘন কম্পিত হইতেছিল।

দীপ্তি অরুণের পানে চাহিয়া···! দু'খানি তৃষিত অধর এত কাছে···আবেশ উছলিত! নিমেষে চেতনা হারাইয়া অরুণ দীপ্তির ছাড়ানো-বেদানার দানার মত রক্তিম অধরে চুম্বন করিল।

দীপ্তি কোন বাধা দিল না। তার শিথিল তনু বিবশ···!

দীপ্তি সে সুধা অরুণের অধরে ধরিয়া দিতে কোন নিষেধ তুলিল না, কোন কুণ্ঠা করিল না! দীপ্তি যেন নিশ্চেতন!

তারপর উভয়েই নীরব, স্পন্দনহীন! এ নীরবতার মাঝে দুজনের প্রাণের স্পন্দন এক বিচিত্র রাগিণীতে বাজিয়া চলিয়াছিল...

দীপ্তির শিথিল দেহ আলিঙ্গনে ধরিয়া অরুণ উচ্ছ্বসিত মৃদু কণ্ঠে কহিল,—তাহলে তুমি আমার হবে...? আমার হবে দীপ্তি? আঃ !

অরুণের বাহু-পাশ হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া দীপ্তি কহিল, —তোমার হবো! হবো কি! আমি তোমারই...! এই আমার দেহ অলসতায় ভরে লুটিয়ে পড়েছে তোমার বুকে...! আমায় নাও, নিয়ে যদি তৃপ্তি পাও...

এ কথাগুলা এমন স্নিগ্ধ সরল উচ্ছ্বাসে ঝরিয়া পড়িল যে অরুণ অবাক হইয়া গেল। সে দীপ্তির পানে চাহিল। দীপ্তির চোখের দৃষ্টি, দীপ্তির মুখ-শ্রী সরমের রাগে ভরিয়া উঠিয়াছে... তবু তার মধ্যে মাদকতার জ্বলন্ত শিখা কোথাও নাই! পূত-হৃদয়ের সরল ছবি, প্রদীপের স্নিগ্ধ আলোর মতই যেন সে শ্রী ঝলমল করিতেছে! এ দাহ-করা বহ্নি-শিখা নয়, এ যেন চারিধার আলোয়-আলো-করা স্নিগ্ধ প্রদীপের শিখা!

অরুণ কহিল,—তাহলে তোমার অনুমতি পেলে আমাদের বিয়ের ব্যবস্থা করি! যে-মতে বল তুমি...

—বিয়ে! দীপ্তি একমুহূর্ত্তে বাঁকিয়া উঠিল। কোথায়

মিলাইয়া গেল ভালবাসার সে নিবিড় স্বপ্ন! বিদ্যুতের মত তীব্র দৃষ্টিতে দুই চোখ ভরিয়া সে কহিল,—বিয়ে! বিয়ে আমি কখনো করবো না···কাকেও নয়···তোমাকেও না! বিয়ে করার কথা তুলচো কেন? সেই সমাজের দাস্য, আচারের দাস্য! কখনো না। মনের কাম্য সত্যকে ঠেলে, একটা মিথ্যা বাঁধনের আড়ালে আশ্রয় আর আত্মরক্ষার এ হীন প্রয়াস···? না।

অরুণের মনের উপরে কে যেন কশাঘাত করিল। বিস্মিত দৃষ্টিতে সে দীপ্তির পানে চাহিল।

দীপ্তির মুখে-চোখে দৃঢ়তার সুস্পষ্ট ছায়া! অরুণ বলিল,—এ কি বলচো তুমি দীপ্তি! বিয়ে নয়? তবে···! তবে এই ভালোবাসার সার্থকতা, এই আকুল তৃষ্ণা···?

দীপ্তি সে কথায় বাধা দিয়া স্থির কণ্ঠে উত্তর দিল—তাকে তৃপ্ত করায় বাধা কি! তোমায় তো বলেছি আমি, নারী তার সেই চির-পুরোনো বদ্ধ প্রথার শিকল টেনে আবার ঘরের মধ্যে গিয়ে তার সে জীর্ণ আসন পেতে বসবে না! তোমার সঙ্গে এতদিন তো এ-সব বিষয়ে অনেক কথা কয়েছি আমি···। অন্য মেয়েদের মত অন্ধভাবে কতকগুলো মন্ত্র আর আচার-অনুষ্ঠানকে সামনে ধরে, তাদের মেনে তবেই আমাদের নতুন পথে যাত্রা করতে হবে...! কেন? সেই আচার-অনুষ্ঠান না হলে আমাদের এ প্রাণের বাঁধন, এই প্রীতি, এ সখ্য, এ ভালোবাসা বাষ্পের মত বাতাসে মিলিয়ে যাবে! আমাদের এ ভালবাসা এত দৃঢ়, এত গাঢ় নয় যে শুধু তারি

জোরে আমাদের সারা জীবন এক হয়ে গড়ে উঠবে না ? তাকে দৃঢ় করার জন্যে চাই সেই কচুকেলে বদ্ধ সংস্কার, সেই পুরানো পচা আচার-অনুষ্ঠান···?

অরুণ কহিল,—কিন্তু সুদূর ভবিষ্যৎ···! সে কথা ভেবেছ কি ? আমাদের প্রেম আর-কিছুর সাহায্য চায় না দীপ্তি, তার ভিত্তির জন্য, দৃঢ়তার জন্য, এ কথা আমিও মানি! কিন্তু যে-সন্তানের আমরা জন্ম দেব, তাকে সমাজের সামনে দাঁড়াবার মর্য্যাদা...? তার জন্য...?

দীপ্তি ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—সমাজ ছাপ মেরে না দিলে সে দাঁড়াতে পারবে না, তার নিজের মনুষ্যত্বের জোরে...? শোনো, আমি এ সামাজিক ছাপ নিতে রাজী নই! বিবাহের মানে এ নয় যে, পাঁচজন লোক ডেকে রাঙা কাপড় পরে কতক-গুলো মন্ত্র উচ্চারণ করতে হবে! গোত্রে-গোত্রে মিল করে আবার সে মন্ত্র পড়তে হবে! বিবাহের অর্থ, দুটী প্রাণ সুখে-দুঃখে মিলে এক হয়ে যাওয়া। তাতে প্রাণের সাড়াটাই যে সব-চেয়ে বড় জিনিষ! দুটী প্রাণ যদি পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত, আসক্ত হয়ে ওঠে, পরস্পরকে আপন বলে খোঁজে, ডাকে, তবে সে ডাক অস্বীকার করে কতকগুলো বাঁধা মন্ত্র আউড়ে না গেলেই কি বিবাহের সার্থকতা থাকবে না ? কখনো না!···মন্ত্র পড়ে এক ঘরে দুজনে ঢুকলো বাস করতে, পুরুষ আর নারী...মনের কোনোখানে তাদের মিল নেই, সারা জীবনেও মিল হবে না হয়তো, আজীবন অশান্তি-ভরে দুজনে মনে ঝড় তুলে দিন

কাটাতে থাকবে—এই বিয়েই সার্থক হবে শুধু মন্ত্র আওড়ানো হয়েছে বলে! এইটেকেই সমাজ বলবে, বিবাহ! আর মন্ত্র পড়িনি বলে, আমাদের এ মিল, এ নিবিড় অনুরাগ একেবারে ব্যর্থ হয়ে যাবে! সমাজ একে প্রশ্রয় দেবে না, একে উপেক্ষা করবে, ঘৃণা করবে···আর সেই সমাজকে আমরা দেবতা বলে মাথায় তুলে ধরবো! এত-বড় মিথ্যাকে গলিত শবের মত সারা জীবন বয়ে বেড়ানো—এ আমার দ্বারা হবে না···কখনো না, শত সহস্র সুখের প্রলোভনেও না।

অরুণ বিমূঢ়ের মত বসিয়া রহিল। দীপ্তি কহিল,—আমি জানি, তুমি যা বলবে...! তুমি বলবে, এ সংস্কার ভাংতে তুমিই বা এত বেদনা সইবে কেন? এত বড় ত্যাগকে মাথায় তুলে নিয়ে সমাজের লাঞ্ছনা, সমাজের গ্লানি-কুৎসা ভোগ করবে কেন? এই তো? কিন্তু এরো জবাব আছে···একটা চিরকেলে পুরানো সংস্কারকে যে হঠাতে যাবে...তাকেই গভীর নির্য্যাতন সইতে হবে। পৃথিবীর সর্ব্বত্র তা ঘটেছে,···তবু সত্য-সন্ধানী লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হননি। বিপুল গৌরবে অটল ধৈর্য্যে তাঁরা এ-সব নির্য্যাতন মাথায় তুলে সহ্য করেছেন বলেই জগতের লোক আজ অনেক সত্যের পরিচয় পেয়েছে! আমিও তেমনি যখন সত্যের সন্ধানে বেরিয়েছি, তখন সব বিপদ স্বীকার করে এ লাঞ্ছনা-ভোগ জেনেই আমি তা বইতে প্রস্তুত হয়েছি! আমার বিবেক বলচে, এতদিন যে সত্যকে অবলম্বন করে এসেছ, আজ এক তৃপ্তির মোহে তাকে বিসর্জ্জন দিয়ে

ফেলবে।...না, এত-বড় কাপুরুষতা আমি ঘটতে দিতে পারবো না। এর জন্যে যদি তোমায় হারাতে হয়, তবু না! আমার বিবেকের বাণীকে জীবনের সব কর্ম্মে শিরোধার্য্য করতে গিয়ে বুক যদি আমার ভেঙে চুর হয়ে যায়, তবু আমায় তা সহ্য করতে হবে!...আমি নিরুপায়!

উত্তেজনায় দীপ্তির চোখে জল ছাপাইয়া আসিল। অরুণ মুগ্ধ দৃষ্টিতে দীপ্তির পানে এতক্ষণ চাহিয়াছিল, কি তীব্র তেজে, কি সরল যুক্তিতে ভরা এই তরুণীর মন!

অরুণ বলিল,—কিন্তু তোমার বিবেককে ক্ষুণ্ণ করতে বলছি না তো!...এ শুধু একটা রীতি ক্ষণেকের জন্য পালন করা বৈ আর কিছু নয়। একটা form-মাত্র, বিয়ের অনুষ্ঠান, এ একটা show-মাত্র...

দীপ্তি কহিল,—না।...যাকে মিথ্যা বলে জানি, যাকে প্রাণের মধ্যে স্বীকার করতে পারি না, সে কাজ আমি করতে পারবো না। বলেছি তো, জীবনের সার তৃপ্তির লোভেও না...! এমন কি, তুমি যদি আইন-মতে রেজিষ্ট্রী করে বিয়ের কথা বল, তাতেও আমি রাজী নই! এত-বড় হাস্যকর ব্যাপার আর আছে! দুটী প্রাণ চির-জীবনের মত মিশছে, পরস্পরকে ভালবাসতে, পরস্পরকে সঙ্গ দিতে, তৃপ্তি দিতে, সুখী করতে—তাতেও লেখাপড়া চাই, সাক্ষী ডাকা চাই! প্রাণের কারবারটাও তেজারতির মত ব্যবসার সামগ্রী! আশ্চর্য্য এই সব লোকের মনের গতি, যারা এই আইন গড়েছে!

অরুণ কহিল—কিন্তু সমাজ গড়তে গেলে, তাকে রাখতে হলে আইন-কানুনের দরকার হয় বৈ কি দীপ্তি···যদি কেউ অপরের হকে হস্তক্ষেপ করতে যায়! সকলেই তো ভালো নয়—তাই প্রবলের অত্যাচার থেকে দুর্ব্বলকে রক্ষা করার জন্য আইনের শাসন খাড়া রাখতে হয়!

দীপ্তি কহিল—আইন হোক চোরকে সাজা দিতে, ঠককে ঠেকিয়ে রাখতে। স্ত্রী-পুরুষের মনের মিলনকে আইনে বেঁধে না দিলে সমাজ থাকবে না! সে সমাজ না থাকুক—! প্রীতি-ভালবাসার বাঁধনে যে-মন বাঁধা পড়ে না, এত-বড় সত্য যাকে ধরে রাখতে পারে না—রাজার শাসন, জেল আর জরিমানার ভয় দেখিয়ে তাকে ঠেকিয়ে রাখবে! মানুষের মনের উপর এ যে ভারী কঠিন পরিহাস!···নয় কি?

অরুণ কহিল,—ভেবে দেখলে, তাই বলতে হয়। তবু—

দীপ্তি বাধা দিয়া কহিল,—এর মধ্যে তবু নেই, কিন্তু নেই —এ সত্যের পথ...সরল সিধে পথ···

অরুণ কহিল,—আমি শুধু সমাজের মিথ্যা কুৎসা থেকে, জঘন্য আলোচনা থেকে আমাদের এই পবিত্র মিলনটুকুকে রক্ষা করবার জন্যই বিয়ের কথা তুলেছি, দীপ্তি—

দীপ্তি কহিল—এর জবাবও আমি দিয়েছি। এ-ভাবে মিথ্যার সাহায্যে আমি আত্মরক্ষা চাই না। আমি শুধু চাই, তোমার ভালবাসা। আমার এই মুখ-চোখ, আমার এই অবয়ব, আমার এই রূপ, আমার এই যৌবন—যা অপর নারীরও আছে

—এগুলিকেই তুমি ভালবাসবে,? সে ভালবাসার কাঙাল আমি নই। আমি চাই, আমার ভিতরটাকেও তুমি ভালবাসবে—আমার সাধ-আশা, আমার আকাঙ্ক্ষা, এদেরো...পরিপূর্ণভাবে। তা যদি না পারো—দীপ্তি থামিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিল, তারপর মুখ নামাইয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল,—ভালবেসো না।... আমার এই সাধ-আশা নিয়েই আমার আমিত্ব। সেটুকুকে যদি ভালো না বাসলে, তাহলে, এ রূপ, এ যৌবন—? আরো মধুর তুমি অনেক পাবে! আর আমার যে-আমিত্বের আমি গৌরব করি, যেখানে আমার বৈশিষ্ট্য, সেটাকে তুমি গ্রহণ করলেই আমার তৃপ্তি হবে। ভাববো, এমন একজন পুরুষ রয়েছে আমার সঙ্গী, বন্ধু—যে আমার এ বৈশিষ্ট্যকে দরদ করে, স্বীকার করে, ভালোবাসে।...আমিও তাই বুঝেছিলুম। আর তাই বুঝেই তোমার হাতে নিজেকে তুলে দিতে প্রলুব্ধ হয়েছি। তোমায় ভালবেসেছি—ওগো, তুমি আমায় নিরাশ করো না। আমায় তুলে ধর, আমায় শক্তি দাও, উৎসাহ দাও, বিপুল গৌরবে আমায় ভরিয়ে তোলো...।

নিতান্ত নিরুপায়তার মধ্য হইতে আশ্রয় মাগিয়া অধীর আগ্রহে দীপ্তি অরুণের দিকে দুই হাত বাড়াইয়া দিল। অরুণ সে হাত দু'খানি লইয়া একেবারে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল। কি সে আনন্দ দীপ্তির বুকে! যেন প্রলয় ঝড়ে সমুদ্র তুমুল তরঙ্গে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে!...অরুণ রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল,—তোমার তৃপ্তির জন্য আমি সব পারি, দীপ্তি...তোমার

এ আকাঙ্ক্ষায় আমার কি সহানুভূতি! সে কি কেবল আমার মুখের কথা!...বেশ...আমায় দূর করে দিয়ো না...আমায় ভাববার একটু সময় দাও...এ জীবন-পণের কথা—! তোমার আশা ত্যাগ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি যেন ঐ পাহাড়ের শিখরে উঠে দাঁড়িয়েছি...স্বর্গ আমার হাতের নাগালে, —কিন্তু তা পেতে হলে আমায় সাবধানে এগুতে হবে, বেঘোরে পা দিলে নৈরাশ্যের কোন্ পাতালে পড়ে এখনি চূর্ণ হয়ে যাবো... আমায় একটা রাত্রি সময় দাও, ভাবতে...

অরুণ দীপ্তিকে বাহু-পাশ হইতে মুক্ত করিল। দীপ্তি একটা নিশ্বাস ফেলিল। অরুণের আলিঙ্গন তাহার সারা চিত্তকে উদ্বেলিত করিয়া তুলিয়াছিল।

নিশ্বাস ফেলিয়া দীপ্তি কহিল,—তাই হোক্। কিন্তু মনে রেখো, আমার পণ!...তুমি ভাববে, আমার এ পণ পাগলের খেয়াল, এ ক্ষণিকের! তুমি ভাববে, বিলিতী উপন্যাসের নায়িকাদের ধরণে আমি একটা বিশ্রী স্বপ্ন দিয়ে আমার মনকে গড়ে তুলেছি। পড়ায় আমার মন কতক জোর পেয়েছে, স্বীকার করি। কিন্তু এ ক্ষণিকের মোহ বা খেয়াল নয়। আমি এ নিয়ে অনেক ভেবেছি। বাপের স্নেহ মার ভালবাসা এই মতের জন্যই কেটে চলে এসেছি—একা, এই নিঃসঙ্গ জীবন বইতে!...আমার মন মুক্তি চায়, কোনো পাশে সে বাঁধা পড়বে না।...তোমায় আমি ভালবাসি। জীবনে এমন ভালো কাকেও বাসিনি। আমি তোমার, সম্পূর্ণভাবে তোমারি

হতে প্রস্তুত—কিন্তু তার মধ্যে বিয়ের এ মিথ্যে বাঁধন আনা কেন! তার জন্য তুমি আমায় যদি ঘৃণা কর—দীপ্তি অরুণের পানে চাহিল। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া আবার কহিল,—উপায় নেই! তাও আমায় সইতে হবে। আমার বিবেকের ডাক অগ্রাহ্য করে, ঐ তৃপ্তি-সুখ মাথায় তুলে নিতে পারবো না আমি!... আমার দেশের নারীজাতি একদিন যদি আমার এ ত্যাগের ফল ভোগ করতে পায়...! সেই আশার আনন্দে সব দুঃখই আমি শান্ত হয়ে সইতে পারবো!...আমি আজ জগতে নারী-জাতির স্বত্ব-রক্ষার জন্য দাঁড়িয়েছি...তুমি বলবে, সভ্য-দেশে কেউ এ পারেনি। এ দেশে এ চেষ্টা ভয়ানক বাতুলতা ছাড়া আর কিছু নয়! তবু এই আমার লক্ষ্য, এই আমার পণ... এ পণ রক্ষার জন্য আমি আমার স্বর্গসুখও বিসর্জ্জন দিতে পারি...বলেছি তো, এতে তোমার বুক ভেঙ্গে গেলেও আমায় তা সহ্য করতে হবে! বুঝতে পেরেছ!···বেশ, প্রেমের উচ্ছ্বাস আর নয়। সন্ধ্যা হয়ে এলো। চল, বাড়ী যাই।

দীপ্তি উঠিয়া দাঁড়াইল, অরুণও মন্ত্র-চালিতের উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপর পাহাড় বহিয়া নামিয়া দুইজনে পথে আসিল। সবুজ মখমলের মত শ্যাম-বনানীর গায়ে তখন চুমকির মত জোনাকির আলো ফুটিয়া উঠিয়াছে!...ঝিল্লী রাগিণী ধরিয়াছে, ঝিম্-ঝিম্!

— ৪ —

সারা রাত্রি অরুণ ভালো করিয়া ঘুমাইতে পারিল না। খাইতে বসিল, কিন্তু খাওয়ায় রুচি নাই। লজের কর্ত্রী অনুযোগ করিলে বড় মাথা ধরিয়াছে বলিয়া অরুণ উঠিয়া পড়িল ও একেবারে গিয়া শয্যায় আশ্রয় লইয়া ভাবনার রাশ ছাড়িয়া দিল!...এ কি বলে দীপ্তি? বিবাহ নয়? বিবাহ না করিয়া মিলনকে সার্থক করা যে কতখানি অসম্ভব, একটা মতের প্রবল মোহে পড়িয়া দীপ্তি তা বুঝিতে পারিতেছে না! সে শুধুই সুন্দরী তরুণী নয়, শিক্ষিতাও। অথচ এত-বড় অসম্ভব ভুল তার চোখে পড়িতেছে না?...অরুণের মনে হইল, বইয়ে যে সে পড়িয়াছে, gipsy love-এর কথা, এ তো তাই। বিবাহ-বন্ধন নাই, অথচ ঘর-কর্ণা চলিয়াছে! প্রেমের সহস্র আহ্বানে সাড়া দিয়া, কোন দায়িত্বে ধরা না দিয়া তার সর্ব্বনাশী ক্ষুধা মিটাইয়া চলিয়াছে! এ যে আগাগোড়া এলোমেলো ব্যাপার! এ যে যে-কোন মুহূর্ত্তে ছিঁড়িয়া যাইতে পারে! এ প্রেম মোহ-কেই আঁকড়িয়া একটা পঙ্কিল গহ্বরে পড়িয়া থাকিতে চায় যে! কোনরূপ দায়িত্বের উপর যে প্রেমের ভিত্তি স্থাপিত নয়, কতক্ষণ সে টিঁকিয়া থাকিতে পারে! কে বলিবে. যৌবনোদ্ধত মনের ক্ষণিক খেয়াল এ নয়!

অরুণ ভালো করিয়া আগাগোড়া ব্যাপারটা পরীক্ষা করিতে লাগিল। সে যে দীপ্তিকে খুব ভালো বাসিয়া ফেলিয়াছে, তাতে

আর ভুল নাই! অথচ প্রথম যেদিন প্রভাতে তাকে সে দেখিল, তার রূপ, তার কথাবার্ত্তা, তার স্বচ্ছন্দ সহজ ভঙ্গী তাকে মুগ্ধ করিয়াছিল, সত্য,—কিন্তু সে যে অন্ধভাবে দীপ্তিকে ভালো বাসিয়া ফেলিবে, এ কথা তার মনে তখন উদয় হয় নাই তো!...জীবনে কত তরুণীর দেখা মিলিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কাহারো সঙ্গে সে মিশিয়াছে, ঘনিষ্ঠভাবেই মিশিয়াছে, অনেককে দেখিয়া তার পছন্দও হইয়াছে—নিজের মনকে সে কতবার প্রশ্ন করিয়াছে, ইহাকে চির-জীবনের সাথী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি কি? মন উত্তর দিয়াছে, না! ফস্ করিয়া চির-জীবনের জন্য গ্রহণ করিবে?—না, আরো দেখ, আরো প্রতীক্ষা কর!…কিন্তু দীপ্তি...! কোথা হইতে এমন অতর্কিতে সে যে সারা মনটাকে জুড়িয়া বসিল… তাহার মধ্যে সে প্রশ্ন করিবার, বা দ্বিধা তুলিবার অবসরও পায় নাই! হঠাৎ আজ সন্ধ্যা বেলায় পাহাড়ের শ্যামল উপত্যকায় বসিয়া থাকিতে থাকিতে তার মন একেবারে আকুল-আবেদনে ভরিয়া উঠিল,—দীপ্তিকে চাই, চাই, চাই! দীপ্তিই তার প্রাণের একমাত্র কামনা,—ইহাকেই যেন সে এতদিন খুঁজিতেছিল! দীপ্তি…! দীপ্তিকে না পাইলে তার মন চির-অন্ধকারে ভরিয়া যাইবে। দীপ্তিকে না পাইলে তার জীবন-মন নিরর্থক হইয়া পড়িবে!...

কিন্তু এই যে চাওয়া…! অরুণ চমকিয়া উঠিল। তার চোখের সামনে দীপ্তির সেই করুণ মিনতি-ভরা মূর্ত্তি কি দীনবেশে

ফুটিয়া উঠিল ! ওগো আমায় তোলো, আমায় শক্তি দাও, উৎসাহ দাও ! আহা, বেচারী অসহায়…! সে যে বড় আশায় অরুণের পানে চাহিয়া আছে, আশ্রয়ের জন্য । একা এই বিবেকের বাণী সম্বল করিয়া সারা দুনিয়ার সঙ্গে লড়িয়া দীপ্তি কাতর শ্রান্ত অবশ হইয়া পড়িবে, তাই সে অরুণকে পাশে চায় তাকে সুস্থ সবল রাখিতে, তার প্রাণে উৎসাহ জাগাইতে, শক্তি সঞ্চার করিতে…! তাকে সাহায্য না করিয়া নিবৃত্ত না করিয়া, এই ঝড়ের মুখেই তাহাকে সে ছাড়িয়া দিবে ! এই সংগ্রামে তার অসহায় মন যে ছিঁড়িয়া চূর্ণ হইয়া যাইবে…! না, না, তাকে স্নেহ বেদনার হাত হইতে রক্ষা করা চাই ! না করিলে অরুণের পৌরুষ ধিকৃত হইবে. তার মনুষ্যত্ব লাঞ্ছনায় ভরিয়া উঠিবে !—সে যে তাকে কত বড় আশা দিয়া বলিয়াছে, তার জন্য সে সব করিতে পারে…

সে কথাটা মোহের ছলনা ? মিথ্যা…? না। অরুণ তা ঘটিতে দিবে না !…তবে . ? কিন্তু এ কত-বড় ত্যাগ তাকে স্বীকার করিতে হইবে ! বাপ-মার এতখানি স্নেহ…বিশ্বাস ! …এক তরুণীর কাতর দীর্ঘশ্বাসে সে সব উড়াইয়া দিবে ! এ বিবাহ-হীন মিলনে তাঁদের মাথা হেঁট হইবে, তাঁদের প্রাণে যে ইহা বাজের মত বাজিবে !…আর তার উপর,— এ-মিলনের অর্থ, বাপ-মার স্নেহের বন্ধন কাটিয়া মুক্ত জগতে বাহির হইয়া পড়া, একা !…একা নয়, দীপ্তি সঙ্গে থাকিবে…! কিন্তু বাপ-মার অপরাধ ? তাছাড়া সমাজের সঙ্গে আজীবন লড়িতে হইবে !

সে তো বড় হইয়াছে, নিজের বুঝিবার শক্তি হইয়াছে... নিজে যা ভালো বুঝিবে, করিবে। তাহাতে বাপ-মার বাধা দেওয়া উচিত নয়, বুঝি...! তবু...

এ তবুর মীমাংসা হয় না!...যেখানে পরের স্বার্থের সঙ্গে নিজের স্বার্থ মিশে, সেখানেই এ বিরোধ, সেখানেই এই তবু, এই কিন্তু মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিতে চায়! তাই বলিয়া যা ভালো, তা ছাড়িয়া দিতে হইবে! সত্যকে ছাড়িয়া মিথ্যাকে লইয়া বেড়াইতে হইবে! দীপ্তি ঠিক বলিয়াছে—না!

অরুণ ভাবিল, আমাদের এই জীবনটাকে সত্যের দিক হইতে টানিয়া কি কতকগুলা কৃত্রিম জটিল বাঁধনে আমরা জড়াইয়া রাখিয়াছি! মনকে চারিধার হইতে কষিয়া বাঁধিবার এ যে বিপুল ষড়যন্ত্র! এ ষড়যন্ত্র সহিয়া থাকা মূঢ়তা, কাপুরুষতা! এর চেয়ে নিঃসঙ্গ থাকিয়া একমাত্র সত্যকে গ্রহণ করা ভালো! সে যে মুক্তি!

দীপ্তির কথাই ঠিক! দীপ্তিকে গ্রহণ করিতে হইবে। দীপ্তি একা...সে আশ্রয় চায়। তার এই আশা, এ তো অন্যায় নয়! সে তো জানে, দীপ্তির চিত্ত কি নির্ম্মল, কতখানি বিশুদ্ধ, পবিত্র তার এই অভিপ্রায়—এর কোথাও এতটুকু মালিন্য নাই! ঐ যে হিমগিরির শিখায় ঐ তুষারস্তূপ, উহারি মত শুভ্র, অনাবিল!...এ আশ্রয় হইতে তাকে বঞ্চিত করিলে তার যে দুর্দ্দশার আর সীমা থাকিবে না। বাপ-মার আরো সন্তান আছে, নির্ভর করিবার মত অনেক বস্তু আছে। কিন্তু দীপ্তির? আহা, বেচারী! তার আর কেহ নাই, কিছু নাই! একা এ জীবন

বহিয়া তাকে চলিতে হইবে, শুধু তার ঐ বিবেকের ইঙ্গিতে! তাকে আশ্রয় না দেওয়া—নিষ্ঠুরতা!

কিন্তু এ আশ্রয় দিবার পর...? সমাজ একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিবে। সমাজ বলিবে, এক দুর্ব্বল অসহায় তরুণীকে সে লালসায় ভুলাইয়া তার গৃহ-কোণ হইতে টানিয়া আনিয়াছে! তাকে পত্নীর মর্য্যাদা না দিয়া হেয় গণিকার মত রাখিয়াছে! তার যৌবন-সুধা পানের ব্যাকুল বাসনায় তাকে আনিয়া পথের ধূলায় লুটাইয়া দিয়াছে...! কি জঘন্য কুৎসা, কি হীন গ্লানি, কি দুনামের পঙ্কেই না দীপ্তির নামটাকে লাঞ্ছিত ঘৃণিত নিপীড়িত করিয়া তুলিবে! সমাজের কেহ তো জানিবে না, বিবেকের কত-বড় আশ্বাসে নিজেকে দীপ্তি আজ বলি দিতে বসিয়াছে... তার সমস্ত জাতির জন্য সে কত-বড় ত্যাগকে মাথা পাতিয়া লইয়াছে! আমাদের এই মূঢ় সমাজ বাহিরটা দেখিয়াই মানুষের বিচার করিয়া বসে, ভিতর জানিবার জন্য তার চেষ্টা নাই, ইচ্ছাও নাই।...এ সমাজকে দীপ্তি যে মানিতে চায় না, এ তো সে ঠিক করে...তবু...

আবার সেই তবু...! সন্তান যারা আসিবে, তারাও যে সমাজের ঐ ভ্রূকুটির হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবে না!... তাছাড়া তার ভালবাসার জন্য, তার তৃপ্তির জন্য দীপ্তিকে সে সমাজের এই ঘৃণিত লাঞ্ছনার মধ্যে আনিয়া ফেলিবে, এও কি ঠিক! ...দীপ্তি অন্ধ মোহে যেটাকে সত্য বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে —সেটা সত্য কি না, তা না বুঝিয়াই তাতে তাকে

আরো প্রশ্রয় দিবে—? সে না দীপ্তিকে ভালবাসে! দীপ্তি না তাকে বিশ্বাস করে! সে না তার বন্ধু!—দীপ্তি অন্ধ মোহে যদি দেখিতে না পায়, সে তো দেখিতেছে—সে ভবিষ্যৎকে ভালো করিয়া দেখাইয়া দেওয়া কি তার কাজ নয়!...আজ প্রথম যৌবনের প্রমত্ত খেয়ালে পর্ব্বত-শৃঙ্গ হইতে কোন্ অজানা অতলে ঝাঁপ খাওয়া—এখন নয় কোথাও বাধিবে না! কিন্তু একবার পড়িলে উঠিবার যে সম্ভাবনাও থাকিবে না!...দশ বৎসর পরে যৌবনের এ উদ্দাম চাঞ্চল্য যখন মিলাইয়া যাইবে..., তখন এই মুহূর্ত্তটি ভাবিয়া প্রাণ যে অনুতাপে গ্লানিতে ভরিয়া যাইবে! আর ভরিয়া গেলেও উঠিবার তখন কোন সম্ভাবনা থাকিবে না! দীপ্তি আজ যৌবনের চাপল্যে গিরি-শৃঙ্গ হইতে দুঃসাহসে ঝাঁপ খাইতে চলিয়াছে, সে কোথায় তাকে টানিয়া ফিরাইবে,—না, সেও তার উদ্দাম চাঞ্চল্যে সায় দিবে! শুধু সায় দেওয়া নয়, তাকে ঠেলা দিয়া তার ঝাঁপ খাওয়ায় আরো সহায়তা করিবে! ছি, এই তার ভালবাসা! শুধু নিজের স্বার্থই সে খুঁজিয়া ফিরিবে!...না। যে চির-পরিচিত পথে সকলে যুগ-যুগ ধরিয়া চলিয়াছে, সেই পথই চলার পথ,—পর্ব্বত-শৃঙ্গ হইতে অজানা অতলে ঝাঁপ খাওয়া—এ তো পথ চলা নয়! এ যে মৃত্যুকে বরণ করা! দীপ্তিকেও সে তাই বুঝাইয়া, গতানুগতিক পথেই তাকে ফিরাইয়া আনিবে। তার এই উদ্দাম আকাঙ্ক্ষাকে শান্ত স্নিগ্ধ মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া তাকে তার যোগ্য স্থানটিতেই ফিরাইয়া আনিবে! এ যদি না পারে তো তার ভালবাসায় ধিক, তার শিক্ষাতেও ধিক!

বাহিরে বৃষ্টি পড়িতেছিল—ঝম্‌ঝম্‌, ঝম্‌ঝম্‌। বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা সার্সির কাচে মুহুর্মুহু আঘাত করিতেছিল। তার মনে হইল, ও যেন প্রকৃতির কাতর আর্ত্তনাদ! সমাজের আকুল নিষেধ ...ওগো, উদ্দাম স্রোতে বহিয়া যাইয়ো না গো! চাহো, ফিরিয়া চাহো, তোমার পিতৃ-পিতামহের চির-সনাতন সমাজ তোমার পিছনে কাঁদিয়া আছড়াইয়া পড়িতেছে!...সে কান্নাকে উপেক্ষা করিয়া কোন্ অজানা সমুদ্রে পাড়ি দিয়ো না, দুইজনে।...ঠিক! অরুণ ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিল। বাহিরে তখনো বৃষ্টি পড়িতেছে —ঝম্‌ঝম ঝম্‌ঝম্‌।

অরুণ ভাবিল—না, দীপ্তিকে সে ফিরাইবেই! তাকে এ সর্ব্বনাশের নেশায় আরো বিভোর করিয়া, এ সর্ব্বনাশের পথে কখনো সে ছাড়িয়া দিবে না! প্রাণের মিনতি তুলিয়া সে বলিবে, দীপ্তি, তুমি ফেরো ফেরো, স্নেহ-প্রীতি উদারতা দিয়া মানুষ যুগ-যুগ ধরিয়া যে নীড় রচনা করিয়াছে, তার শত দোষ থাক্, তা মিথ্যা হোক্, তবু সে কত মায়া-প্রীতির স্মৃতির উপর গড়িয়া উঠিয়াছে! ছোট নীড়...তাকে কঠিন সত্যের আঘাতে নাই বা চূর্ণ করিলে, বন্ধু!

— ৫ —

পরদিন সকালে মাতঙ্গিনী দেবীর গৃহে গিয়া অরুণ দেখিল, দীপ্তি সেখানে বেশ গল্প জমাইয়া দিয়াছে! কাল যে জীবনের অত-বড় একটা সঙ্গীন মুহূর্ত্ত আসিয়া উদয় হইয়াছিল, দারুণ

সমস্যার মেঘ বুকে লইয়া···তা তার কথার ভঙ্গী শুনিয়া বুঝাও যায় না! তবে মুখ-চোখ শীর্ণ দেখাইতেছিল!

অরুণ ভাবিল, তবে কি তাহারি মত দুশ্চিন্তায় উদ্বেগে দীপ্তিরও রজনী কাল অনিদ্রায় কাটিয়াছে! তাই। নহিলে এমন বৃষ্টি-ধোয়া স্নিগ্ধ প্রভাতে দীপ্তিকে এমন মলিন দেখাইত না কখনোই!

তার মনে একটু আনন্দও হইল! দীপ্তিও তবে তাহাকে তাহারি মত ভালো বাসিয়াছে—এবং আসন্ন বিচ্ছেদের আশঙ্কায় তার মনও এমনি কাতর বিচলিত হইয়াছে!···

মাতঙ্গিনী দেবী কহিলেন,—তোমার আজ একটু দেরী হয়ে গেছে অরুণ!

অরুণ কহিল,—হ্যাঁ। রাত্রে বৃষ্টির সময় ঘুমটা ভেঙ্গে গেছলো —তারপর শেষ-রাত্রের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম বলে উঠতে দেরী হয়েছে!···

মাতঙ্গিনী দেবী কহিলেন,—আজ কোন্ দিকে বেড়াতে যাচ্ছ তোমরা?

দীপ্তি তাড়াতাড়ি উত্তর দিল, কহিল,—বোর্ হিলের দিকে, পিসিমা।

মাতঙ্গিনী দেবী হাসিয়া কহিলেন,—দুজনে তোমাদের তর্ক-বিতর্ক তো চলছে খুব? সনাতন বিধি-আচার, এগুলোকে চার হাতে ঠেলে ফেলার ষড়যন্ত্র!···

কথাটা শুনিয়া দীপ্তি হাসিল, কিন্তু অরুণের সারা অন্তর

কাঁপিয়া উঠিল! ঠিক, এ যে প্রবল ষড়যন্ত্র—এতদিনকার যত্নে-পড়া এই বিরাট সমাজ-সৌধ,—তার বিরুদ্ধে এ তো বিদ্রোহের অভিযানই!.. পিতার কথা মনে পড়িল। কথায় কথায় একদিন তিনি বলিয়াছিলেন, ভাঙ্গা ভারী সহজ অরুণ...গড়ায় যে কি মেহনৎ, কি প্রাণপাত চেষ্টা, তা কখনো ভেবে দেখেচো কি? যেখানটা জীর্ণ, সেখানটা সারিয়ে তোলো। তা যদি সারাবার ক্ষমতা না থাকে, তবে ফশ্ করে এক মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় মস্ত বাড়ীটা গুঁড়িয়ে ভাঙ্গবার জন্য উদ্যত হয়ো না!...তার মনে হ'ল, তাদের এই কাজটির পানে সমস্ত সমাজ যেন কৌতূহলী নেত্রে চাহিয়া আছে! সে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, না, যে সঙ্কল্প করিয়া আসিয়াছি, তাহাই করিব। দীপ্তিকে ফিরাইব।

চা খাওয়া শেষ হইলে দীপ্তি অরুণের পানে চাহিয়া কহিল,—এসো...

অরুণ অবাক হইয়া গেল, দীপ্তির এই অসঙ্কোচ আহ্বানের সুরে! কোথাও তার এতটুকু উদ্বেগ নাই, দ্বিধা নাই! এমন অনায়াসে, এমন অবলীলায় সে তাকে আজ ডাকিল কি করিয়া! হায়রে, সে বুঝি ভাবিয়াছে, অরুণ সারা রাত্রি বিশ্রামের পর তার মতে সায় দিবার জন্যই প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে!

দুইজনে পথে বাহির হইল। সেই জনস্রোত,সেই সঙ্গ-প্রয়াসী মানবাত্মার বাণীই দিকে দিকে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে!... কেহ একা নয়, নিঃসঙ্গ নয়...সকলের মিলিত হাসির কলরবে চারিধার মুখরিত!...

পথে দুইজনে কোন কথা হইল না। দীপ্তি আসিয়া ঝোর্‌ণার কিনারে একটা শিলাখণ্ডের উপর বসিল। রাত্রে বৃষ্টির জলে চারিধারের গাছপালা স্নান করিয়া এমন দিব্য বেশে সাজিয়া উঠিয়াছে যে তাদের পানে চাহিলে প্রাণটা এক নিমেষে তার আলস্য অবসাদ মুছিয়া তাজা হইয়া ওঠে!

কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিবার পর দীপ্তি কহিল,—ভেবে দেখলে?

অরুণ চমকিয়া উঠিল। দীপ্তির আহ্বানে সে তার মতের বিরুদ্ধে যা-কিছু যুক্তি খাড়া রাখিয়াছিল, সেগুলা এক মুহূর্তে কোথায় যে সরিয়া গেল! একটা নিশ্বাস ফেলিয়া অরুণ কহিল,—হ্যাঁ,ভেবেছি বৈ কি। আর ভেবে তোমাকে জবাব দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েই এসেছি!…কিন্তু একটু চুপ কর, দীপ্তি। চারিদিকে এই যে নীরবতা…প্রাণ দিয়ে একে একটু অনুভব করি, এসো দুজনে! চোখের দৃষ্টিতে শুধু কথা কই এসো…মুখের ভাষায় এ নীরবতা ভেঙ্গে কাজ নেই। কে জানে, হয়তো এমন তর্ক উঠবে…

—বেশ! বলিয়া দীপ্তি সুদূরের পানে চাহিয়া রহিল। তার চোখের সামনে তার স্বপ্নের জগৎ ভাসিয়া উঠিল,—এক বিশাল সমাজ, লোক-জন স্বাধীন গতিতে কাজ করিয়া চলিয়াছে! কেহ কাহারো মুখ চাহিয়া ঘরের কোণে অলস বসিয়া নাই! সকলেরই মুখে-চোখে আশার দীপ্তি, প্রাণে কাজের বেগ, পুলকের ছটা!… তার দুই চোখ বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে তার

চোখের সামনে কখন যে এ-সব আবার মিলাইয়া গেল, আর তার জায়গায় ফুটিয়া উঠিল, এক প্রকাণ্ড সৌধ, নর-নারীর কি বিপুল জনতা সে সৌধে!…তাদের কল-কোলাহলে দিকদিগন্ত একেবারে উচ্ছ্বসিত মুখরিত,!…আর ঐ বিরাট সৌধের নীচে…এ কি জীর্ণ কঙ্কাল! কার কঙ্কাল এ! দীপ্তি ভালো করিয়া চাহিয়া দেখে,… তাহারি!…তাহারি অস্থি-পঞ্জরকে ভিত্তি করিয়া এ বিরাট সৌধ গড়িয়া উঠিয়াছে! এত বিরাট, এত উচ্চ যে তার চূড়া গিয়া সুদূর আকাশকে স্পর্শ করিয়াছে!..সে শিহরিয়া উঠিল। তার অস্থি-পঞ্জর এমন জীর্ণ! পর-মুহূর্তে হাসিয়া সে ভাবিল, কি সুখ, কি এ অসহ্য সুখ গো!…দধীচি মুনি কবে কোন্ অতীত যুগে নিজের অস্থি দিয়াছিলেন বজ্র-রচনার জন্য! আর সে বজ্রে অসুরের বংশ সমূলে ধ্বংস করিয়া স্বর্গে দেব-দেবীরা রক্ষা পাইয়া বাঁচেন! এ তো পুরাণের কথা! কে জানে, সত্যই দধীচি মুনি ছিলেন কি না! থাকিলেও এমন করিয়া যে অস্থি দিয়াছিলেন,তার প্রমাণই বা কি এমন আছে! তবে তাকে যদি সমাজের ভ্রূকুটি লাঞ্ছনা মাথায় লইয়া হাসিমুখে নিজের অস্থি-পঞ্জরও চূর্ণ করিয়া ঐ স্বপ্নের সৌধকে সত্য করিয়া গড়িয়া তুলিতে হয়, যে-সৌধে তার জাতি প্রাণ পাইয়া বাঁচিবে, তাহা হইলে তার এ-জন্মটাও যে বিপুল সার্থকতায় ভরিয়া চিরগৌরবে মণ্ডিত হয়!…

অরুণ চারিদিকে চাহিয়া প্রকৃতির মুক্ত সৌন্দর্য্য-লীলা দেখিতেছিল। কি উদার, কি মহান ঐশ্বর্য্যের রাশি! ইহার কাছে ধন, যশ, সমাজ কত তুচ্ছ!…প্রকৃতির কোলে এই

সৌন্দর্য্যের মধ্যে যদি থাকিতে পারা যায় তো কাজ কি ধন-জনে, সঙ্গ-সমাজে!...হঠাৎ দীপ্তির হাতের স্পর্শে তার চমক ভাঙ্গিল। সে ফিরিয়া চাহিল; দীপ্তি তাহারি পানে চাহিয়াছিল। দুইজনের চোখে-চোখে মিলিল। অরুণ ডাকিল,—দীপ্তি...

দীপ্তি বলিল,—কি বলবে তুমি, বল...

অরুণ কহিল,—তবে শোনো দীপ্তি!...কাল সারারাত ঘুমকে ঠেলে এই চিন্তাতেই আমি কাটিয়েছি।

...তারপর সে বুঝাইতে লাগিল, প্রথম যৌবনের অতি-পর্ব্বে যাত্রা সুরু করিবার সময় জীবনকে যদি হঠাৎ অজানা পথে চালানো যায়, তবে তাহাতে বিপদের ভয়ও আছে বিলক্ষণ! হয়তো পথ নিরাপদ, তবু একবার যাত্রা সুরু করিলে যখন ফিরিবার আর কোন উপায় থাকিবে না, তখন ভালো করিয়া বুঝিয়াই না সে পথ বাছিয়া লওয়া দরকার! এই পথের জন্যই সমস্ত যাত্রাটুকু বিফল ব্যর্থ হইতে পারে—তখন হায়-হায় করিয়াও যে তাকে আর রক্ষা করা সম্ভব হইবে না।

এই কথাটাই নানা যুক্তি নানা দৃষ্টান্তের সাহায্যে এমনি আবেগে সে বলিয়া চলিল, যে তার কথার প্রতি বর্ণে, তার স্বরের ভঙ্গিমায় দীপ্তির প্রতি তার প্রাণের সুগভীর প্রেম বিদ্যুতের মত বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িতেছিল! সে প্রেমের বিদ্যুৎ দীপ্তির লক্ষ্য এড়াইল না! দীপ্তি তা বুঝিলেও নিজের সঙ্কল্পে অটল রহিল। এ তো তার ক্ষণিকের উত্তেজনা নয়, এ মত যে সে আজ কত দিন, কত মাস, কত বর্ষ ধরিয়া ভাবিয়া নিজের মনে দৃঢ় করিয়া ফেলি-

য়াছে! সে অরুণকে ভালবাসিয়াছে খুবই, নিরুপায়ভাবে···খুব গাঢ় গভীর সে ভালবাসা! তবু তার পণ, তার ব্রত...সে তো স্পষ্টই বলিয়াছে, তার বুক ভাঙ্গিয়া গেলেও সে এ পণ রক্ষা করিবে, এ সত্য প্রাণ দিয়া পালন করিবে! মুক্তির দিশায় সে যে আকুল,—তাছাড়া তার নিজের সুখটাকেই একমাত্র সে কাম্য করে নাই তো! তার জাতি, সমস্ত নারী-সমাজের কল্যাণের জন্য যে সে এই মুক্তির পণে নিজেকে আবদ্ধ করিয়াছে!

দীপ্তি বলিল—তুমি ভুলে যাচ্ছ, এ শুধু আমার নিজের একটা চপল মত নয়, হাসি-খেলা বা তর্কের মধ্যেও এর জন্ম নয়। এ একেবারে আমার প্রাণকে বৃন্ত করে জেগে উঠেচে,আমার প্রাণের অংশ এ...আমার মর্ম্মের অতি-স্পষ্ট জাজ্জ্বল্য সত্য এ!...একে আমি কোন-কিছুর মায়াতেও অস্বীকার করতে পারবো না!... আমায় নিতে হলে আমার এই প্রাণ-অংশটুকু-সমেত নিতে হবে! তা না নাও, নিয়ো না, নিতে হবে না!...তবে জেনে রেখো, তোমার কাছে নৈরাশ্যে আমি ব্যথা পাবো খুবই, হয়তো তু'মাস বেদনায় মূর্চ্ছিতের মত পড়ে থাকবো···তবু এ পণ থেকে হঠতে পারবো না। আমি জানি, সাথী একজন আমার চাই, আমায় শক্তি দিতে, আমায় উৎসাহ দিতে,—আমার কথা যাকে শুনিয়ে তৃপ্তি পাব, এমন একজন বন্ধু, সাথী!···তোমায় ভালবাসি, প্রাণের চেয়েও। এমন প্রিয়জনকে সাথী পাবো, এর চেয়ে সুখের বস্তু আর কি ছিল! তুমি ত্যাগ করলে, হয়তো এমন একজনকে জীবনের সাথী করতে হবে, যার জন্য প্রাণ আকুলও হবে না।

সে মস্ত দুর্ভাগ্য ঘটলেও বাধ্য হয়ে সে দুর্ভাগ্যকে আমায় বরণ করে নিতে হবে। তোমার কাছে নিরাশ হবার পর হয়তো আর কাকেও ভালবাসতে পারবো না। কিন্তু ভাল না বাসলেও আমার এ ব্রত পালন করার জন্য একজন বন্ধু আমায় বেছে নিতেই হবে...

দীপ্তির দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল। তা দেখিয়া অরুণ একটু বিচলিত হইল। সে বলিল—এত যদি আমায় ভালবাস দীপ্তি, তাহলে আমায় বিশ্বাস কর...একটু বিশ্বাস...

সবলে উদ্যত অশ্রুকে ঠেলিয়া দীপ্তি বলিল—কিন্তু এ তো আমার ছোট সুখ-দুঃখের কথা নয়...! শুধু আমার কথা যদি হতো এ...দীপ্তি অরুণের পানে চাহিয়া বলিল,—আমার এ সমস্ত জীবনটাকে আমি তোমার হাতে তুলে দিতে পারি যে, তোমার যা-খুসী কর এ জীবন নিয়ে! কিন্তু এর মধ্যে অনেক কথা আছে...ভালো-মন্দ সত্য-মিথ্যা সমস্ত নারী-জাতির কল্যাণ যে এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে!...এ তো শুধু আমারি কথা নয়, আমারি মত নয়। এ যে আমার অন্তরে বসে আমার সমস্ত জাতির আত্মা আমার মুখ দিয়ে এ কথা বলাচ্ছে!...আমার একটা ক্ষুদ্র সুখ, একটা ছোট তৃপ্তির জন্য যদি আমি তাদের এ বাণীকে উপেক্ষা করি আজ, তাহলে আমার নিজের উপরই যে আমার ধিক্কারের আর সীমা থাকবে না!...নারীর এই মর্য্যাদাটুকুকে যদি আমি ভালো না বাসতুম...তাহলে তোমাকেও বুঝি আজ আমি এমন ভালবাসতে পারতুম না...

এ কথার মধ্যে অন্তরের কতখানি দৃঢ়তা, কতখানি নিষ্ঠা রহিয়াছে—অরুণ তাহা বুঝিল।...তবে উপায়? দীপ্তি যে-সর্ত্ত তার সামনে ধরিয়া দিয়াছে, সে সর্ত্তে অরুণ তাকে গ্রহণ করিতে পারিবে না; আর সে তাকে গ্রহণ না করিলে, দীপ্তি...না, ইহাতেও তো তাহাকে রক্ষা করা যায় না! কোন্ অপদার্থকে সহায় করিয়া সে জীবন-পথে যাত্রা সুরু করিয়া দিবে · সে হয়তো পথের মাঝেই অসহায় তাকে ফেলিয়া পলাইয়া যাইবে। অরুণ তো জানে, এ পৃথিবীতে কাপুরুষ বিশ্বাসঘাতকের সংখ্যা কত! এমনি অনির্দ্দিষ্ট পথে তাকে ফেলিয়া গিয়া অরুণই কি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবে?...

অরুণ কহিল—আমার কি ভাবনা হয় জানো দীপ্তি...সকলে বলবে, এক অসহায় নারীকে আমি ভুলিয়ে পথে এনে দাঁড় করিয়েছি!

দীপ্তি কহিল—লোকের কথাকে এখনো তুমি এত বড় করে ধরছো!...বলেছি তো, আমাদের সংগ্রাম করতে হবে, এই সব আচার-পদ্ধতি, কুসংস্কারের সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে—হয়তো বা সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গেও। সে-সব লোকের কথা গ্রাহ্য করবে...কে কি বলবে? তারা শত্রু, তাদের সঙ্গে তো লড়াই! এই লড়া আমাদের জীবনের ব্রত। আমরা যে মুক্তির প্রয়াসী!

অরুণ যুক্তিতে হারিয়া মিনতি ধরিল, অতি-দীন করুণ মিনতি! কিন্তু দীপ্তি তবু অটল। ঘাড় নাড়িয়া সে বলিল—এই এক পথ আছে—সত্যের পথ, মুক্তির মন্দিরের দিকে।

অরুণ নিরুপায়ভাবে কহিল—তাহলে আরো কিছুদিন তুমিও ভেবে দেখ, দীপ্তি! এত বড় কাজ করার আগে মনটাকে বিরুদ্ধ যুক্তির মাঝে ছেড়ে আরো ভালো করে ভাবো। এত ব্যস্ত কেন! সমস্ত জীবনটা যখন এর উপর নির্ভর করছে...

দীপ্তি কহিল—না। আজ, এখনি এ প্রশ্নের মীমাংসা করতে হবে। করা চাই!...আমার মনে কোনো দ্বিধা নেই,... আমি তো তোমাকে সব কথা বলেছি, আমার মনের অতি-গোপন খপরটুকুও তো অপ্রকাশ রাখিনি। হয় বলো, তুমি রাজী আছ এ সর্ত্তে, নয়,আমায় ত্যাগ কর।

অরুণ বিস্ময়ে ক্ষোভে দীপ্তির পানে চাহিয়া রহিল। নারীর যে ব্রীড়া তাকে অমন সুন্দর কমনীয় করিয়া তোলে, দীপ্তি তাহা বিসর্জ্জন দিয়াছে!...দিক, তবু তো তাকে বিশ্রী দেখাইতেছে না! সে বলিল,—দীপ্তি, আমি তোমায় ভাল বাসি, এমন ভালবাসা বুঝি পৃথিবীতে কেউ আর কাকেও বাসেনি! কেন তুমি এ অবিচার করছ! আমি যদি তোমার ভালবাসার মধ্যে নিজের স্বার্থ খুঁজতুম, তাহলে এখনি বলতুম, তুমি যা চাও, তাই হোক, তাই...তুমি আমার! কিন্তু আমার প্রেম এত নীচ স্বার্থপর নয়! তাই সবার আগে তোমার মর্য্যাদা তোমার কল্যাণের কথা ভেবেই তোমায় বার-বার সতর্ক করছি—শোনো, আমার কথা তুমি শোনো। এ অন্ধ আবেগ তুমি ত্যাগ কর, সুস্থ মন নিয়ে একবার ভাবো।

—ঢের ভেবেছি। দীপ্তি কহিল,—তাহলে এই তোমার শেষ

কথা? বেশ, এখানেই তাহলে এর যবনিকা পড়ুক!...দীপ্তির স্বর অবিচল গম্ভীর। কাতরতার চিহ্ন তার কোথাও নাই!

অরুণের সমস্ত মন আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।—না, না দীপ্তি, এই শেষ কথা নয় আমার। তুমি এমন সুন্দর, এমন সতেজ সুস্থ সবল তোমার মন—তাতেই যে আমি মুগ্ধ হয়েছি, পাগল হয়েছি, দীপ্তি! আমি দুর্ব্বল পুরুষ, আমার ওপর তুমি বড় অকরুণ হচ্ছো যে—

দীপ্তি কহিল,—আমার সৌন্দর্য্যের মোহে ভুলিয়ে তোমায় আকৃষ্ট করতে আমি কোনদিনই চাইনে, তোমার মধ্যে যে মনের পরিচয় আমি পেয়েছি, সেই মনেরই সঙ্গ লাভের জন্য আমি আকুল। তোমার যা মত, আমার মতের সঙ্গে তার তো খুব মিল আছে—তবে কেন তুমি এখন কর্ম্মক্ষেত্রে নামবার সময় এত কুণ্ঠিত হচ্ছো?

অরুণ কহিল,—তোমার মতের সঙ্গে আমার মতের মিল আছে, দীপ্তি। তোমার এ মতকে, তোমার এ আশা-আকাঙ্ক্ষাকে আমি শ্রদ্ধাও করি—কিন্তু তার জন্য এ নিষেধ নয় আমার।... তাহলে খুলেই বলি তোমায়। তোমার সঙ্গে পরিচয় হবার আগে পুরুষ আর নারীর মিলন সম্বন্ধে আমার এই মত ছিল যে, মনের মিলই এখানে একমাত্র মন্ত্র, সংস্কৃত কতকগুলো শ্লোক এর মধ্যে ব্যঙ্গের মত শোনায়। আর নারীর মুক্তি বল, স্বাধীনতা বল, এই পথেই পাওয়া যাবে...বিবাহের বৈধতা, মনের স্বচ্ছন্দ অবাধ মিলনের অবৈধতা...এগুলো শুধু নারীকে দেবে বশে

রাখার জন্য পুরুষেরি তৈরী ,কঠিন ফাঁস, তার ধাপ্পা···সারা জীবন ধরে নারীর উপর একাধিপত্য বিস্তারের এ শুধু প্রবল চেষ্টা। তা ছাড়া আর কিছুই নয়। এ তো ভগবানের বিধান নয়। এ বিয়ের মন্ত্র তিনি ছন্দে গেঁথে দেননি। এ রচেছে পুরুষ,নারীর উপর প্রভুত্ব খাটাবার জন্য শুধু! মানুষ ছাড়া পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গের পানে চেয়ে ত্যাখো,তাদের মধ্যেও মিলনের সুর বয়ে চলেছে...প্রাণে প্রাণে মিলনের লীলা বইছে। ভগবানেব যদি তাই না ঈপ্সিত হবে, তবে কেন তিনি অবোলা পশু-পক্ষীদের অন্তরেও এই প্রেম, এই সঙ্গ-লিপ্সা,এই মমতা,এই স্নেহ দিয়ে অমন করে গড়ে তুলবেন! অর্থাৎ আমার কথা এই যে,আর সমস্ত নারী তো চুপ করে আছে, এই আচার-বিধির বিরুদ্ধে কোন বিদ্রোহ তুলছে না—মাঝে থেকে তুমি কেন এ ভার মাথায় নিয়ে লাঞ্ছনার বিষে জর্জ্জরিত হবে! লোকে তোমায় কত কুকথা বলবে। আর আমাকেও বলবে, যে শক্তি থাকতেও তোমাকে আমি নিবৃত্ত করিনি,নিজের জঘন্য তুচ্ছ তৃপ্তির মোহে তোমায় এতে আরো উৎসাহিত ক্ষিপ্ত করে তুলেছি!

দীপ্তি কহিল,—ও সব কথা আমিও ভেবে দেখেছি বহুদিন। কেন তুমি এতে আমায় উৎসাহিত না করে বারবার নিবৃত্ত করার চেষ্টা করছো···

—কারণ, তোমায় আমি ভালবাসি! তাই, তাই—

দীপ্তি কহিল—তাহলে এর মানে দাঁড়াচ্ছে এই যে তোমায়-আমায় বিদায় নেবার পালা এবার!

অরুণ উদ্বেলিত কণ্ঠে কহিল—না, না, বিদায় নয়, বিদায় নয়। তুমি বলেছ, আমায় তুমি ভালবাস দীপ্তি। নারী যখন এত বড় কথা বলে পুরুষের কাণে, তখন এমন মূঢ় কে আছে যে তাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে! নারীই চিরদিন পুরুষের কাম্য··· নারীকে সাধনা করে পেতে হয়! বিশেষ তোমার মত নারীর ভালবাসা পাওয়া···এর চেয়ে পরম লাভ পৃথিবীতে আর কি আছে!...এই অযাচিত অনুগ্রহ এ যে গৌরবের জিনিষ, এ যে আমার মাথার মণি! না, না, তোমায় আমি ছেড়ে দিতে পারবো না—

দীপ্ত কহিল—তাহলে তুমি আমার! আমাকেও তোমার বলে গ্রহণ করছো!

—হ্যাঁ গো, তুমি আমার, তুমি আমার···আবেগে উত্তেজনায় অরুণের স্বর কাঁপিয়া ঝরিয়া পড়িল...

দীপ্তিও কৃতজ্ঞতায় প্রেমে বিবশার মত অরুণের বুকে মাথা রাখিল। তার অন্তর চিরিয়া মৃদুকম্পিত মর্ম্মোচ্ছ্বাস ফুটিল—প্রিয়তম, আমি তোমার, একান্ত তোমারই—

মাথার উপর নির্ম্মল নীল আকাশ, পার্শ্বে হিমালয়ের হিম-শিখর নিস্পন্দ বিস্মিত দৃষ্টিতে এই অপূর্ব্ব মিলন দেখিল,···আর পাহাড়ের গায়ে পাইন-ঝাড়ের ডালে একসঙ্গে কতকগুলা পাখী কুজন-ধ্বনিতে এ মিলনকে অভিনন্দিত করিল।

— ৬ —

এইরূপে কতকটা ইচ্ছার বিরুদ্ধেই অরুণকে দীপ্তির মতে সায় দিতে হইল! নহিলে ঐ রূপ, ঐ মন···সে যে হাতের বাহিরে চলিয়া যায়! কি দৃঢ় ভঙ্গিমায় দীপ্তি যে নিজেকে খাড়া রাখিয়াছে...এমন নির্ম্মম সে...! একটা তুচ্ছ অসম্ভব মতের পায়ে এমনি করিয়া নিজের জীবনকে বলি দিবে!—নিরুপায় হইয়াই অরুণ কহিল,—তবে তাই হোক, দীপ্তি।

তখন আসিল মস্ত এক সন্ধিক্ষণ! জীবনের খুঁটিনাটি নানা কাজের সূক্ষ্ম আলোচনা! অরুণ অত বড় মতটার সামনে এমনি বিস্ময়-বিমূঢ় হইয়া গিয়াছিল যে ভবিষ্যতের পথ তার মনের নাগালের বহুদূরে সরিয়া পড়িয়াছিল। শুধু এইটুকু সে বুঝিয়াছিল যে সে ও দীপ্তি একসঙ্গে এই সমুদ্রে জীবন-তরী ভাসাইয়া চলিবে। কিন্তু সে তরী ভাসানো হইলে কোন্ ঘাট তাদের লক্ষ্য হইবে, এই কথাটার মীমাংসা করিতে গিয়া বিবাহের কথাটাই শুধু তার মনে জাগিতেছিল! অথচ এই বিবাহ ব্যাপারটার সঙ্গেই দীপ্তির এত বিরোধ! একই গৃহে দুইজনে তারা বাস করিবে...এক চিন্তা, এক মন! কিন্তু সেই গৃহে সেই তা পুরুষের প্রভুত্ব! দীপ্তি কহিল, না, এক ঘরে বাসের কি প্রয়োজন? কিছু না! জীবনে স্বতন্ত্র ঘরে বাস করিয়া এমন কি দূরে থাকিয়াও যে আমরা বন্ধুর প্রীতি পরিপূর্ণ আনন্দে

উপভোগ করি।...তবে?...এ প্রীতি, এও তো বন্ধুর প্রীতি, প্রিয়জনের সখ্য!—এক গৃহে বাস করিলে সেই তো পুরানো আচারের দাস্য করা হইল!...তা ঠিক হইবে না। দীপ্তি কহিল, স্বাধীনভাবে দুইজনে এমনিই আমরা থাকিব। আমার গৃহে তুমি আসিবে, নিত্য আমার প্রাণের প্রিয়,...আমার মনের প্রীতি, হৃদয়ের মধু পান করিতে...আমার সন্তানদের পিতা আমায়, আমার সন্তানদের দেখিতে আসিবে!...আমার স্বাধীন সত্ত্বা বজায় রাখিয়া স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্ত্তব্য আমি পালন করিব, তবে সংসারের কোন কাজে স্বামীর সাহায্য লইব না, স্বামীর বশ্যতাও স্বীকার করিব না।...

এই সব কথা লইয়া দীপ্তি বহুদিন ধরিয়া নিজের মনে আলোচনা করিয়াছে! আর এই সব আলোচনার দ্বারাই সে স্থির করিয়াছে, বাসের ব্যবস্থার কোন পরিবর্ত্তনের দরকার নাই! অরুণের সহিত এই যে মিলন,—এ প্রাণের কামনায় পুরুষের সহিত নারীর সখ্য, নিবিড় সখ্য...এর মধ্যে দায়িত্ব চাপাইবার প্রয়োজন নাই!...একা সমাজের বিরুদ্ধে এ বিদ্রোহ-ঘোষণা নয়, নারী ও পুরুষের শরীর-মনের পরিপূর্ণ বিকাশ ছাড়া এ আর কিছুই নয়! তাদের চারিদিক দিয়া সার্থক করিয়া তুলিবার জন্যই শুধু এ মিলন!...তার জন্য বাহিরের ব্যাপারে কোনো পরিবর্ত্তন করার প্রয়োজন তো কিছুই নাই, বরং করিলে তাহা বিশ্রী দেখাইবে। দীপ্তি অবাক হইয়া যাইত যে নর-নারীর এই মিলনোৎসব—যাহা একান্ত মনের ব্যাপার

তাহাতে লোক-জনের ভিড় লাগাইয়া সমারোহ বাধাইয়া খাওয়া-দাওয়ার প্রচণ্ড উৎসাহ জাগাইয়া যে-কাণ্ড করা হয়, সেটা একান্ত হৃদয়-হীন, একান্ত বর্ব্বর, বিসদৃশ! তবু এ কাহারো চোখে পড়ে না, আশ্চর্য্য! দুটী হৃদয় যখন একান্ত গোপনে পরস্পরকে আত্ম-নিবেদন করিবে, তখন চারিদিকের এই হট্টগোল, এই সমারোহ—লক্ষ লোকের এই উৎসুক কৌতূহলী দৃষ্টি তাদের সে হৃদয়-বিনিময়ের শান্ত ক্ষণটীকে বর্ব্বর কোলাহলে চিরিয়া ছিঁড়িয়া তার মাধুর্য্যটুকু নষ্ট করিয়া দিবে না! এ প্রাণের ব্যাপারে ও হট্টগোল যে নিতান্ত নির্ম্মম ঠেকে!

এ সমারোহের অর্থ শুধু এই হয় যে আর-একজন নারী,ঐ দেখ, পুরুষের দাস্য স্বীকার করিয়া তার নিজের সত্বা হারাইয়া ফেলিল...বাজাও দামামা, বাজাও দুন্দুভি, গগনভেদী শঙ্খরোলে পুরুষের এই বিজয়-বার্ত্তা দিকে দিকে ঘোষণা কর। আদিম বর্ব্বরতার এ সেই পৈশাচিক অট্টহাস ছাড়া আর কি!...

তাদের মিলনে বাহিরে এতটুকু সাড়া উঠিবে না। একটা বাহিরের লোকের দৃষ্টিও তাদের এ প্রাণের মিলনের উপর পড়িয়া তাকে বিষাক্ত করিবে না, তার স্নিগ্ধতার কোনখানে আঘাত দিবে না। দুটী প্রাণের এ আত্ম-নিবেদন একান্ত নিভৃতে সম্পাদিত হইবে!...সমাজের পাছে কোথাও কোন তর্ক ওঠে, বা এ মিলন লইয়া কোথাও কোন আলোচনা চলে, সেজন্য ভয়ে-ভয়ে দীপ্তির এ সতর্কতা নয়—সে চায় এ প্রাণের ব্যাপার নীরবে সম্পন্ন হোক!...

দীপ্তি বলিল, "বালিগঞ্জ ষ্টেশনের কাছে তার একখানি ক্ষুদ্র কুটীর আছে। সেখানি অল্প ভাড়ায় লইয়া সে তাকে তার রুচি আর সামর্থ্য-মত পরিপাটী করিয়া সাজাইয়াছে। সেখানেই সে বাস করে; আর প্রত্যহ ট্রেনে করিয়া কলিকাতায় তার স্কুলে পড়াইতে আসে!...তার গৃহের আশে-পাশে কয়েক ঘর দরিদ্র লোকের বাস। তাছাড়া মাঠ, বাগান, জলা ঘাট-ঘাট,পাখীর গানে সকাল-সন্ধ্যা নিত্য-মুখরিত! খোলা আলো-বাতাসে স্নিগ্ধ-শীতল তার এই ক্ষুদ্র গৃহ তার জন্য যে আরাম সঞ্চিত রাখে, তাহাতে প্রাণ-মন জুড়াইয়া যায়। সেখানে তার কোন অভাব নাই। সে একা থাকে। একটা দাসী আসিয়া বাসন-কোসন মাজিয়া জল তুলিয়া দিয়া যায়, দীপ্তি নিজের হাতে রান্নাবান্না ও ঘরের অন্য যা-কিছু কাজ করে। তাহাতে তার এতটুকু ক্ষোভ নাই— কষ্টও কিছু হয় না। তা ছাড়িয়া অরুণের ঐশ্বর্য্য-সেবিত প্রাসাদে সে বাসের কামনাও করে না। আর অরুণের প্রাসাদে বাস করিতে আসিলে তাকে তো অরুণের বশ্যতাই স্বীকার করিতে হইবে, তার আরাম-তৃপ্তির জন্য অরুণ পয়সা জোগাইবে! তাহা হইলেই তো সেই অরুণের প্রভুত্বকে বরণ করিয়া তাকে সেই কৃত্রিম বাঁধনে বাঁধা পুরানো প্রণালীতেই জীবন বহিতে হইবে! তা সে চায় না! সে কথা মনে হইলে চিত্ত তার ক্ষুব্ধ বিরূপ হইয়া ওঠে!

তবে এ মিলনে লাভ কি?—সমাজের দিক দিয়া, অর্থের দিক দিয়া কোন লাভের কথা ইহাতে নাই! সে লাভ দীপ্তি

চায়ও না !...এ মিলন শুধু তার নারীত্বকে প্রসারতা দিবে—সেই জন্যই না সে ইহাকে বরণ করিতেছে ! এ প্রীতি,এ সখ্য—এ শুধু জীবনকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্য ! কি পুরুষ, কি নারী, দুই-জনেরই জীবনকে পরিপূর্ণভাবে গড়িয়া তোলা চাই—নহিলে জীবনের সার্থকতা রহিল কোথায় ! নারীকে তার জীবন পরিপূর্ণ করিতে হইলে মাতৃত্বকেও গ্রহণ করিতে হইবে...নহিলে জীবের অস্তিত্ব লোপ পাইবে,নারী-জীবনের প্রধান দিকটাই অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে ! দীপ্তির স্বাধীনতার বাসনা এমন অন্ধ নয় যে ও-দিকটাকে সে একেবারে উপেক্ষা করিয়া চলিবে ! তাহা হইলে নারী যে নারী,সে পুরুষ নয়—যা লইয়া নারীর বৈশিষ্ট্য, সেটাকেই অস্বীকার করা হয় ! আর এ বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করা যা, নারীকে অস্বীকার করাও তাই !

সন্তানদের লালন-পালন ? তাদের শিক্ষা ? তাতেও তো কোন বাধা নাই। পুরুষ ও নারী দুইজনে মিলিয়াই তো সন্তানের জন্ম দিয়াছে—সে-সন্তানদের পালন করিবে নারী, তার মমতা দিয়া স্নেহ দিয়া...আর পুরুষ তার শিক্ষার ভার লইবে। ইহাতে গোলই বা কি, আর বিশৃঙ্খলাই বা আসিবে কোথা হইতে ! নর-নারীর এ মিলনের ভিত্তিই যে প্রীতি ! সেই প্রীতি উভয়কে তাদের কর্তব্য-পালনে সচেতন রাখিবে !...এমনি করিয়া বিরাট দাস্য ঘুচিয়া পৃথিবীর নর-নারীর মধ্যে মনের যে বাঁধন গড়িয়া উঠিবে, তাহারি জোরে পৃথিবীর যত-কিছু দুঃখ-দৈন্য ক্ষোভ-হাহাকার সব ঘুচিয়া যাইবে, বিরাট সাম্যের প্রতিষ্ঠা হইবে—

বিবাদ-কলহের অন্ত হইয়া এমন এক সুমহান জগৎ জাগিয়া উঠিবে, যাহা প্রীতির রসে স্নিগ্ধ, কর্ত্তব্যের স্পন্দনে চকিত, স্বাস্থ্য ও স্বাধীনতার হাওয়ায় ভরপূর ! সে এক আনন্দের জগৎ ! দীপ্তির বিহ্বল দৃষ্টির সামনে এই আলোর জগৎ তার উজ্জ্বল আভাষে জাগিয়া উঠিল !

আরো এক সপ্তাহ ধরিয়া ভবিষ্যতের এমনি নানা ছবি গড়া চলিল। অরুণ সে ছবির সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া গেল, কিন্তু তার চেয়েও ঢের বেশী মোহিত হইল, এ স্বপ্নের জগৎ যে গড়িয়া তুলিতেছে, তার রূপের ও মনের দীপ্তিতে !

সেদিন সন্ধ্যায় বেড়াইবার পর দীপ্তির গৃহে অরুণের নিমন্ত্রণ ছিল। অরুণের মনে হইল, সন্ধ্যার আকাশ যেন নির্ম্মল নীল বেশে সাজিয়া নক্ষত্রদের লইয়া উৎসুক নেত্রে পৃথিবীর পানে কৌতূহলে চাহিয়া আছে। তার জীবনে এ যে এক পরম ক্ষণ ! চাঁদও হাসি মাখিয়া নক্ষত্রদের পাশে ঐ আসন পাতিয়া বসিয়া গিয়াছে। শীত পড়িলেও জ্যোৎস্না-প্লাবিত উপবনে পাখীর গান মুহুর্মুহু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল। পাইনের বন হইতে ধীর পায়ে বাতাস আসিয়া তরু-কুঞ্জে পাতার আড়াল ঠেলিয়া মৃদু-মর্ম্মরে অধীর প্রতীক্ষা জানাইতেছিল। অরুণের মনে হইল, তার জীবনে সন্ধ্যা এমন বিচিত্র মধুর বেশে আর কোন দিন দেখা দেয় নাই ! আজিকার এই অম্লান সন্ধ্যা যে কি অপূর্ব্ব সুরে গান ধরিয়াছে...! তার মনে হইল তার যৌবন-নিকুঞ্জে পাখী গাহিয়া উঠিয়াছে,—সখি, জাগো, জাগো...!

দীপ্তির গৃহে আসিয়া অরুণ দেখিল, ছোট ঘরখানি তৃণ-লতায় পাহাড়ী ফুলে দীপ্তি কেমন বিচিত্র সুন্দর সাজে সাজাইয়া তুলিয়াছে। বারান্দায় একটা বাহারে চীনা লণ্ঠন জ্বলিতেছিল। বারান্দার পরেই ঘর। ঘরের আগুন-রাখার সামনে কৌচখানির উপর দু'টি ফুলের আসন। গৃহকোণে ছোট অর্গিনটার গায়ে ফুল-হার জড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। উৎসবের সুস্পষ্ট আভাষ শুধু ঘরে নয়, দীপ্তির মুখে-চোখেও বিচিত্র রাগে উজ্জ্বল বর্ণে ফুটিয়া উঠিয়াছে! দীপ্তি অর্গিনের পাশে বসিয়া গান গাহিতেছিল,—

ওহে নবীন অতিথি,
তুমি নূতন কি চিরন্তন।
যুগে যুগে কোথা তুমি ছিলে সঙ্গোপন!
যতনে কত কি আনি বেঁধেছিনু গৃহখানি
হেথা কে তোমারে বল করেছিল নিমন্ত্রণ!

অরুণ ঘরে ঢুকিয়া আবেশ-বিহ্বল দৃষ্টিতে দীপ্তির পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া র'হল। তাকে দেখিয়া দীপ্তি গান থামাইয়া উঠিয়া আসিয়া তার হাত ধরিল, কহিল—এসো…

দীপ্তির অঙ্গে অঙ্গে লজ্জার রক্তিম ছটা সন্ধ্যার মেঘের মতই তাকে ঘিরিয়া ধরিল। অরুণ মন্ত্র-চালিতের মত আসিয়া কৌচে বসিল, দীপ্তি তার পাশে বসিল। দীপ্তি বলিল—এই নূতন জীবনে আজ আমরা আমাদের মনকে অভিষিক্ত করবো। আজ থেকে আমাদের সখ্য, আমাদের প্রীতি পৃথিবীর সমস্ত বেদনা-ঝঞ্ঝা অকাতরে বইবার জন্য প্রস্তুত থাকবে। আজ দুটী হৃদয় এক

লক্ষ্য নিয়ে এ মহা-ব্রত-পালনে যাত্রা করবে। প্রিয়তম, আজ থেকে আমি তোমার প্রিয়তমা প্রাণের সঙ্গিনী! আর তুমি আমার একমাত্র প্রিয়তম প্রাণের স্বজন!

দীপ্তির ডাগর দুই চোখে কি ও বিহ্বলতা!...অরুণ আবেশে তাকে বুকের উপর টানিয়া তার অধরে চুম্বন করিল। দীপ্তিও অরুণের অধরে আজ তার প্রথম প্রণয়-অর্ঘ্য নিবেদন করিল। তার পরেই সে অর্গিনের ধারে গিয়া বসিল, বসিয়া কহিল—আমাদের এ অপূর্ব্ব সখ্য গানে-গানে সুরে-সুরে আমাদের ছেয়ে ফেলুক। বলিয়াই অর্গিন টিপিয়া সে গান ধরিল,—

ওহে সুন্দর মম গৃহে আজি পরমোৎসব-রাতি!
রেখেছি কনক-মন্দিরে কমলাসন পাতি।
তুমি এস হৃদে এস, হৃদি-বল্লভ হৃদয়েশ,
মম অশ্রুনেত্রে কর বরিষণ করুণ হাস্য-ভাতি!
তব কণ্ঠে দিব মালা দিব চরণে ফুলডালা,
আমি সকল কুঞ্জ-কানন ফিরি এনেছি যুঁথি-জাতি!
তব পদতল-লীনা, বাজাব স্বর্ণ-বীণা,
বরণ করিয়া লব তোমারে মম মানস-সাথী!

গান গাহিয়া দীপ্তি কহিল,—এর একটা কথা বদলাতে চাই। পদতল-লীনা কেন? ওটা 'হৃদয়-লীনা' করে গাইবো...বলিয়া সে অরুণের উত্তরের জন্য না থামিয়া আবার গাহিল,—

এ কি আকুলতা ভুবনে! এ কি চঞ্চলতা পবনে!
এ কি মধুর মদির-রসরাশি, আজি শূন্য-তলে চলে ভাসি,
ঝরে চন্দ্র-করে এ কি হাসি, ফুল-গন্ধ লুটে গগনে!

অনেক রাত্রি অবধি গান চলিল। যখন গান থামিল, তখন গানের সুরে আর দীপ্তির রূপের দীপ্তিতে অরুণ একেবারে মাতাল হইয়া উঠিয়াছে!

দীপ্তি বলিল,—ঢের রাত হয়ে গেছে। খাবার আনি।... বলিয়া সে দুইজনের খাবার লইয়া আসিল। তারপর আহার শেষ হইলে দীপ্তি অরুণের পানে চাহিল। অরুণের মন আবার বিহ্বল হইয়া উঠিল। দীপ্তি অরুণের হাত ধরিয়া ডাকিল,—বন্ধু, প্রিয়তম...

অরুণ কহিল,—অনেক রাত্তি হয়ে গেছে দীপ্তি। বাড়ী যাই।

দীপ্তি কহিল—এত রাত্রে···? এই শীতে···?

অরুণ দীপ্তির পানে চাহিল, দীপ্তির মুখে-চোখে লজ্জা যেন মাখানো রহিয়াছে!

অরুণ ডাকিল,—দীপ্তি...

দীপ্তি কহিল—আজ আমাদের মিলনের বাসর...বল,

পূর্ণ হল তোমার নিয়ম প্রভু হে, তোমারি হল জয়,

তোমার কৃপায় এক হলো আজি এই যুগল হৃদয়!

— ৭ —

কলিকাতায় ফিরিবার পরে ছয়মাস দীপ্তির সুখের আর অন্ত রহিল না। অরুণও এই সুখ অজস্র পান করিতেছিল।...তবে এ সুখে বেদনাও যে মাঝে মাঝে কাঁটার মত খচ্ খচ্ করিত না, এমন নয়। দীপ্তি পূর্ব্বেকার মতই সারা দিন

তার স্কুলে ছাত্রী পড়াইত এবং বৈকালে 'ট্রেণে' করিয়া গৃহে ফিরিত; ফিরিয়া নিজের হাতে অরুণের খাবার তৈরী করিয়া তাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিত।

অরুণ নিত্য তার কোর্টের কাজ সারিয়া মোটরে করিয়া দীপ্তির গৃহে আসিয়া উদয় হইত; তারপর সেখানে চার-পাঁচ ঘণ্টা কাটাইয়া গৃহে ফিরিত।...তার বুকটা মাঝে মাঝে দুলিয়া উঠিত যখন সে দেখিত, দীপ্তির গৃহের দ্বারে নিত্য এই যে তার গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইতেছে এবং রাত্রির অনেকখানি কাল এইখানেই সে-গাড়ী দাঁড়াইয়া থাকে, অথচ বাড়ীতে থাকে তরুণী দীপ্তি একা...এই ব্যাপারে পাড়ায় বেশ খানিকটা কৌতূহলের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে! তাব গাড়ীর সামনে কৌতূহলী দর্শকের দল শুধু যে আসিয়া ভিড় জমাইত তা নয়—তাদের চোখে তীব্র প্রশ্ন-ভরা বিদ্রোহের দৃষ্টিও সে কত দিন অমন লক্ষ্য করিয়াছে! তার গা ছম-ছম করিয়া উঠিত। ইহারা কি ভাবিতেছে? দীপ্তিব সম্বন্ধে মৃদু স্বরে তাহাদের দুই-একটা গ্লানির কথাও সে কাণে শুনিয়াছে! অথচ দীপ্তিকে সে কথা বলিতে কোনদিনই তার সাহসে কুলায় নাই! দীপ্তির মুখে-চোখে উদ্বেগের চিহ্ন মাত্র নাই। উদ্বেগ কি, তার জীবনে কোথাও যে লক্ষ্য করিবার মত কোন পরিবর্ত্তন আসিয়াছে, তাহারও কোন লক্ষণ দেখা যায় না! সে বেশ অনায়াস সহজভাবেই নিত্য তাকে অভ্যর্থনা করে, আর বিদায়ের বেলায় তার দৃষ্টি অশ্রু-সজল হইয়া ওঠে! সে যে বিচ্ছেদের বেদনা অনুভব করিতেছে, সেটা

স্পষ্ট দেখা না গেলেও অরুণ এটুকুও লক্ষ্য করিয়াছে যে দীপ্তি সে বেদনাকে প্রাণপণে রুখিয়া তাড়াইবার জন্য কতখানি ব্যাকুল!

কিন্তু আশ-পাশের লোকগুলার ঐ তীব্র প্রশ্ন-ভরা দৃষ্টি মেলিয়া দীপ্তিকে দেখিতে আসায় দীপ্তিকে সে যে কতখানি লাঞ্ছনায় আর গ্লানিতে ভরিয়া তুলিতেছে, ইহা ভাবিয়া সে আকুল হইয়া উঠিত। তাছাড়া মোটরের সোফারটা এমন সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চায়...! ইতর ইহারা, সঙ্কীর্ণ মন ইহাদের, তাহাদের মিলনের মাধুর্য্য বা গৌরব তো ইহারা বুঝিবে না, আর তা না বুঝিয়া তারা ছাই-পাঁশ কি যে ভাবিতেছে, ইহা ভাবিয়াই অরুণ গ্লানির আগুনে পলে পলে দগ্ধ হইতেছিল!

কিন্তু ছয় মাস ধরিয়া নিত্য এত রাত্রে গৃহে ফেরা... গৃহে ফিরিবার সময় তার বুকটা এমনি অধীর স্পন্দনে স্পন্দিত হইয়া উঠিত! গৃহে পিশিমা ছিলেন। এই পিশিমাই অরুণকে মানুষ করিয়াছেন। মা যখন বাঁচিয়া ছিলেন, তখনো তার যা-কিছু ঝক্কি এই পিশিমাই সহিয়া আসিয়াছেন। পিশিমা প্রায় বলিতেন—কোর্টে এত কি কাজ, তোর বাবা যে, এত রাত্রে বাড়ী ফিরিস্!

অরুণের বুক গুর্‌গুর্ করিয়া উঠিত। সে বলিত,—একটি বন্ধু একা থাকেন, তাঁর বিশেষ অনুরোধেই তাঁর কাছে রোজ যাই পিশিমা—তার পর কথায় কথায় ফিরতে রাত হয়ে যায়!

পিশিমা বলিতেন,—সেই বালিগঞ্জের ওধারে যাস্...ড্রাইভার বলছিল...

অরুণের বুক এবার ছাঁৎ করিয়া উঠিল। সে বলিল—হাঁ!···বলিয়াই সে সে চট্ করিয়া নিজের ঘরে সরিয়া পড়িল।

অরুণ ভাবিল, সর্ব্বনাশ! ড্রাইভার যদি সেই সঙ্গে আরো কিছু বলিয়া থাকে!...যদি সে বলিয়া থাকে, সে বন্ধু পুরুষ নয়, এক সুন্দরী তরুণী···! অরুণ হাসিল, ইহাতে কিন্তু হইবারই বা কি আছে! পিশিমা তো তাকে চেনেন—সে যে কোন রকম হীন আলাপে মত্ত হইতে পারে, পিশিমা এমন কথা কখনো বিশ্বাস করিবেন না!...তবু সে সতর্ক হইল। কোর্টের পর গৃহে ফিরিয়া জলখাবার খাইয়া বেশভূষা পরিবর্ত্তন করিয়া সে বাহির হইতে লাগিল,—মোটরে নয়, ট্রেণে করিয়া। সন্ধ্যায় বালিগঞ্জে গিয়া একেবারে শেষ ট্রেণে কলিকাতায় ফিরিত!...

কিন্তু এদিকে আর এক আশঙ্কার উদয় হইল। অরুণ দেখিল, দীপ্তি পুত্র-সম্ভবা!...যদি এখন দীপ্তি স্কুল ছাড়িয়া না দেয়, তাহা হইলে স্কুলে একটা কুৎসার সৃষ্টি হইতে পারে! দীপ্তি বিবাহ করে নাই—এবং তাকে যে-ভাবে স্বামিত্বে বরণ করিয়া জীবনে সে নূতন সুর দিয়াছে, স্কুলের কেহ তা জানেও না তো! এ ক্ষেত্রে···

ভয়ে ভয়েই একদিন সে দীপ্তির কাছে কথাটা পাড়িল! দীপ্তি কহিল,—এতে লজ্জা করবার তো কিছু নেই! লোকে কি ভাববে? কিন্তু লোক-মতকে আমি তো কোনদিনই গ্রাহ্য করিনি···আজই বা কেন করব? আমি তো জানি, আমি কোন

অপরাধে অপরাধী নই,—আমি নিষ্পাপ, নির্ম্মল…লোকে যা খুসী ভাবে ভাবুক, যা-খুসী বলুক। তাতে আমার কিছু এসে যাবে না! আমার জীবনে এ যে এক চরম ক্ষণ…মাতৃত্বের গৌরবে আমি ধন্য হব এবার! এতেই তো নারী-জীবনের সার্থকতা!

অরুণ বসিয়া চুপ করিয়া রহিল, তার পর কহিল—সে কথা নয় দীপ্তি…এ সময় এভাবে তোমার খাটুনিটা ভালো নয়। সেই জন্যেই আমি বলছি…

দীপ্তি কহিল,—কি?

অরুণ কহিল,—সাম্‌নে তো আমারও পূজোর বন্ধ আসছে—চল না, কোথাও বেড়িয়ে আসি। জীবনটাও একঘেয়ে হয়ে পড়ছে না? একটু ঘুরে দৃশ্য-বৈচিত্র্যের মধ্যে থেকে সেটাকে ঝালিয়ে নিতে দোষ কি?

দীপ্তি কহিল,—এ কথা মন্দ নয়। বেশ, আমি ছুটী নেব—ছ'মাসের ছুটী আমি অক্লেশে নিতেও পারি!

অরুণ কহিল,—তাই নাও। যে নবীন অতিথি আসছে, তাকে মাধুর্য্য দিয়েই অভিনন্দন করতে চাই।…

—বেশ! বলিয়া দীপ্তি চুপ করিল। একটা বিপুল মহিমায় মন তার ভরিয়া উঠিল। এবার সে মাতৃত্বের গৌরব লাভ করিবে! …সন্তানের মা হইবে—সন্তান! তার এই ব্রতে তারই রক্ত-মাংসে গড়া, তারি চিত্তের ছায়ায় রচা আর-একটি জীবকে সে এই মন্ত্রে দীক্ষা দিয়া এই সত্য-পথের পথিক করিবে!…এ যে কি সুখ!

দুই জনে পরামর্শ চলিল। পরামর্শে স্থির হইল, কোদারমায় যাওয়া যাক্। কোদারমা বেশী দূরে নয়। তার উপর ষ্টেশনের কাছেই অরুণের এক মক্কেলের পরিচ্ছন্ন একখানি নূতন বাংলা আছে—ভাড়া কম। তাছাড়া কোদারমায় হাওয়া খাওয়ার যাত্রীরা তেমন ভিড় জমায় না। সেই বেশ হইবে।

কিন্তু দীপ্তির মনে একটা দ্বন্দ্ব চলিল, সত্য কথাটা স্কুলের কর্ত্রীকে বলিতে হানি কি! অরুণ কহিল,—কাজ নেই! কতক-গুলো কুৎসার প্রশ্রয় নাই বা দেওয়া হলো!

দীপ্তি কহিল, লোকের কথা সে তো তুচ্ছ করিতে শিখিয়াছে। কোন অপরাধও সে করে নাই, অন্যায়ও কিছু না! তবে...? আর তা না বুঝিয়া যদি কেহ কুৎসাই করে তো ক্ষতি কি! অরুণ কহিল, এ তো মিথ্যা কোন কথা বলিতে চাহিতেছি না! ছুটির কারণ দেখাইবারো কারণ নাই! প্রাপ্য ছুটি—চাহিলেই পাইবে। চাহিবার অধিকার যখন আছে, তখন অনর্থক কুৎসার সৃষ্টি করাইয়া কতকগুলা বাজে কথা তোলায় সার্থকতাই বা কি! যখন ফিরিয়া আবার কাজে যোগ দিবে, তখন তো সব কথার মীমাংসা হইবেই।

—আচ্ছা—বলিয়া দীপ্তি অরুণের মতেই সায় দিল।

তবু পরদিন দীপ্তি আবার এই কথাটাই ভাবিতে বসিল। অরুণের কথায় এই সায় দেওয়ায় এ তো সেই পুরুষের বশ্যতাই সে স্বীকার করিয়া লইল!...হানি কি? অরুণ তাকে কতখানি ভালবাসে! বন্ধুর প্রতি স্নেহে বন্ধুর অনেক কথাও তো জীবনে

শিরোধার্য্য করিতে হয়,' এ ক্ষেত্রেও নয় তাই হইল! এখানে তার কথা ঠেলিলে সেই তো আবার পুরুষ-নারীর বৈষম্যের কথাই আসিয়া পড়ে! দীপ্তি তো তা চায় না! বন্ধুত্বের খাতিরে সে নয় একটু কম নারী, আর অরুণ একটু কম পুরুষই হইল!—তবু সেই পুরুষ-নারীর বৈষম্যটাকে তো তাড়ানো গেল না! পুরুষের চিন্তা বহুদূর অবধি প্রসারিত হয়, তার দৃষ্টি সুদূর ভবিষ্যৎকেও বেশ দেখিতে পায়...আর নারী...? এই যে একটি প্রকৃতিগত দৌর্ব্বল্য, এটাকে কি দূর করা যায় না?...

তবু একটা মতকে শিরোধার্য্য করিয়া জগতের পথে অগ্রসর হওয়া কি কঠিন! ঘটনার বহু আবর্ত্তে পড়িয়া কত তোলা-পাড়া খাইতে হয়! স্নেহ-মমতা, প্রীতি-সখ্য—ইহাদের শক্তিও তো কম নয়! এ যে মানুষের মন!...তবে ঐ কুৎসা! হীন মনের কুৎসিত অভিব্যক্তি সে! কাপুরুষতার জীবন্ত উচ্ছ্বাস!... যীশু খ্রীষ্টকে গালির উপরেও যে ঢের সহিতে হইয়াছিল—চৈতন্য-দেবকে যে লোকে পাগল বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিত!...চলা পথ ছাড়িয়া আলাদা পথে চলিয়া যাঁরাই বিশ্বে সত্যের সন্ধানে ফিরিয়াছেন, তাঁদেরই তো এমনি গ্লানি আর অত্যাচার নীরবে সহিতে হইয়াছে! আর তারা দুটো সামান্য কথার ঘা সহিতে পারিবে না? যখন দুজনেই তারা জানে, এই পথই ঠিক, তারাও সত্য পথের যাত্রী...!

দীপ্তি স্কুলে ছুটির দরখাস্ত দিল। কর্ত্রী শুধু বলিলেন,—বেশ

কথা,—পূজোর বন্ধও আসছে তো, তার'পরে ওদিকে বড়দিন…
তোমার শরীরটা ইদানীং ভালো দেখছি না! মুখে গায়ে
একটা কালির রেখা পড়েছে…বেশ, দুদিন ছুটী নিয়ে ঘুরেই
এসো!

কর্ত্রীর এ কথা কহিবার বা দীপ্তির দেহে কেন এ পরিবর্ত্তন,
সে দিকে লক্ষ্য করিবার কোন প্রয়োজনও ছিল না! দীপ্তি
আরামের নিশ্বাস ফেলিল। অরুণ খুবই খুসী হইবে—ছুটী
লইবার কারণটা আর বলিবার দরকার হয় নাই!…অরুণ যে
তাকে অত ভালবাসে…তার জন্ত অরুণ কি না করিতে পারে!
সেই অরুণকে সে যে খুশী করিতে পারিয়াছে, এ যে তার
পক্ষেও কতখানি সুখের কথা!…

অরুণের কিন্তু মুস্কিল বাধিল। বাড়ীতে পিতা একদিন
তাকে ডাকিয়া বলিলেন,—এঁরা বহুদিন বেড়াতে বেরোন্ নি—
এই ছুটীতে, সব বলছেন, বেড়াতে বেরুবেন। কাশী, এলাহাবাদ
এ-সব ঘুরে সেই দিল্লী, মথুরা, বৃন্দাবন অবধি যাবেন। তোমার
পিশিমার সাধ, দ্বারকা অবধি যান্! তা তোমারো তো লম্বা ছুটী
আসছে—তুমিই এঁদের নিয়ে যাবে, আমি বলেছি।

অরুণ শিহরিয়া উঠিল। সর্ব্বনাশ! সে যে দীপ্তিকে লইয়া
কোদারমায় যাওয়ার সব ঠিক করিয়া ফেলিয়াছে! উপায়?
যাইবার দিনও তারা দুইজনে ঠিক করিয়া ফেলিয়াছে, ১০ই।
আজ তো মাসের ছ' তারিখ।

অভয় মিত্র কহিলেন,—কি, চুপ করে রইলে যে?

অরুণ ধীরস্বরে কহিল—কিন্তু আমি যে অন্য বন্দোবস্ত করে ফেলেছি!

অভয় মিত্র কহিলেন—কি বন্দোবস্ত, শুনি?

অরুণ কহিল—এক বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে যাবো বলে...

অভয় মিত্র কহিলেন—বেশ তো, বন্ধু তো এঁদের সঙ্গেও যেতে পারেন। তাতে তো কারো আপত্তি নেই!

অরুণ কহিল—কিন্তু...

অভয় মিত্র কহিলেন—এর মধ্যে আবার কিন্তু কিসের? আমি তো কোন দিন বাড়ীর মেয়েদের অতিরিক্ত পর্দ্দায় ঢেকে রাখিনি। তা ছাড়া তোমার বন্ধু, সে তো ছেলের মতই, ঘরের লোক। তবে তোমার এত চিন্তা কিসেব?

অরুণ ভাবিল, আর গোপন করা চলে না! এ কথাটা অরুণ অনেক দিনই ভাবিয়াছে! এই যে অতিথিটি আসিতেছে—সমাজ তাকে যে-চোখেই দেখুক—সে তো জানে, সে তারি সন্তান—তার ও দীপ্তির প্রাণ-অংশ দিয়া গড়া পরম স্নেহের ধন সে! তাকে তার নিজের সব পরিচয় হইতে বঞ্চিত রাখার কথা মনে হইলে অরুণ শিহরিয়া ওঠে! সে এই তার নিজের গৃহে তার সমস্ত দাবী-দাওয়া লইয়া তার নিজের স্বত্বে এই সংসারেরি একজন বলিয়া আপনার পরিচয় দিবে না? তা যদি না হইল তো সেই অসহায় নিরীহ জীবকে কি বলিয়া সে জগতে আনিতে চায়?

কিন্তু পিতাকেও সে জানে! তাঁর মন স্নেহ-মমতায় কুসুমকোমল হইলেও নিষ্ঠায় বিশ্বাসে কতখানি অটল, কঠিন,

তাও তার অবিদিত নাই !...হঠাৎ এত-বড় বিপ্লবের কথা শুনিয়া তিনি যে বিষম ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিবেন, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই ! আবার যখন সে বিপ্লব তাঁর নিজের গৃহে। তাঁরই বড় আশার বড় আদরের জ্যেষ্ঠ পুত্রের দ্বারা সে বিপ্লব ঘটিয়াছে ! সে কথা শুনিয়া তিনি যে কি করিবেন, অরুণ তা ভাবিয়া পাইল না।

পিতা কহিলেন—কি ভাবচো ?

অরুণ ডাকিল—বাবা···

অভয় মিত্র পুত্রের পানে চাহিলেন। পুত্র ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। তার পায়ের নীচে মাটীটা দুলিয়া উঠিল।

অভয় মিত্র আজ-কালকার দিনে সব দিকেই মানুষটা খাঁটী। তাঁর ধোপ্‌দোস্ত ফিটফাট পোষাক যেমন তাঁকে পরিচ্ছন্নতার দিকে অতিরিক্ত মনোযোগী বলিয়া পরিচয় দেয়, তেমনি তাঁর মনের ভিতরটাও তিনি অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন রাখিয়া আসিতেছেন, চিরকাল। তাঁর চরিত্রে কোন প্রকার দুর্ব্বলতা নাই; এবং কোনরূপ দুর্ব্বলতাকে তিনি ক্ষমাও করেন না। তিনি মুখে যা বলেন, কাজেও তা করেন। রোগী দেখিতে গিয়া কেশ্ শক্ত দেখিলে মিথ্যা আশায় রোগীর আত্মীয়-জনকে যেমন স্তোক্ দেন্ না, তেমনি রোগীর শুধু হাত টিপিয়া বা তার বুকে নাম-মাত্র একবার ষ্টেথেস্‌কোপ বসাইয়া চট্‌পট আপনার কর্ত্তব্য সারিয়াও সরিয়া পড়েন না। বয়স ষাটের কাছাকাছি হইলেও তাঁর বুদ্ধি এখনো বেশ তীক্ষ্ণ। কথার ছলে তাঁকে ঠকানো বা তাঁর কাছে ধাপ্পা

চালানো যে খুবই কঠিন, এ কথা একবার ক্ষণেকের জন্যও যে তাঁর সঙ্গে মিশিয়াছে, সেই জানে। তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা এমন ছিল যে তাঁর পুত্রেরাও হঠাৎ তাঁর কাছে ঘেঁষিতে ভয় পাইত। তাঁর হাসির মাত্রা খুব পরিমিত—তুচ্ছ কথা বা তুচ্ছ হাসিকে তিনি কোনদিনই আমোল দেন না! জীবন নানা কর্ত্তব্যে ভরপুর, তার কোথাও ফাঁকি চলে না; এবং সকলে মিলিয়া নিজেদের ছোটখাট স্বার্থ ফেলিয়া একটা শৃঙ্খলা ও পরিপাট্যের মধ্যে বাস করিবে, ইহাই ছিল তাঁর মত। এবং তাঁর এ মত যে কতখানি দৃঢ়, অবিচল, অরুণ তা খুবই জানে! অভয় মিত্র পুত্রের মুখে ছোট্ট ডাকটুকু শুনিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার পানে চাহিলেন; তারপর বলিলেন,—কি বলছিলে, বল···

অরুণ সভয়ে কোন মতে বলিয়া ফেলিল যে তার এই বন্ধুটি একজন শিক্ষিতা মহিলা; এবং তাঁকে সে পাকা কথা দিয়া ফেলিয়াছে যে তাঁর সঙ্গে সামনের এই পূজার বন্ধে সে কলিকাতার বাহিরে বেড়াইতে যাইবে! যাইবার দিন-ক্ষণ অবধি স্থির হইয়া গিয়াছে!

অভয় মিত্র ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন,—মহিলা! শিক্ষিতা! ...তাহলে কিছুদিন আগে যে শুনেছিলুম, তুমি কোর্টের ফেরত রোজ সন্ধ্যার পর বালিগঞ্জে যাও, এ তাঁরি ওখানে···?...সত্যি?

অরুণ ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল, কথাটা সত্য!

অভয় মিত্র কহিলেন,—তা এ মহিলাটিও কি একলা তোমার সঙ্গে বাইরে যাচ্ছেন···?

অরুণ কহিল,—হ্যাঁ।

অভয় মিত্র কহিলেন,—তাঁর বাপ-মা এতে মত দিয়েছেন ?

অরুণ কহিল,—তিনি তাঁর বাপ-মার সঙ্গে একত্র থাকেন না !

অভয় মিত্র কহিলেন,—মহিলাটির বিবাহ হয়েছে ?

অরুণ একটা ঢোক গিলিল, কহিল,—না।

অভয় মিত্রর আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন,—বিয়ে হয়নি ! একলা থাকেন ! আর তোমার সঙ্গে এত অন্তরঙ্গতা…!…কি রকম মহিলা…? কথাটা বলিয়া সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তিনি অরুণের পানে চাহিলেন।

অরুণ কহিল,—এমন শিক্ষিতা, এমন উঁচু মনের মহিলা আমি আর-একটিও দেখিনি…

অভয় মিত্র কহিলেন,—ও, তোমাদের লভ্ হয়েছে ! তা এঁকে বিয়ে করলেই তো গোল চুকে যায়…

অরুণের বুক একটা আশার উচ্ছ্বাসে ভরিয়া উঠিল। সে কহিল,—বিয়েয় এঁর মত নেই।

অভয় মিত্র যেন আকাশ হইতে পড়িলেন, কহিলেন,—চমৎকার ! বিয়েয় মত নেই—অথচ তোমার সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা…! বুঝেচি !…তা এ রকম মহিলার সঙ্গে তুমি বেশ অবাধে মিশছো…তোমার শিক্ষা দীক্ষাও তাহলে চমৎকার হয়েছে, দেখচি !…এ মহিলাটির সঙ্গ তোমায় ছাড়তে হবে…এ থেকেও বুঝচো না, তাঁর মতি-গতি কি ধরণের ?

অরুণ মনে বেদনা পাইল। সে কহিল—না বাবা, এঁর মন নিষ্পাপ, নির্ম্মল। ইনি ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য্য পশুপতি চক্রবর্ত্তীর মেয়ে—

পশুপতি চক্রবর্ত্তীর মেয়ে!...পশুপতি চক্রবর্ত্তী তো একজন মাননীয়-ব্যক্তি, শ্রদ্ধার যোগ্য! এ তাঁর মেয়ে হইয়া বাপের কাছে থাকে না,·· আর এই তার মতি-গতি! অভয় মিত্র একটু থামিলেন, পরে কহিলেন,—তা, বেছে-বেছে আমার টাকা-কড়ির ওপর তাঁর নজর পড়লো কেন, হঠাৎ?

অরুণ রাগিয়া উঠিল।·· বৃথা রাগ! রাগ চাপিয়া যথা-সাধ্য শান্ত স্বরেই সে কহিল,—টাকার তিনি কাঙাল নন্। তাঁর কোন বিলাসিতা নেই। তিনি একটা স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কাজ নিয়েছেন, নিজের হাতে সংসারের কাজ করেন। পয়সা কারো চান্ না তিনি।

অভয় মিত্র কহিলেন,—এইটেই তার ব্রহ্মাস্ত্র, বাপু। এই অস্ত্রে পয়সাওলা লোকের বোকা ছেলের তাক্ লাগিয়ে তাকে এই গ্রাস করা—এটা ভারী ওস্তাদী চাল!

—বাবা, তিনি অতি সরলা...! অরুণের চোখ জ্বলিয়া উঠিল।

অভয় মিত্র তাহা গ্রাহ্য না করিয়াই তার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন,—তাই তুমি দয়া-পরবশ হয়ে তাঁকে নিয়ে নির্জ্জন-বাসে চলেছ! এ নির্লজ্জ কথা তুমি আমার কাছে বললে কি করে? এই শিক্ষা পেয়েছ তুমি আমার কাছে!

…তুমি যে মস্ত-বড় আহাম্মক, তা আমি জানি। তবু এতদূর আহাম্মকি করবে, তা স্বপ্নেও ভাবিনি।…এমনি ভাবে তার সঙ্গে মেলামেশায় তোমার অধিকার কি আছে বাপু? বিয়ে করবে না, অথচ পরস্পরে এই অন্তরঙ্গতা চলবে, এর অর্থও তো শুধু একটিমাত্র দেখি! অর্থাৎ তুমি তাকে ভুলিয়ে তার সর্ব্বনাশ করবে!… আশ্চর্য্য, এটা তোমার ভদ্রতাতেও বাধচে না!

উচ্ছ্বসিত স্বরে অরুণ কহিল,—আমি তাঁকে ভোলাইনি। আমি কেন!—পৃথিবীর কোন রাজা-মহারাজাও তাঁকে কোন লোভে ভোলাতে পারে না, এমন দৃঢ় সবল তাঁর চরিত্র!

অভয় মিত্র একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন, বলিলেন,—কিন্তু একেই ভোলানো বলে। তোমার ব্যবহারে সে এমন আশা মনে নিশ্চয় গড়ে তুলেচে, যে আশা দেওয়া তোমার পক্ষে দারুণ অভদ্রতা, নীচতা! আর এর ফলে, একদিন যদি তার সন্তান-সম্ভাবনা হয়, তখন তুমি হয়তো তাকে এমন পঙ্কে নিমজ্জিত করবে, যা থেকে ওঠবার তার আর কোন উপায় থাকবে না। তখন তুমিও সরে পড়বে ভয়ে, লজ্জায়! আর তার ব্যর্থ জীবনের অভিশাপ তোমাকে পলে পলে দগ্ধ করবে!…তা যদি হয় তো জেনো, তোমার সে লজ্জায়, সে গ্লানির ব্যাপারে আমি কোন প্রশ্রয় দেবো না! এতে যদি তোমায় পরিত্যাগ করতে হয় তো…বৃদ্ধ অভয় মিত্রর স্বর নিমেষের জন্য রুদ্ধ হইয়া রহিল। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া, কাশিয়া গলা সাফ করিয়া তিনি বলিলেন,—তোমায় পরিত্যাগ করতে আমি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত

হবো না! মনে করো না, তোমার স্বর্গগতা গর্ভধারিণীর স্মৃতির খাতিরেও তোমায় ক্ষমা করবো!

অরুণের পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত টলিয়া উঠিল। সে তখন সংক্ষেপে পিতাকে বুঝাইয়া দিল, এই মহিলাটি তরুণী; এবং তাঁর মনের গতি খুবই স্বাতন্ত্র্যের পক্ষপাতী। আর সেই পক্ষপাতিতার জন্যই তিনি সমাজের কোন আচার-প্রথারই সমর্থন করেন না! পুরুষ ও নারী বন্ধুর মত বাস করিবে; এ প্রীতির ফলে সন্তান জন্মিলে নারী তার লালন-পালন করিবে, আর পুরুষ তার শিক্ষার ভার লইবে—সন্তানের সম্বন্ধে এই মাত্র দুজনের দায়িত্ব···এমনি তাঁর মত!

অভয় মিত্র কহিলেন,—বুঝেচি, তিনি পুরুষের স্ত্রী হয়ে পুরুষের সঙ্গে বাস করতে চান না, গণিকা হয়ে থাকতে চান! তাতে দায়িত্বও নেই কিছু! নব নব সুখে নিত্য মত্ত থাকা যায়!

রোষে অরুণের চিত্ত জ্বলিয়া উঠিল। কঠিন স্বরেই সে ডাকিল,—বাবা...তারপর চকিতে স্বর মৃদু করিয়া কহিল,—বাবা, তাঁর মতের সঙ্গে আমারও মতের মিল আছে। আমিও তাঁর সঙ্গে এই যে মেলামেশা করছি, এর জন্য কোনদিন অনুতাপ বোধ করিনি, অনুতাপ করবোও না ···আপনাকে আমি সব-চেয়ে শ্রদ্ধা করি...কিন্তু তাঁর উপরও আমার শ্রদ্ধা কম নয়! বিশেষ তিনি শীঘ্রই আমার সন্তানের জননী হবেন! আমাদের সন্তান-সম্ভাবনা হয়েছে!

অভয় মিত্র শিহরিয়া অরুণের পানে চাহিলেন; তাঁর মুখে কোন কথা ফুটিল না। অরুণ কহিল—আর এর জন্য আপনার ভ্রূকুটি সমাজের কুৎসা যদি আমায় মাথা পেতে নিতে হয় তো তাতেও আমি প্রস্তুত আছি। একটা এত বড় সত্যের জন্য যদি নিজের সব সুখ আমায় বলি দিতে হয়, আমায় সমাজচ্যুতও হতে হয় তো তাতে কাতর বা ক্ষুব্ধ হবো না! এই কথাটা অনেক দিন থেকে আপনার পায়ে জানাবো ভাবছিলুম—আজ সুযোগ পেয়ে বলে আমি নিশ্চিন্ত হলুম।

অভয় মিত্র সরোষে অরুণের পানে চাহিলেন। এই তাঁর পুত্র...বেইমান, অকৃতজ্ঞ! একটা তরুণীর রূপের মোহ এত বড় যে বাপকে অনায়াসে অগ্রাহ্য করিতেছে!—যে-বাপের কৃপায় সে আজ মানুষ হইয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছে! বাপের স্নেহ, বাপের মায়া একটা তরুণীর ভ্রূ-বিলাসের লীলা দেখিয়া অনায়াসে আজ সে কাটিতে চায়!...কাটুক!—কেনই বা তাঁর মায়া এ পুত্রের প্রতি! তিনি সরোষ কণ্ঠেই কহিলেন,—একদণ্ডে সব ঠিক হয়ে গেল! আজন্মের স্নেহের বন্ধন একটা তুচ্ছ খেয়ালে কেটে ফেলচো!...বেশ! আমি চিরদিন জানি, তোমার মন অত্যন্ত দুর্ব্বল। একটা উত্তেজনার ঝোঁকে তুমি পাহাড়ের ওপর থেকে লাফিয়ে পড়তে পারো! আমি তা গ্রাহ্যও করি না! বলিয়া ঘড়ি বার করিয়া তিনি সময় দেখিলেন, পরে পকেটে ঘড়ি রাখিয়া বলিলেন,—এ-সব ছোট কাজে মন দেবার মত সময় আমার নেই। তবু শেষ কথা তোমায় বলছি,

এখনো ফেরবার সুযোগ দিচ্ছি-.-পারো, তাকে বিবাহ কর।··· এ বিবাহে আপত্তি করবো না। বিবাহ করে তাকে তোমার পত্নীর মর্য্যাদা দিয়ে আমার ঘরে নিয়ে এসো, আমি তাকে পুত্রবধূ বলে সমাদর করে ঘরে নেবো। আমার দিক থেকে আদর-স্নেহেরও কোনো অভাব হবে না!···আর তা যদি না হয় তো আমার গৃহে তোমারো আজ থেকে আর স্থান নেই!

কথাটা বলিয়া তিনি আবার ঘড়ি দেখিলেন, পরে কহিলেন,—আর সাত মিনিট সময় আছে! তুমি তা'হলে এঁকে নিয়ে পশ্চিমে যাচ্ছো! যাও, কিন্তু তাঁকে সেখানে তোমায় বিবাহ করতে হবে! বিবাহ করলে এ ঘরে দুজনেই আদরে থাকবে!···তা যদি না হয়, তাহলে এইখানেই আমাদের ছাড়াছাড়ি...চিরদিনের জন্য...বুঝলে?

অরুণের মুখ দুঃখে অভিমানে রাঙা হইয়া উঠিল। সে কহিল,—কিন্তু তিনি কিছুতেই বিবাহ করবেন না। সে সব কথা তাঁর সঙ্গে বহুকাল পূর্ব্বে হয়ে গেছে। এবং আমরা কোনদিন বিবাহ করবো না, এই সর্ত্তে পরস্পরে পরস্পরকে গ্রহণ করেছি।

অভয় মিত্র তীব্র দৃষ্টিতে অরুণের পানে চাহিলেন, তার পর কহিলেন,—তা হলে আজই তোমার মহিলা-বন্ধুর ওখানে তোমার আস্তানা পাতোগে। এ কথার পর তোমাকে একদণ্ড এ গৃহে আমি থাকতে দিতে পারি না। আমরা তুচ্ছ সামাজিক জীব, আমাদের নৈতিক মতও অন্য রকমের।—তোমার এ উদার

মতের ছোঁয়াচ তোমার বোনেদের পাছে স্পর্শ করে, ..এ কথা ভাবতেও ভয়ে আমার মন ভরে ওঠে!—তারপর একটু স্তব্ধ থাকিয়া কতকটা বিদ্রূপের ভাবেই তিনি কহিলেন,—শিক্ষিতা মহিলা! বিবাহ করবেন না, অথচ পুরুষকে নিয়ে যৌবন-লীলায় মত্ত থাকবেন! চমৎকার!

অরুণ কহিল,—নারীর কল্যাণ-কামনায় নিজেকে তিনি উৎসর্গ করেছেন...

অভয় মিত্র তীব্র স্বরে কহিলেন—আর এ পাগলামিতে প্রশ্রয় দিতে তিনি যোগ্য নায়ক বেছে নিয়েছেন তোমায়! আহাম্মক গাধা ছোকরা!...সমাজের মধ্যে থেকে তুমি সমাজের ভিত্তিটা এমনি ভাবে প্রচণ্ড বিদ্রোহে নাড়া দেবে! মানব-মনের গোড়ার জিনিষটাকে অগ্রাহ্য করবে! স্ত্রী-পুরুষের মিলনকে শান্ত সংযত পবিত্র শ্রদ্ধার জিনিষ করে গড়ে তোলবার একমাত্র বিধি বিবাহ, তাকে আমোল দেবে না!...তোমাদের বিলেতেও যে এ-সব অনাচার এখনো ঘটতে সুরু হয় নি!—যাক্, আমার সময় কম, তাছাড়া এ-সব বাজে কথায় আমি মাথা ঘামাতে কখনো ভালোবাসি না! আমার যা কথা, তোমায় বলেছি। সে কথা মান্‌তে পারো তো আমার ঘরে স্থান পাবে। নাহলে এ উদার দুনিয়ায় তোমাদের অতি-উদার মত নিয়ে চরে বেড়াও গে!...

কম্পাউণ্ডার নিবারণ আসিয়া সংবাদ দিল, গাড়ী তৈরী! অভয় মিত্র কহিলেন,—আমার কথা মনে রেখো!...এ কথা যদি পালন করা শক্ত বোঝো, তা হলে ফিরে এসে যেন শুনি, তুমি

এ-বাড়ী ছেড়ে গেছ! আর এ-বাড়ীর কেউ নও তুমি। আমার এত কষ্টে রোজগার করা টাকার একটা টুকরোও তোমাদের এই বাঁদরামিকে সাহায্য করবে না—এ কথাও জেনে রেখো।—

তিনি একটা নিশ্বাস ফেলিলেন; তারপর বলিলেন,—আমি ভাববো, আমার ছেলে অরুণ ছিল,...মারা গেছে!

নিবারণ অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অভয় মিত্র একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ডাকিলেন,—এসো হে নিবারণ!...বলিয়া তিনি নিবারণকে লইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

অরুণ কিছুক্ষণ হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিল, পরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া টলিতে টলিতে পাশের ঘরে ঢুকিয়া মূর্চ্ছিতের মত একটা কৌচে ঢলিয়া পড়িল।

— ৮ —

মন একটু শান্ত হইলে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া অরুণ বরাবর গোলদীঘির দিকে আসিল। গোলদীঘিতে আসিয়া সে একটা বেঞ্চে বসিয়া চিন্তার গহনে নিজের মনকে ছাড়িয়া দিল। পিতা তার প্রতি আজ এ কত বড় অবিচার করিলেন! সে কি অপরাধ করিয়াছে যে এত বড় রূঢ় শাস্তি তিনি দিয়া গেলেন! স্নেহ-মায়া ভালবাসার সব বন্ধন এক কথায় কাটিয়া দিলেন!... স্নেহ-মমতা এমনি দুর্ব্বল ভিত্তির উপর বসিয়া ছিল!...কেবল স্বার্থের একটা সরু সুতায় ভর করিয়া দুলিতেছিল! এমন যে

স্বার্থে প্রভুত্বে একটু ঘা লাগিতেই তা ভাঙিয়া ছিঁড়িয়া যায়! এত ভঙ্গুর এই স্নেহ-মমতা লইয়া সমাজ!...কারো স্বার্থে এখানে ঘা পড়িবার জো নাই!...অমনি বিরোধ!...কি বিপুল স্বার্থপরতাকে আশ্রয় করিয়াই না এই সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে! কাহারো মনের প্রতি কেহ চাহিয়া দেখিবে না! সে-মন কত বড়, সত্যের আশ্রয় লইয়া কি নির্ম্মল স্নিগ্ধতায় ভরিয়া আছে, তাও কেহ দেখিবে না...শুধু নিজের স্বার্থ দিয়াই সকল ব্যাপারের বিচার নিষ্পত্তি করিবে! এ-সব ভাবিয়া মন তার কতক হাল্কা হইল, এ সমাজের বন্ধন, এ তো নাগপাশ, এ-বন্ধন হইতে মুক্তি পাইয়া সে আজ বাঁচিয়া গিয়াছে!

...যদি সে দীপ্তির দেখা নাই পাইত! তাহা হইলে তো সে একা, নিঃসঙ্গ দিন কাটাইয়া চলিত! এবং বিবাহ না করিয়া এমনি নিঃসঙ্গ থাকিয়া যদি সে কোন গোপন ব্যভিচারে আপনাকে ডুবাইয়া রাখিত, তাহা হইলেও সমাজের কোনদিক হইতে কোন কথা উঠিত না, পিতার বিশ্বাস আর স্নেহও বুঝি অটল থাকিত...। অথচ তা না করিয়া দুটী মুক্ত হৃদয় সর্ব্বপ্রকার বন্ধন কাটিয়া একত্র মিশিয়াছে—সে-মিলনকে তারা গোপন করিতে চায় না, কোন ভাণ বা মিথ্যা অনাচার দিয়া তাহা ঢাকিয়া রাখিতে চায় না—এই জন্যই না শাসনের এই রুদ্র হুঙ্কার!...কোন দুঃখ নাই! তাদের এ মিলন... ঐ ভণ্ড সমাজের নিয়ম মানিয়া তার পুরানো গণ্ডী স্বীকার

করে নাই বলিয়া পঙ্গু, অচল হইবে? কখনো না!... অসতীত্ব কাকে বলে? যে-মিলনে প্রেমের নামগন্ধ নাই! তাদের মিলন?...প্রেমের দৃঢ় ভিত্তি এ-মিলনের একমাত্র আশ্রয়। এর কাছে বিবাহের মন্ত্র? সে তো কতকগুলো ভুয়ো কথা মাত্র!

সে দিন বেলা পড়িতেই সে দীপ্তির গৃহে গিয়া উপস্থিত হইল। দীপ্তি কহিল,—আজ যে এত সকাল সকাল এলে!

দীপ্তির পানে চাহিবামাত্র অরুণের মন সঙ্কোচে ভরিয়া উঠিল! ...এই নির্ম্মল নিষ্পাপ দেহ-মন লইয়া সত্যের কি অটল দার্ঢ্যে দীপ্তি দাঁড়াইয়া আছে...পিতা এর অন্তরের দাম বুঝিলেন না, বুঝিবার প্রয়াসও পাইলেন না! না বুঝিয়া নিতান্ত নির্ম্মম নিষ্ঠুর প্রাণে কতকগুলা ইতর সন্দেহের তীক্ষ্ণ বাণ ইহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন!...এমন বে-দরদী পিতার পুত্র হইয়া দীপ্তির সামনে দাঁড়াইতে লজ্জায় হীনতায় মাথা যেন তার কাটিয়া গেল!

অরুণ কহিল—তুমি তৈরী হও, দীপ্তি। আর কটা দিনই বা আছে!

দীপ্তি কহিল—কোদারমাই তো ঠিক তা হলে?

অরুণ কহিল,—নিশ্চয়।

অরুণ ভাবিয়াছিল, পিতার সঙ্গে তার সব সম্পর্ক সে ছিন্ন করিয়া আসিয়াছে। দীপ্তি ছাড়া তার আজ বিশ্বে আর আপন-জন কেহ নাই!—তবু এই কথাটা সে বলিতে পারিল না। দীপ্তির এই নিশ্চিন্ত আরাম-সুখ—না জানি, সে কি আঘাতই

পাইবে! বাহিরকে যখন সে পরিহার করিয়াই আসিয়াছে, তখন সেখানকার ধূলি-জঞ্জাল, সেখানকার কোলাহলের ছিটায় একটুও আর জাগাইয়া তুলিয়া কাজ কি! এখানে তর্ক নয়, ঝড় নয়,... শুধু শান্তি, শুধু সুখ!

মাঝের এ কয়টা দিন একটা হোটেলে থাকিয়া অরুণ কোনমতে কাটাইয়া দিল। এক-একবার ইচ্ছা হইতেছিল, পিশিমার সঙ্গে দেখা করিয়া আসে। কিন্তু না! বাবা বলিয়াছেন, ভাই-বোনদের মনে যেন তার বিদ্রোহী-চিত্তের ছোঁয়াচ্ এতটুকু না লাগে! অভিমানে অরুণের মন ভরিয়া উঠিল। আজ মা বাঁচিয়া থাকিলে গৃহের দ্বার এমন বন্ধ থাকিত না···কখনো না!...মা তাকে আদর করিয়া ঘরে ফিরাইয়া লইয়া যাইতেনই! মার স্নেহ-দৃষ্টিতে এ নির্ম্মলতা এ উদারতা কখনো এড়াইয়া থাকিত না! বাবা ত্যাগ করিয়া যদি সুখী হন, তবে তাই হোক! তার চোখের কোণে জল ছাপাইয়া আসিল। সে একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

তার পর যথা-নির্দ্দিষ্ট দিনে ট্যাক্সি আনিয়া দীপ্তিকে লইয়া সে বালিগঞ্জ ত্যাগ করিল। যাইবার সময় বাড়ীওয়ালাকে তার ভাড়া চুকাইয়া বাড়ী একেবারে ছাড়িয়া দিয়া গেল।—তারা চলিয়া গেলে সারা পল্লী ভরিয়া একটা কুৎসা সাড়া দিয়া উঠিল,—এই মেয়েটীর ভিতরেও এত ছিল···গোপনে আলাপ-পরিচয়। ঝীটা আরো তীব্র সংবাদ দিল—মেয়েটি প্রসব হইতে চলিয়াছে! ...পাড়ার লোক তাহা শুনিয়া একবাক্যে বলিল—অমন লেখা-

পড়া জানার মুখে আগুন! ছি!…এ পাড়া ছাড়িয়া পাপ হইতে পল্লীটাকে খুব যাহোক্ বাঁচাইয়া গিয়াছে!…

কথাগুলা অবশ্য অরুণ বা দীপ্তি কেহই শুনিল না!… তারা তখন দীপ্ত আবেগে ষ্টেশনের পথে যাত্রা করিয়াছে।

কোদার্ম্মায় আসিয়া সুখের আর অন্ত রহিল না। চারিদিকে প্রকৃতির কি অবাধ মুক্তি! দূরে পাহাড়গুলা যেন এই বিচিত্র রমণীয় দৃশ্যের পিছনে সমাজের ভ্রূকুটির মত দাঁড়াইয়া আছে! ও ভ্রূকুটি আছে বলিয়াই না মুক্তির আনন্দ এমন স্পষ্ট অনুভব করা যায়! আলোর পিছনে কালো আছে বলিয়াই না আলোর এত আদর!… তার পর এই মুক্তির মাঝে দুইজনে পরস্পরকে এমন পাশাপাশি পাইয়াছে, অহরহ, সর্ব্বক্ষণ …এক-মুহূর্ত্ত বিচ্ছেদ নাই! দীপ্তির কাছে এ আনন্দ একেবারে অভিনব—প্রাণের জনকে সর্ব্বক্ষণ এমনি প্রাণের পাশে পাওয়া!…এমন এক সঙ্গে বাস, এক সঙ্গে বেড়াইতে যাওয়া! মনটাকে সে যেমন করিয়াই গড়িয়া তুলুক না, নারীর প্রাণ তো এ!……

বেড়াইতে গিয়া অরুণ উচ্ছ্বসিত আনন্দে কত দেশের কত গল্প বলে, গানের মত দীপ্তির কানে সে যেন অমৃত বর্ষণ করে! …অরুণের জ্ঞানের গভীরতা অনুভব করিয়া তার মন শ্রদ্ধায় ভরিয়া ওঠে। অরুণের কাছে জগতের কত বিষয়ে কত শিক্ষাই সে লাভ করিল!…দীপ্তির মন তার নিজের অজ্ঞাতে

অরুণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া এক অপরূপ সার্থকতায় ভরিয়া উঠিল! এই শিষ্যত্ব তাকে একদিন দেখাইয়া দিল, সে নারী, অরুণ পুরুষ! অনেক বিষয়ে পুরুষের উপর নারীকে নির্ভর করিতেই হইবে—এ নির্ভর করা ছাড়া নারীর উপায়ান্তর নাই! এইখানেই নারীর নারীত্ব! এই নির্ভরশীলতা যে বহু যুগের বহু জন্মের সংস্কারে নারীর প্রাণের বস্তু হইয়া তার প্রাণ-রসে মিশিয়া আছে! নারীর তাকে একেবারে উপেক্ষা করা চলে না! ঐ যে সামনে একটা বড় গাছ তার বিপুল শক্তিতে বাড়িয়া উঠিয়াছে, তার গলা বেড়িয়া কত পাকেই না একটি লতা ঐ আপনাকে বাড়াইয়া তুলিতেছে! গাছটা ছাঁটিয়া ফেলো, লতাটিও তার সঙ্গে সঙ্গে ধূলি-লীন হইয়া যাইবে! নারীও এমনি-পুরুষের গা বেড়িয়া বাড়িয়া উঠিতেছে! দীপ্তির মন হঠাৎ বাধা পাইল। সে ভাবিল, সত্যই কি তাই! পুরুষ নহিলে নারীর বাড়িবার কি বাঁচিবার উপায় সত্যই কি নাই? দীপ্তি হাসিল, বেশ, তবে তাই হোক! এ নির্ভরতার মূলেও তো ঐ প্রীতি! তাকে সামাজিক বিধি তুলিয়া বিবাহ নামটা নাই দিলে! এ প্রীতি থাকিলেই তো সব থাকিল! এ প্রীতিকে একটা বিধির গণ্ডীর মধ্যে না ফেলিলেও তো এ প্রীতি প্রীতিই থাকিবে!……তবে? বিবাহ বলিয়া তার আর-একটা নাম নাই দিলাম! প্রাণের এ মুক্ত মিলনকে একটা শাসনের পাশে নাই বাঁধিলাম! দীপ্তি ভাবিল, ঠিক!

তার পর নির্জ্জন অবসরে তার চিন্তা আর একটা

বিষয়ে আপনাকে তন্ময় করিয়া ফেলিত। যে ক্ষুদ্র জীব তার বুকের মধ্যে এই নূতন স্পন্দন জাগাইয়া তুলিয়াছে, এই যে নবীন অতিথি আসিতেছে,—তার সৌন্দর্য্যে নির্ম্মল সৌকুমার্য্যে আপনাকে ভরিয়া……এ যে কি অকথিত সুখের মূর্চ্ছনার মত…! তার চিন্তায় দীপ্তির মন অপূর্ব্ব পুলকে ভরিয়া উঠিত। এ অতিথিটি তারি রক্তে-মাংসে গড়া, অরুণের রক্তে-মাংসে গড়া…দুজনের প্রীতি-সখ্যের জীবন্ত উচ্ছ্বাস! এ যে দুজনের প্রাণের কামনা মূর্ত্ত হইয়া তাদের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইতেছে! তাদের দুজনের দুই হাত ধরিয়া এ যে তাদের প্রীতির ডোরটিকে শৃঙ্খলের মত আঁটিয়া বাঁধিয়া থাকিবে! প্রচণ্ড গৌরবের দীপ্তিতে তার মন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে ফিরিয়া চাহিল। অরুণ ষ্টোভ জ্বালিয়া জল গরম করিতেছিল; সামনে দুইটা পেয়ালা আর চায়ের টীন পড়িয়া আছে। দীপ্তি একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, এই দুই বাহুর সম্মিলিত শক্তিতে তাদের ঘরে কি নিবিড় সুখ আর আরাম না তারা রচিয়া তুলিবে! এর চেয়ে কাম্য আর কি থাকিতে পারে!

চা খাইয়া অরুণ কহিল—এক কাজ করবে দীপ্তি?

দীপ্তি বলিল,—কি?

অরুণ কহিল,—আজ শীগগির খাওয়া-দাওয়া সেরে নি এসো। তারপরে ট্রেণে উঠে চল, ওদিকে বেড়িয়ে আসি। এর পরের ষ্টেশন গজহস্তী, গজহস্তীর পর গুর্পা। গজহস্তী আর গুর্পার মাঝে চমৎকার তিনটে টনেল আছে। আর লাইন এত নেমে

নেমে গেছে, যেন থাক্ থাক্ সিঁড়ি সাজানো। দার্জ্জিলিংয়ের সেই কার্ট রোডের মত! যাবে?

দীপ্তি বলিল,—যাবো।

অরুণ খুসী হইল। তারপর আহার করিয়া দুইজনে ষ্টেশনে আসিল; এবং ট্রেন আসিলে ট্রেনে চড়িল। চারিধারে প্রকৃতির আনন্দের মেলা বসিয়াছে! ঐ পাহাড়, ঐ ঢালু জমি, ঐ নিবিড় জঙ্গল। আর দূরে মাটীর ঢিপিগুলা ঐ অভ্রের কুচি গায়ে মাখিয়া ঝক্ ঝক্ করিতেছে! গজহস্তী পার হইবার পর ট্রেন যেন একটা সুড়ঙ্গ-পথে ঢুকিল। দু'পাশে উঁচু পাহাড় মনুমেণ্টের মত খাড়া উঠিয়াছে···প্রাচীর-ঘেরা পথ! আর সেই পথ ধরিয়া ট্রেন, না, দীর্ঘ সরীসৃপ চলিয়াছে! বাঁকের পর বাঁক, আর পিছনে ঐ সিঁড়ির মত থাক সাজানো! জঙ্গলে আচ্ছন্ন চারিধার ···গাছের মাথায় গাছ উঠিয়াছে, তার পরে আবার গাছ···কে যেন থাক্ দিয়া গাছ সাজাইয়াছে! থাকে থাকে রেলের লাইনও বাঁকিয়া গিয়াছে। আর সেই বহু-উচ্চ থাকের গায়ে সিগনালটা লাল ও সবুজ রঙের চশমা চোখে দিয়া একটা হাত খাড়া করিয়া দাঁড়াইয়া আছে···এ-পথের পথিককে যেন সে পথের সন্ধান বলিয়া দিতেছে।

ট্রেন আসিয়া গুর্পায় থামিলে দুইজনে নামিল; এবং একটা পথ ধরিয়া চলিয়া গেল সোজা ঐ বনের দিকে!

অভ্রের কুচি চিক্ চিক্ করিতেছে! পথে যেন কারা হোলি খেলিয়া গিয়াছে! পাহাড়ের রাঙা মাটী আর তার গায়ে গায়ে

অভ্রের রূপালি কুচিণ্  কোথাও জমি খুব উঁচু, আর ঠিক তার পাশেই এমন ঢালু পথ কোথায় কত নীচে যে গড়াইয়া গিয়াছে! মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড ডোবা। ডোবার জল যেমন স্বচ্ছ তেমনি পরিষ্কার, ঘোলা নয়—মাটীর বুকে আরসির মত পড়িয়া আছে!

বেড়াইয়া দীপ্তি শ্রান্ত হইয়া পড়িল। অরুণ কহিল,—বসো দীপ্তি...বলিয়া একটা শুষ্ক বৃক্ষ-কাণ্ড সে দেখাইয়া দিল। দীপ্তি সেটায় বসিলে অরুণও তার পাশে বসিল। দীপ্তি তখন তৃষিত নেত্রে অরুণের পানে চাহিল; তার একটা হাত নিজের হাতে তুলিয়া লইয়া বলিল—একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো। সত্যি জবাব দেবে?

অরুণ কহিল,—দেব বৈ কি! আমাদের মধ্যে মিথ্যার কোন আড়াল তো রাখিনি দীপ্তি! কি বলবে, বল!

দীপ্তি কাতর নয়নে অরুণের পানে চাহিল; তার পর বেদনা-বিদ্ধ স্বরে কহিল,—আমার মনে সময় সময় এমন অনুতাপ হয়...দীপ্তি চুপ করিল।

অরুণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল, কহিল,—কিসের অনুতাপ দীপ্তি?

দীপ্তি কহিল,—আমার একটা মতের জন্য তোমায় তোমার নিজের জায়গা থেকে, স্নেহ-মায়া-আরামের শিকড় কেটে এমন উপড়ে ছিঁড়ে এনেছি,...স্নেহ-স্মৃতির সমস্ত নিবিড় বাঁধন ছিঁড়ে... আমার পিছনে তুমি এ-ভাবে যে ফিরছ, এতে কত কষ্টই হচ্ছে তোমার, কত বেদনা...

অরুণ উচ্ছ্বসিত আবেগে দীপ্তিকে বুকের মধ্যে টানিয়া বলিল—কোন কষ্ট নয় দীপ্তি !···কষ্ট কেন হবে ! তোমার প্রাণ-ঢালা ভালবাসা যে আমার কোথাও কোন অভাব রাখে নি···

দীপ্তি কহিল—কিন্তু বাড়ীর স্নেহ-আদর, ভাই-বোনের ভালোবাসা···! আমার যখনি মনে পড়ে, আমি তোমায় সকলের কাছ থেকে ছিঁড়ে টেনে নিয়ে এসেছি, আমার জন্য তুমি সব ত্যাগ করেছ···মন আমার তখন কি যে আকুল হয়ে ওঠে ! আমার মনে পড়ে, আমি যখন এমনি চলে এসেছিলুম, তখন পিছনে কি আহ্বান আমায় আকুল স্বরে ডাক্‌তো, ফিরে আয়, ফিরে আয় !···তবু ফিরিনি।...নিজের এই মতকে সবলে আঁকড়ে ধরে সে-আহ্বানকে হঠিয়ে দিছি, কঠিন প্রাণে—বুক আমার ছিঁড়ে রক্তাক্ত হয়ে গেছে...তবু পিছনে ফিরে তাকাইনি !

অরুণ সাদরে তার মুখখানি বুকে চাপিয়া ধরিল। দীপ্তি মুখ তুলিয়া অরুণের পানে ফিরিয়া চাহিয়া কহিল,—সে আহ্বান তোমারও প্রাণে বাজচে তো ! আমি নিজের সেই মন নিয়ে তোমার মন যে বুঝতে পারছি··· !

তার পর ক্ষণেকের জন্য সে স্তব্ধ হইল, পরে কহিল—আবার ভাবি, এই স্নেহ-মমতা ছিঁড়ে এই বিজন পথে দুজনে যে বেরিয়েছি, যদি এ সত্য-পথ না হয়...

অরুণ কহিল.—সত্য পথ বৈ কি ! আমাদের মন যে বলছে, দীপ্তি, এতে সায়ও দিচ্ছে—

দীপ্তি কহিল,—তবে কেন মন থেকে থেকে পিছন-পানে

ফিরে চাইবার জন্ম আকুল হয়! এ কি মনের ভুল, না, এইটেই ...দীপ্তির স্বর গাঢ় হইয়া উঠিল।

অরুণ কহিল,—খাঁচার বাঁধন কেটে পাখী যখন আকাশে উড়ে চলে, গান গেয়ে...তখন খাঁচার পানে ফিরে ফিরে তাকাতেও সে ছাড়ে না! এটা মনের অন্ধ সংস্কার, মোহ! কিন্তু মুক্ত পাখী আবার ফিরে খাঁচায় ঢুকতে চায় না তো!

এ কথা দীপ্তির কানেও গেল না। সে অরুণের পানে স্তম্ভিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল ও উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনাবেগে কহিল—যদি তোমায় আমার সঙ্গে বেঁধে টেনে এনে অপরাধ করে থাকি তো সেজন্ম মাপ করো। আর স্নেহ-মমতার যে নিবিড় আশ্রয় ছেড়ে এসেছ, সে স্নেহ-মমতা পূরণ করে দেবার জন্ম আমার প্রাণ-মন উজাড় করে আমার মনের সমস্ত ভালবাসা, প্রাণের সব প্রীতি দিয়ে তোমায় ঘিরে রাখবো...যতখানি আমার আছে, তাই দিয়ে...নিজেকে নিঃস্ব কাঙাল করেও...প্রিয় আমার, বন্ধু আমার, সখা আমার...

এ সময় এ উত্তেজনা বা এই আবেগ দীপ্তির শরীরের পক্ষে ঠিক নয় ভাবিয়া অরুণ একটু চিন্তিত হইল। সে দীপ্তিকে স্নেহে আদরে বুকে ধরিয়া কহিল,—তুমি নিশ্চিন্ত হও, দীপ্তি! তোমার প্রেমে আমার কোথাও কোন অভাব নেই, জেনো!... এই মুক্ত গগন-তলে, এই মুক্ত প্রকৃতির বুকে, মুক্তির কি পরশই যে আমার চিত্ত আলোয় ভরে তুলেছে...

অরুণ মুগ্ধ আনন্দে দীপ্তির পানে চাহিল, পরে ধীরে ধীরে

বলছিল—তাছাড়া একটা কথা কি জানো দীপ্তি, আমাদের আত্মীয় বল, প্রিয়জন বল, এঁদের সঙ্গে আমাদের যে মেলামেশা, এঁদের সঙ্গে আমাদের যে ক্ষণিক মিলন বা দীর্ঘ বিচ্ছেদ, এগুলো আমাদেব আরিধার থেকে পরিপূর্ণ করে তোলবার সহায়তা করে শুধু! এঁদের আঁকড়ে পড়ে থাকাই মনের ধর্ম্ম নয়। আমরা সকলে এখানে সকলকে গড়ে তুলি। মা-বাপের স্নেহ যেমন শিশুকে বাঁচিয়ে বড করে তোলে, তাঁদের মমতাও তেমনি আমাদের প্রাণের ক্ষুধা-তৃষ্ণা মিটিয়ে তাকে ভরিয়ে রাখে! তারপর ভাই আছে, বোন আছে, বন্ধু আছে, সঙ্গী আছে, তারা হাসির ছটায় অশ্রুর ঝলকে মনকে দোলা দেয়, নানা জিনিষে আমাদের স্মৃতির ভাণ্ডাব পূর্ণ করে তোলে। তারপর আসে প্রিয়া···প্রেমের জ্যোৎস্নায় আদরে হিল্লোলে সারা যৌবনকে বিচিত্র মধুব করে দিতে। তার পরে সন্তান আসে, আর-এক অভিনব সুখের উচ্ছ্বাসে প্রাণটাকে ভরিয়ে তুলতে! এক সঙ্গে এদের সকলকে ভরে রাখবো, মনে তার স্থান কৈ! একসঙ্গে ভিড় জমালে মনেব মধ্যটা বিপ্লবে-বিরোধে টলমল করে উঠবে—সে ভিড় ঠেলে সবাই প্রাণের মধ্যে বেশী জায়গা দখল করে থাকতে চাইবে!... তাই এক-একজন এক-একটা জিনিস নিয়ে মনে এসে দাঁড়ায়, তাদের সকলকে যথাযোগ্য সমাদর দিয়ে গ্রহণ করতে পারলে মনও আমাদের নির্ব্বিরোধে তার সমস্ত ছবি ফুটিয়ে বেড়ে উঠতে পারে···স্বাস্থ্যের পরিপূর্ণ হিল্লোলে, নিবিড় স্বচ্ছতায়!...মা-বাপের স্নেহ-আদর, ভাই-বোনের ভালবাসা

আমাদের মনকে যতদূর অগ্রসর করে দেবার, তা দিয়েছে! এখন আমাদের দুজনের পালা এসেছে...পরস্পরে পরস্পরের মন-দুটিকে ফুটিয়ে সাজিয়ে বাড়িয়ে তুলবো,...তাই!... তার পর এ পালাও সাঙ্গ হবে, তখন দুজনে সন্তানকে পেয়ে মনের আর-একটা শূন্য দিক ভরে তুলবো!... মানুষের জীবন-লীলা এই ধারায় বয়ে চলেছে!...তবে কেন তুমি মিছে কাতর হচ্ছ?...বলেছি তো, আমার প্রাণে কোথাও কোন অভাব নেই আজ, এতটুকু শূন্যতা নেই! বিপুল সার্থকতায় সে তার পথে ক্রমেই অগ্রসর হয়ে চলেছে!...

— ৯ —

প্রায় সপ্তাহ পরে এক দিন একা বেড়াইতে গিয়া হঠাৎ সন্ধ্যার ট্রেণে অরুণ জ্বর-গায়ে বাড়ী ফিরিল। দীপ্তি সেদিন ছোট-একটু উৎসবের আয়োজন করিয়া মাংস রাঁধিতেছিল। অরুণ আসিয়া একেবারে বিছানায় শুইয়া পড়িল। দীপ্তি তা দেখিয়া ধড়মড়িয়া উঠিয়া আসিয়া কহিল—কি হয়েছে গা?... শুলে কেন?

অরুণ কহিল,—বড্ড মাথা ধরেছে দীপ্তি। জ্বরও একটু হয়েছে বুঝি।

দীপ্তি শঙ্কিত প্রাণে অরুণের গায়ে হাত দিয়া দেখিল, গা যেন আগুন!...তার মনের অতি-গোপন স্থানে কে যেন

ফ্যাস করিয়া ছুরি টানিয়া দিল! অমনি প্রাণের কোন্ বিজন কোণে প্রচ্ছন্ন সুপ্ত একটা চিন্তা সে ছুরির ঘায় মাথা তুলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—তার সে মূর্ত্তি দেখিয়া দীপ্তির বুক কাঁপিয়া শিহরিয়া উঠিল। অডি-কলোনের শিশি আনিয়া পটি করিয়া অরুণের কপালে চাপিয়া ধীরে ধীরে তাকে সে পাখার বাতাস করিতে লাগিল। অরুণ আরাম পাইয়া চক্ষু মুদিল।

কতক্ষণ পরে ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, মাংস পুড়িয়া যাইতেছে।...

একটা দুর্গন্ধ আসিতেছে বটে, এ তবে তারই...!

দীপ্তি কহিল,—যাক্ গে...

অরুণ পাশ ফিরিয়া কহিল,—কি বলচো... ?

দীপ্তি কহিল,—মাংস রাঁধছিলুম, তুমি খাবে বলেছিলে... তা দোয়ার্‌কা এসে বলছে যে, সে মাংস না কি পুড়ে গেছে!

—কেন!...অরুণ স্থির দৃষ্টিতে দীপ্তির পানে চাহিল, পরে কহিল,—তুমি যাও...দ্যাখো গে! আমি ভালো আছি। একটু ঘুম আসছে। ঘুমোলেই শরীরটা সেরে যাবে। তুমি যাও, মাংস নামিয়ে রেখে এসো...একেবারে খেয়েই নয় এসো। আমি আজ কিছু খাবো না।

দীপ্তি কহিল,—আমিও খাবো না।

—কেন দীপ্তি?

কেন! এ প্রশ্নের উত্তর নাই! দীপ্তি কোন উত্তর দিল না। তার দুই চোখে শুধু জল ছাপাইয়া আসিল।

অরুণ আবার কহিল,—কেন খাবে না দীপ্তি...?

যা বলিয়া যতই বুক বাঁধো, এইখানেই ধরা পড়ে গো... পুরুষ পুরুষ, আর নারী নারীই...! নারীর অন্তরের বেদনা পুরুষ যদি বুঝিত!...তা বোঝে না বলিয়াই তারা এমনি সব উদ্ভট প্রশ্ন তোলে। আর সে-প্রশ্নের জবাব নারী দিতে পারে না...জবাব বুঝি তার নাইও!...দীপ্তি কোন জবাব দিল না। অরুণ কহিল,—বল...

দীপ্তি কহিল,—আমার খিদে নেই।

অরুণ কহিল,—খিদে নেই!...তা হলে মাংস...

দীপ্তি ভৃত্যের দিকে ফিরিয়া কহিল,—তুই খেতে চাস তো রেঁধে নিগে যা—আমরা খাবো না। তুই ওধারে গুছিয়ে নিগে সব...আর তোর রান্নাও তুই নিজে করে নে বাবা, ঠাকুর তো আজ আসবে না! বাবুর অসুখ দেখছিস্ তো, আমি এখন কোথাও যেতে পারবো না।

রোগের এই দুঃসহ যাতনার মাঝে বিশ্বের কি আরামই না অরুণের প্রাণে বহিয়া আসিল! আঃ! তার জন্য দরদ করিতে একজন আছে...! অরুণ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া দীপ্তির পানে চাহিল। দীপ্তির চোখে তার প্রাণের যত কাতরতা আসিয়া জমিয়া উঠিয়াছিল; সে অপলক নেত্রে অরুণের রোগ-কাতর মুখের পানে চাহিয়া রহিল।...

পরদিন সকালে কোদার্মার ডাক্তার বাবু আসিয়া অরুণকে দেখিয়া গেলেন, ঔষধও দিলেন।...তার পর কি সে সংগ্রাম

সুরু হইল। দিনের বেলা রৌদ্রের মুক্ত হিল্লোলে দীপ্তির প্রাণ আশায় ভরিয়া ওঠে, ভয় কি! অসুখ হইয়াছে, সারিয়া যাইবে!...কিন্তু সন্ধ্যা যখন প্রান্তর পার হইয়া ঐ পাহাড়ের শিখর ঠেলিয়া নামিয়া আসিয়া চারিদিক তার শ্যাম অঞ্চলে ঢাকিয়া ফেলে, তার পর কালো বাদুড়ের মত পাখায় ভর করিয়া আঁধার রাত্রি নিঝুমভাবে বিশ্বে আসিয়া দাঁড়ায়...খোলা জায়গার ধ্য দিয়া যতদূর দেখা যায়, শুধুই আঁধার, ঘনঘোর আঁধার... তখন ঘরের মধ্যে স্তিমিত আলোয় বিছানায় এই রোগ-পীড়িত প্রিয় সাথীর বুক ঠেলিয়া যে অসহ্য কাতরতা মর্ম্মরিয়া ওঠে, তখন কি ভয়ে, কি ব্যথায় যে দীপ্তির প্রাণ টন্‌টন্ করিতে থাকে, তা সে-ই জানে! লোকালয়ের বাহিরে, এই বিজন বনের প্রান্তে একা সে,...কি করিয়া অরুণকে ভালো করিয়া তুলিবে! নিজের এই দুর্ব্বল শরীর-মন...তবু সে যুঝিতে কাতর নয় তো! ...হায়রে, এ দুঃসময়ে এমনি বিপদের মাঝেই মানুষ সহায় চায়— সেবায় না হোক্, মুখের একটা কথাতেও যদি কেহ মনের এ দুর্জ্জয় আতঙ্ক একটু সরাইয়া দেয়!...বুকের উপর এই অন্ধকার পাহাড়ের ভার লইয়া চাপিয়া আছে, একা তো এ পাহাড়কে ঠেলিয়া ফেলা যায় না! কাতর চোখের আড়ালে অশ্রুর পাথার রুখিয়া সে অরুণের পানে চায়,—সেই হাসিমাখা সরস অধর, সেই দীপ্ত চোখের ভাবার-উচ্ছ্বাসে-ভরা স্বচ্ছ তারা, সেই আলো-করা মুখ...কি মলিন, ও কি বেদনা সহিতেছে গো!...

আট দিন সমানে এই ভাব!...আট দিনে অরুণ এ কি যে হইয়া গিয়াছে!...জরের বিরাম নাই...আর, এ কি জর!...তার উপর এই বকুনি...জরের ঘোরে প্রবলভাবে ঝাঁকিয়া-ঝাঁকিয়া ওঠা!... আর বকুনি—দীপ্তির পক্ষ লইয়া বাপের সঙ্গে শুধু তর্ক...চোখের পলক পড়িতে তখনি আবার সে তর্ক ভাঙ্গিয়া করুণ আর্ত্ত মিনতির অশ্রুতে গলিয়া পড়িতেছে! পরক্ষণেই সারা দুনিয়ার সঙ্গে প্রচণ্ড কলহ—কি ঝাঁজ! কখনো দীপ্তির নাম ধরিয়া ডাকিয়া কেবলি তাকে বুঝাইবার চেষ্টা, অরুণ তাকে কত, কত, কত ভালবাসে...

দীপ্তির দুই চোখ এ সব কথায় জলে ভরিয়া যায়! সে যেন পাগল হইয়া ওঠে! অরুণের ভালবাসা কত, সে তা জানে... রোগে পড়িয়াও সর্ব্বক্ষণ তার পক্ষ লইয়া এই যে কথা!...তার চোখে যেন শ্রাবণের ধারা জাগিয়া আছে, সারাক্ষণ!...তবু আজ নিরুপায়, নিরুপায় সে...কতখানি অসহায়!...কে আছে এ দুনিয়ায়, যে আজ তার প্রাণের বন্ধুকে, তার স্বামীকে ...স্বামী, স্বামী, স্বামীকে...বাঁচাইয়া তুলিবে!...বাঁচানো চাই, তাকে বাঁচানো চাই!...দীপ্তির প্রাণ ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সেদিন অরুণের অবস্থা দেখিয়া দীপ্তির এমন ভয় হইল যে, কোন দ্বিধা না করিয়া সে তখন নিজের হাতে টেলিগ্রাম লিখিয়া পাঠাইল, অরুণের পিতার কাছে...

"আপনার পুত্র অরুণ কোদার্মায় টাইফয়েডে শয্যাগত।

অবস্থা খুব খারাপ। ডাক্তার হতাশ...যা ভালো বুঝিবেন, করিবেন। দীপ্তি।..."

টেলিগ্রাম পাঠাইয়া সে অরুণের শিয়রে আসিয়া বসিল। ...আবার ঐ যাতনা...এ যাতনার কি নিমেষ বিরাম নাই!... ওঃ! একা, ওগো, একা সে মৃত্যুর সঙ্গে কত লড়া লড়িবে? তাকে লইয়াও মৃত্যু যদি অরুণকে ছাড়িয়া দেয়! ...চোখের জলে দীপ্তির দৃষ্টি অস্পষ্ট ঝাপসা হইয়া আসিল, বুকে যেন পাথর চাপিয়া রহিল!...

ঘণ্টা তিনেক পরে দ্বারে কে করাঘাত করিল। দীপ্তি ধড়-মড়িয়া উঠিয়া গেল। পিয়ন! টেলিগ্রাম আসিয়াছে। ...অভয় মিত্র টেলিগ্রাম করিয়াছেন—টেলিগ্রাম অরুণের নামে।...

"এক্সপ্রেসে রওনা হইয়াছি।...সে বালিকাকে বিবাহ কর—এই দণ্ডে। তোমার তা কর্ত্তব্য। অভয় মিত্র।"

পুত্রের এই রোগ—পিতার পণ তবু এর মধ্যেও সেই মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে!...দীপ্তি নিশ্বাস ফেলিল। টেলি-গ্রামটা তার হাতেই রহিয়া গেল।

পিয়ন বলিল,—সহি, মা-জী।

—হ্যাঁ! বলিয়া দীপ্তি উঠিয়া সহি করিয়া দিল। পিয়ন চলিয়া গেল।

তারপর রোগীর ঘরে আবার সেই একা জাগিয়া বসিয়া থাকা! আর অরুণ...? ঐ হাত মুঠি করিল, ঐ কি বকিতেছে

…মাগো !…বাহিরে দূরে কোথায় একটা কুকুর ডাকিতেছিল। …সে স্বরে নিমেষের জন্য শিহরিয়া দীপ্তি নিস্পন্দ দৃষ্টিতে কাঠ হইয়া অরুণের পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

অরুণ ডাকিল,—দীপ্তি…

দীপ্তি চাহিল। অরুণ কোনমতে তার হাতখানা ছড়াইয়া দিল। দীপ্তি সে হাত নিজের হাতে তুলিয়া লইল।

অরুণ আবার ডাকিল— দীপ্তি…

তার চোখের দৃষ্টি…এ যেন সে চোখ নয়—যে-চোখের দৃষ্টিতে দীপ্তি সেই প্রথম দিনই চকিত, বিস্মিত, মোহিত হইয়াছিল !…

দীপ্তি কহিল,—কি বলচো গো ? বল…বল…

অরুণ হতাশ দৃষ্টিতে দীপ্তির পানে চাহিয়া কহিল,—আমি কি বাঁচবো না দীপ্তি ? তার দুই চোখের কোলে জলের দুটো বড় ফোঁটা !

অরুণের চোখে জল ! দীপ্তির চোখেও জলের ঝর্ণা খুলিয়া গেল। অরুণের পানে অপলক নেত্রে চাহিয়া দীপ্তি ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

অরুণ কহিল,— ডাক্তারকে বল দীপ্তি,আমায় সারিয়ে দিতে—

দীপ্তি কহিল,—বাবা আসছেন…

—বাবা !…অরুণের অধরে হাসির একটা মৃদু রেখা ফুটিল, নিমেষের জন্য !

দীপ্তি কহিল,—তোমার বাবা। তাঁকে আমি টেলিগ্রাম

করেছিলুম, তোমার অসুখ বলে। তিনি তার জবাব দিয়েছেন। তিনি আসছেন। রওনা হয়েছেন!

—তাহলে মার্জ্জনা…! অরুণের চোখের কোণে আরও দু'ফোঁটা জল ঠেলিয়া আসিল। তার পরে সে কহিল,—আর কিছু লিখেছেন?

দীপ্তি কহিল,—হ্যাঁ…

—কি, দীপ্তি?

—আমায় বিয়ে করতে বলেছেন…! বল, তাঁর কথা রাখবে কি? কোন সঙ্কোচ করো না,…বল…

এ অভিমান,—না…?

অরুণ দীপ্তির পানে চাহিল। দীপ্তি উচ্ছ্বাসে আবেগে কহিল,—না, না, ওগো, তুমি সেরে উঠবে! এ মেঘ ক্ষণিকের, এ কেটে যাবে। আবার আমাদের জীবনে সূর্য্যের আলো ফুটবে গো! আমার মন বলছে, তুমি সেরে উঠবে।…কিন্তু যাই হোক, আমার জন্ত তুমি ভেবো না।…না, না, কোন ভাবনা নয়! তুমি শুধু সেরে ওঠো…আমরা যে ব্রত নিয়েছি, তা যে আমাদের পালন করতেই হবে!—এ প্রকৃতির ভ্রূকুটি…ভয় দেখাচ্ছে শুধু…ওগো, আমার প্রিয়, বন্ধু আমার, স্বামী আমার…

অরুণের ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল।…

দীপ্তি কহিল,—তোমার এই প্রেম, এ নিষ্ঠা…ওগো, এ যে আমার মনকে ক্ষণে ক্ষণে টলিয়ে তুলছে।…আমার

গুরু, আমার সব···যদি এই হয় যে, তোমায় বিয়ে করলে তুমি বেঁচে ওঠো, ওগো, তোমার প্রাণের জন্য আমি তা করতে প্রস্তুত আছি, আজ, এখনি !...ব্রত...? কি হবে—তা ? তোমায় হারালে আমি যে সব হারাবো !...ওগো, তুমি সেরে ওঠো। ক'দিন আমি কেবলি ভাবছি...তোমায় ছেড়ে আমার বেঁচে থাকার কথা আমি কল্পনাও করতে পারি না···

সন্ধ্যার ঠিক পরক্ষণেই এক্সপ্রেস ট্রেণ আসিয়া ষ্টেশনে থামিল। খোলা জানলা দিয়া ষ্টেশন দেখা যায়। ঐ বাঁশীর আওয়াজ··· ট্রেণ আবার ছাড়িয়া দিল।...তার পর পথে ঐ যে আলোর রশ্মি ···রশ্মি সচল ··এইদিকেই অগ্রসর হইতেছে !...তবে...তবে ?

দীপ্তি ডাকিল,—দোয়ারকা···

—মা—বলিয়া দোয়ারকা ঘরে ঢুকিল।

দীপ্তি বলিল—বাবুর বাবা আসছেন বুঝি। তুই যা—দৌড়ে ষ্টেশনে যা—তাঁকে বাড়ী চিনিয়ে নিয়ে আয়—

দোয়ারকা একটা লণ্ঠন লইয়া ষ্টেশনের দিকে ছুটিল।

এখন...এ যে এক প্রচণ্ড মুহূর্ত্ত ! হয়তো কত রোষ, কত হুঙ্কারের মাঝে পড়িতে হইবে···হয় তো বা মার্জ্জনার স্নিগ্ধ পরশ !···যাই হোক, অরুণকে বাঁচাইয়া তোলা চাই ! বাঁচিবে বৈ কি ! নহিলে উনিই বা ঠিক-সময়টিতে আসিবেন কেন ! রাগ করিয়া গৃহেই তো বসিয়া থাকিতে পারিতেন !... সান্ত্বনায় আশ্বাসে দীপ্তির মন ভরিয়া উঠিল।···কিন্তু ও কি...অরুণ চীৎকার করিয়া উঠিল—দীপ্তি...উঃ—যাই যে...

দীপ্তির বুক কাঁপিয়া উঠিল। সে আসিয়া তাড়াতাড়ি অরুণের পাশে বসিল। অরুণ দুই হাত উঁচু করিয়া তুলিল, পরমুহূর্ত্তে সজোরে সে উঠিয়া বসিতে গেল।—দীপ্তি আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—কি করচো গো, কি করচো ও? উঠো না…

দুই চোখ পাকাইয়া কি-সে দৃষ্টিতে যে অরুণ দীপ্তির পানে চাহিল!…তার পর দুই করতল মুষ্টিবদ্ধ করিল, যেন বাতাসের সঙ্গে সংগ্রাম করিবে…

দীপ্তি তাড়াতাড়ি তাকে ধরিয়া ফেলিল। অরুণ চীৎকার করিয়া উঠিল,—ছাড়ো।…বাবা, আমার বাবা…না বাবা, রাগ করো না, বাবা…বলিয়া একেবারে ঢলিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে অমনি সব নিথর! অরুণের শিথিল দেহ দীপ্তির গায়ে হেলিয়া পড়িল!…

দীপ্তি ধীরে ধীরে তাকে শোয়াইয়া দিল; কিন্তু এ কি… নিশ্বাস? অরুণের দেহ যে নিথর নিস্পন্দ! প্রাণ-বায়ুটুকু দীপ্তির বুকে থাকিতে থাকিতেই মুক্ত বাতাসে মিশিয়া গিয়াছে। দীপ্তি পাথরের মূর্ত্তির মত স্তম্ভিত, বিমূঢ় বসিয়া রহিল…!

সেই মুহূর্ত্তে অভয় মিত্র আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন; ডাকিলেন, —অরুণ…

কে সাড়া দিবে!

অভয় মিত্র আসিয়া অরুণের পানে চাহিলেন! তাঁর দুই চোখ যেন পুতুলের চিত্র-করা চোখের মতই! তার পর তিনি

অরুণের কপালে হাত দিলেন,—পরে শিহরিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন,—সব শেষ...!

অভয় মিত্র নিশ্চল দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁর চোখের কোলে জল ঠেলিয়া আসিল। তাঁর অরুণ, বড় আদরের পুত্র···! তিনি মনের বেদনা প্রাণপণ-বলে রুখিয়া দীপ্তির পানে চাহিলেন। দীপ্তি তখন একেবারে স্পন্দন-রহিত,···ঠিক যেন কাঠের পুতুল!

অভয় মিত্র কহিলেন,—আমার টেলিগ্রাম পেয়েছিলে?

দীপ্তি ফিরিয়া চাহিল, এবং ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

অভয় মিত্র কহিলেন,—আমার টেলিগ্রাম-মত কাজ হয়েছিল?

দীপ্তি ভীতি-বিহ্বল দৃষ্টিতে তাঁর পানে চাহিল।

অভয় মিত্র কহিলেন,—তোমায় বিবাহ করেছিল, অরুণ?

সহজ অথচ তীব্র স্বরেই দীপ্তি কহিল,—না।

অভয় মিত্র আশ্চর্য্য হইলেন; কহিলেন,—না!···তুমি তাকে টেলিগ্রামের কথা বলেছিলে?

দীপ্তি মাথা নামাইয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল,—বলেছিলুম।

অভয় মিত্র স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। মৃত্যু-স্থির ঘরে মরণের কি স্তব্ধ-হিম নীরবতা!

দীপ্তি কহিল,—তাঁর মতটাকেই তিনি সব-চেয়ে শ্রদ্ধা করতেন!

অভয় মিত্র দীপ্তির পানে চাহিলেন, কহিলেন—হুঁ!···তাহলে আমারো আর কোন কর্ত্তব্য নেই!···এ সময়ে রূঢ় হওয়া উচিত

নয়, তবু আমি নিরুপায় হয়েই বলছি— নারী, তুমিই তাকে কাল-সর্পের মুখে টেনে এনেছ !' এর প্রাণের জন্য তুমিই দায়ী ···নাহলে আমার ছেলে বেঘোরে এক জীর্ণ ঘরে এভাবে আজ বিনা-চিকিৎসায় মারা যেত না !...যাক, যা হয়ে গেছে, তার আর চারা নেই ! মৃত্যুকে কেউ রোধ করতে পারে না ! কিন্তু যাবার সময় অরুণ এই যে দাগা দিয়ে গেল...এর কারণ, শুধু তুমি,···তোমার এই অদ্ভুত খেয়াল !···তবু আমি মার্জ্জনা করতুম ···তোমায় আর আমার অরুণের সন্তানকে যোগ্য মর্য্যাদায় আমার ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতুম ! কিন্তু তার পথও তুমি রাখো নি !···আমার গৃহে তোমাদের স্থান নেই···তোমার না, তোমার পেটে অরুণের যে দুর্ভাগা সন্তান আসছে, তারও না···

অভয় মিত্র স্তব্ধ হইলেন ; পরে কহিলেন,—মা-বাপের স্নেহ ছিঁড়ে তাঁদের আদরের সন্তানকে বিদ্রোহ-মত্ত করে টেনে আনায় তাঁদের প্রাণে কতখানি ব্যথা বাজে—আজ খেয়ালের ঘোরে তা বোঝোনি বোধ হয়, বুঝবেও না !···কিন্তু একদিন বুঝবে, হয়তো... ! তবে দুঃখ এই রইলো যে, আমায় পাষাণ নির্ম্মম বলে জেনে রাখলে !...এ বুকে স্নেহ কতখানি, তা জানতেও পারলে না !···তোমাদের ও মতের পায়ে তোমরা যেমন দুনিয়াকে বলি দিতে পারো, আমারো তেমনি একটা মত আছে, জেনো। সে মতের পায়ে অরুণকে নয় বলিই দিলুম...

অভয় মিত্র একটা নিশ্বাস ফেলিলেন ; তার পরে ধীরে ধীরে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন।

জল-ভরা চোখে দীপ্তি তাঁর পানে চাহিল, কহিল,—চলে যাচ্ছেন ?

অভয় মিত্র কহিলেন,—হ্যাঁ। আমার কর্ত্তব্য তোমরা তো অনেকদিনই শেষ করে দিয়েছো !...আমার ছেলে অরুণ... আমার কাছে তো তার মৃত্যু আজ ঘটলো না ! সে যে অনেকদিন ঘটে গেছে ! অরুণকে তো আমি বহুদিন পূর্ব্বেই হারিয়েছি...চির-জীবনের মত !...

অভয় মিত্র একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ধীর পায়ে চলিয়া গেলেন। দীপ্তি কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কি যে হইয়া গিয়াছে, আর তার পরও কি যে হইবে,—সেদিকে তার কোন হুঁশ্ও ছিল না ! হুঁশ্ পরে হইল—যখন বহুক্ষণ নিশ্চল দাঁড়াইয়া থাকিবার পর বিছানার দিকে তার দৃষ্টি পড়িল, ঐ শয্যা, ঐ··উঃ ! এত বড় বিপদ মাথায় পড়িয়া তাকে পিষিয়া চূর্ণ করিয়া দিলেও এখনো সে খাড়া দাঁড়াইয়া আছে, এত কথা কহিয়াছে···আশ্চর্য্য !

তার সমস্ত মন এই নির্ম্মম ব্যাপার বুঝিয়া এক-নিমেষে তীব্র আঘাতে জ্বলিয়া কাতর হইয়া পড়িল। বন্ধু, বন্ধু, সাথী আমার—বলিয়া সে অরুণের নিস্পন্দ দেহ জড়াইয়া ধরিয়া আর্ত্ত-ক্রন্দনে ফাটিয়া একেবারে লুটাইয়া পড়িল।

— ১০

বিধবা নারী···গর্ভে অসহায় শিশু!...এত-বড় নিরুপায় দুর্ভাগ্য মানুষের না কি নিত্য ঘটে না, তাই এ দুর্ভাগ্যে মানুষের অভিভূত হওয়ার আর সীমা-পরিসীমা থাকে না!...যে-অতিথির আবাহন-গান দুইটী হৃদয়ের তারে এক-সুরে উছলিয়া উঠিত, তারি আলোচনায় দুটী হৃদয় কি সে বিভোর হইত···কিন্তু হায়, আজ সে শিশু যখন পৃথিবীর বুকে প্রথম চরণ পাত করিবে, তখন ...সেই সব কথার স্মৃতি একটুও আনন্দ দিবে না, শুধু বেদনার ঘায়েই জর্জ্জরিত করিয়া তুলিবে! দীপ্তির দুর্ভাগ্য যে তার চেয়েও বেশী! এই অসহায় শিশুকে লইয়া জগতে সে একা... বিপদ এখানে কত!...এ বিপদের কথা আগে কোনদিন মনেও হয় নাই...আশার পরম আনন্দে সুখের নীড় বাঁধিয়া সে নিশ্চিন্ত আরামে বাস করিতেছিল—অলক্ষ্যে হঠাৎ কোথা হইতে সে নীড়ে গৃধ্রের মত মরণ আসিয়া তা আজ তচ্‌নচ করিয়া দিল! ...এ যাতনা কি সহ্য হয়!...কি আশ্বাসে, কি সান্ত্বনায় মানুষ ইহাকে ঠেকাইয়া রাখিবে!···

তবু তার এতখানি কাতর হইলেও তো চলিবে না!...অরুণ আজ পাশে নাই যে, তার পরামর্শ লইবে!···আদর-সোহাগ, সে তো গল্পের কথা! কিন্তু নানা ব্যাপারে কত সাহায্য চাই যে! জীবনের পথে অরুণের সঙ্গে দাঁড়াইয়া ওদিককার কথা মনেও

পড়ে নাই! আজ অরুণ পাশে নাই, সব মনে পড়িতেছে! আশ-পাশের লোকগুলার সমবেদনা-ভরা কৌতূহলের দৃষ্টিও মাঝে মাঝে কাঁটার মত গায়ে ফোটে!...তবু উপায় যখন নাই, তখন কুণ্ঠা ছাড়িয়া ভয় ছাড়িয়া তাকে এ পথে চলিতেই হইবে!...মৃত্যু?...কিন্তু তা হইলে সবই তো শেষ হইয়া গেল! যে ব্রত সে মাথায় তুলিয়া লইয়াছে, সে ব্রত পালন করিতে সমাজের সকলের ভ্রূকুটি-ঝঞ্ঝা সে যে অবহেলায় কাটাইয়া দিবে বলিয়া পণ করিয়াছে! মৃত্যুর কোলে ধরা দিলে তার কি হইবে!...বেদনা তীব্র বাজিয়াছে, সত্য,—এ বেদনা তো আরো অনেকের প্রাণেও বাজে! তাদের মত আত্মহারা হইয়া জীবনটাকে শেষ করিয়া দিলে, তার যা বৈশিষ্ট্য, সেটাকেও যে গলা টিপিয়া মারিতে হয়! না, সে দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না! তাকে এ বেদনা সহিয়া মাথা উঁচু করিয়াই দাঁড়াইতে হইবে!...যে নবীন অতিথি আসিতেছে, তাকেই শুধু সহায় করিয়া সাথী করিয়া এ ব্রত পালন করা চাই। জীবনের এত-বড় লক্ষ্য হইতে সরিয়া পড়া ঠিক হইবে না!...

কাজেই প্রতীক্ষা করা ছাড়া উপায় নাই! এই শিশুর পথ চাহিয়া একা বিজনে বসিয়া অধীর প্রতীক্ষা!...অরুণের পুত্র...তারো পুত্র! তাকেই তাদের প্রাণের মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া জীবনের পথে চালিত করিতে হইবে!...

দীপ্তি ঘর গুছাইতেছিল। অরুণের কাগজ-পত্র, বই, ব্রীফ...

ইতস্ততঃ ছড়ানো রহিয়াছে! কাগজের পাশে পেন্সিলটি অবধি... অরুণ কি লিখিয়া এমনি ফেলিয়া রাখিয়া ছিল! সেটি ঠিক তেমনি আছে! স্থির হইয়া দীপ্তি পেন্সিলটার পানে চাহিয়া রহিল। একটা কাতর দীর্ঘ-নিশ্বাস বুক ফাটিয়া বাহিব হইয়া বাতাসে মিলাইয়া গেল!...

এটা কি?

...উইল! খেলাচ্ছলে অরুণ একদিন বলিয়াছিল বটে, যে, একটা উইল লিখিয়া রাখিলাম দীপ্তি!...মানুষের প্রাণ... বলা তো যায় না!...হায়, সে পরিহাস এমন কঠিন তীব্র হইয়া বাজিবে, এত শীঘ্র...এ যে কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই! অরুণ নয়...সে-ও না!...দীপ্তি কাগজখানা তুলিয়া লইল। এ উইলে অরুণের নিজের উপার্জ্জিত টাকা-কড়ি সব সে 'তার বন্ধু', 'তার সাথী' দীপ্তিকে দিয়া গিয়াছে।

দীপ্তির দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। অরুণেব সুগভীর প্রেম, তীব্র ভালবাসা,...নিজের সব ফেলিয়া এই ত্যাগে-উজ্জ্বল প্রাণের প্রীতি...

দীপ্তি নিশ্বাস ফেলিল...বিশ্বে এ প্রীতি-ভালবাসার কি আর তুলনা আছে!—অন্তিম শয্যায় শুইয়াও দীপ্তির মতকেই শিরোধার্য্য করিয়া কতখানি ত্যাগ যে সে মাথায় বহিয়া গিয়াছে! দীপ্তি ভাবিল, তোমার এই স্বার্থহীন বিপুল প্রেমের একটুও যদি পরিশোধ করিতে পারি, বন্ধু...! আমায় লইয়া তৃপ্তি কি পাইয়াছ...সত্যই? আমার এই দেহ-মন সুধায় ভরিয়া তোমার

মুখে ধরিয়াছি...সে কি তোমায় প্রীতি দিয়াছে? বল, বল,···বন্ধু আমার, সেই সুদূর লোক হইতে বাতাসের মৃদু নিশ্বাসে, ফুলের এই উচ্ছ্বসিত গন্ধে, আকাশে-ওড়া পাখীর ঐ সুরের একটুখানি রেশে···

টাকার কথা তার মনেও রহিল না।···উইলখানা সে ছিঁড়িয়া ফেলিল—কি এ নির্ম্মম পরিহাস···!

কিন্তু এখন সে কি করিবে? এখানেই থাকিবে, না, কলিকাতায় চলিয়া যাইবে! তার সেই চাকরি...

এ অবস্থায় কলিকাতায় গিয়া চাকরি করা সম্ভব নয়—শরীর এই, মনও ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে! তার চেয়ে এখানে, অরুণের সহস্র-স্মৃতি-ঘেরা এই বিজন ঘরে,...এ তার স্বর্গ! আদর-প্রীতি, হাসির রেশ এখনো যে এ ঘরে পুঞ্জিত আছে!...আর যে আসিতেছে, এই নবীন অতিথি, অসহায় শিশু...তাকে এই ঘরেই আবাহন করা চাই...অরুণের গায়ের পরশ এখনো এ ঘর হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই···তারি তপ্ত পরশের মাঝে এই শিশু, আমাদের যুগল মনের প্রীতির ফল, এই প্রেমের কুঞ্জে আসিয়াই তোমার প্রথম চরণ-পাত কর...

এমনি চিন্তায় দীপ্তি যখন কাতর, তখন পশুপতি চক্রবর্ত্তীর এক চিঠি আসিয়া উপস্থিত হইল। তার এই নিঃসঙ্গ বেদনায় তিনি সমবেদনা জানাইয়াছেন; এবং সেই সঙ্গে এ কথাও বলিয়াছেন যে, তার জন্য সমাজে তাঁর মাথা হেঁট হইলেও তার প্রতি পিতার প্রাণে স্নেহ এখনো সঞ্চিত আছে। নিজের

অবাধ্যতা ও একগুঁয়েমির জন্য যে ভ্রান্ত পথে সে পা দিয়াছে, পশুপতি চক্রবর্ত্তী তার জন্য দীপ্তিকে অনুতাপ করিবার পরামর্শ দিয়াছেন এবং তাকে পয়সা-কড়ি দিয়া সাহায্য করিতেও তিনি প্রস্তুত আছেন!···তবে তাঁর ঘরে ফিরিয়া আসা···! দীপ্তিকে তিনি নিজের ঘরে তার পুণ্যহৃদয়া ভগ্নীদের পাশে আর ডাকিয়া আনিতে পারিবেন না, সেজন্য তিনি যে খুবই দুঃখিত, ব্যথিত চিত্তে বার বার তাহাও তিনি জানাইয়াছেন।···একটা নিশ্বাস ফেলিয়া দীপ্তি ভাবিল, কাহারো দয়া, কাহারো সাহায্য সে চায় না! যদি রিক্ত সর্ব্বহারাই তাকে হইতে হইয়াছে তো এই দশাকেই কায়-মনে মানিয়া সে জীবন-পথে এ যাত্রা সম্পূর্ণ করিবে! পথের মাঝখানে যদি সব চুকিয়া যায় তো তাহাতেও ক্ষোভ নাই!...

একা এই নির্জ্জন গিরি-বনের কোলেই দীপ্তি পড়িয়া রহিল। ডাক্তার বাবুটি খুব ভদ্র। তিনি প্রায় দেখিতে আসিতেন, এবং যথাসময়ে তাঁকে যেন খপর দেওয়া হয়, এ কথা তিনি যখনই আসিতেন, তখনই জানাইয়া দিতেন!...বন্ধু-বর্জ্জিত দূর বিদেশে একাকিনী তরুণীর এ অসহায়তা যে কত নিদারুণ, তাহা তিনি বুঝিতেন। বুঝিয়া তিনি আরো বলিতেন, তাঁর স্ত্রী বা মেয়েরা যদি এখানে কেহ থাকিত, তাহা হইলে দীপ্তিকে তিনি নিজের গৃহেই লইয়া যাইতে পারিতেন।···তা যখন কেহ নাই, তখন বাধ্য হইয়াই দীপ্তিকে একা থাকিতে হইবে! তবু···

···এই নিঃসঙ্গতার মাঝে সময়টুকু অত্যন্ত ভারী হইয়া

দীপ্তির বুকে যেন চাপিয়া বসিত। আর সে চাপে তার বুকের সমস্ত অস্থি-পঞ্জরগুলা যখন ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইবার মত হয়, অসহ্য ব্যাকুলতায় মন তখন ছুটিয়া বাহির হইয়া যাইতে চায়, সেখানে...যেখানে চিতার আগুনে অরুণের নিষ্পাপ দেহ চাপাইয়া পুড়াইয়া ছাই করিয়া তাকে বাতাসে উড়াইয়া দিয়াছে!

একটু দূরে পাহাড়ের গায়ে শ্যাম বনানী স্তব্ধ দাঁড়াইয়া...এইখানটীতে তারা দুজনে কতদিন বেড়াইতে আসিয়াছে! এইখানে বসিয়া ভবিষ্যৎ সুখের কত রঙীন ছবিই যে দুজনে আঁকিত···! জায়গাটা আলোর-উচ্ছ্বাসে হাসির রাশিতে যেন ভরিয়া ছিল! ·· আর আজ...? শ্মশান! শ্মশান সে!...

শেষে এমন হইল যে দীপ্তির পক্ষে চলাফেরা করিতেও অত্যন্ত কষ্ট হয়। উঠিয়া অল্প হাঁটিতেই পায়ে ভার চাপিয়া ধরে। সে হাঁপাইয়া পড়ে! তখন সে জানলার ধারে বসিয়া চারিদিককার মুক্ত প্রান্তরের পানে চাহিয়া থাকে! মনে হয়, ঐ প্রসারিত প্রান্তর নীরব চোখে তার এই মর্ম্মভেদী বিচ্ছেদে কাতর সহানুভূতি জানাইতেছে···তার মস্ত বুক চিরিয়া করুণ সমবেদনাও যেন ঐ উত্থিত হইতেছে!···

ক্রমে সে-দিন আসিল···যেদিন তার মর্ম্মের সমস্ত বন্ধন যাতনায় ছিঁড়িয়া যাইবার মত হইল। দোয়ারকা গিয়া ডাক্তার বাবুকে ডাকিয়া আনিল। ডাক্তার বাবুর সেবায় দীপ্তি ফুলের মত একটি কন্যা প্রসব করিল। মুখে তার অরুণের মুখখানিই ছোট করিয়া কে যেন বসাইয়া রাখিয়াছে···তেমনি হাসি-ভরা টানা

চোখ, কালির রেখায় আঁকা-বঙ্কিম ভ্রূ,···আর গায়ের রং দীপ্তির রঙের মতই গোলাপী আভায় ভরপুর!...ছোট্ট শিশু, আহা, নিতান্ত অসহায়...!

দীপ্তি শিশুকে আবেগে বুকে জড়াইয়া ধরিল, একটা দীর্ঘনিশ্বাস তার বুক ঠেলিয়া বাহির হইল। এ যে তাদের দুজনের নিবিড় প্রীতির মধুব মূর্ত্তি! তাকে দেখিয়া দীপ্তির কি আনন্দ!···কিন্তু এ আনন্দের তুল্য অংশ গ্রহণ করিতে দীপ্তির আনন্দ শতগুণ বাড়াইয়া তুলিতে অরুণ আজ কোথায়! বাহিরে গাছের পাতা দুলাইয়া বাতাস দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। চোখের জলে ভাসিয়া দীপ্তি শিশুর মুখে চুম্বন কবিল। দুঃখের মাঝে, কি দুর্দ্দিনেই তুমি আজ আসিলে, ধন!···দীপ্তি মেয়ের নাম রাখিল, সান্ত্বনা!...

— ১১ —

তারপর আবার সেই কলিকাতা—সেই চির-পরিচিত আশ্রয়-নীড়···! কিন্তু তা এমন কঠিন রূঢ় মুর্ত্তি ধরিয়া আছে যে তার সে ভ্রূ-ভঙ্গী তীক্ষ্ণ কাঁটার মতই দীপ্তির বুকে বাজিল!...বালিগঞ্জের সেই ক্ষুদ্র আশ্রয়টুকুও মিলিল না আজ! পল্লীর সকলে মিলিয়া কালো কুৎসা-মাখানো প্রচণ্ড নিষেধ তুলিয়া তাকে রুখিয়া দাঁড়াইল। এ পাড়ায় তার স্থান হইবে না! সকলে সমস্বরে

বলিয়া বসিল, দীপ্তির রীত-চরিত্র তারা ভালো করিয়াই জানিয়াছে! দীপ্তি যে ঐ শান্ত মূর্ত্তির মাঝে কি চরিত্র লুকাইয়া রাখিয়াছে, তা'ও কারো অবিদিত নাই! সুতরাং তাদের এই শান্ত পুণ্যস্নিগ্ধ পল্লীর মাঝে দীপ্তিকে স্থান দিয়া তারা কখনোই এত-বড় দুর্নীতির প্রশ্রয় দিতে পারিবে না, এবং তা দিবেও না!···

বিপুল বলে উদ্যত অশ্রু রোধ করিয়া দীপ্তি গাড়োয়ানকে গাড়ী ফিরাইতে বলিল। কিন্তু এখন কোথায় যায়? এই অসহায় ক্ষুদ্র শিশুকে বুকে করিয়া কার দ্বারে গিয়া উঠিবে সে!···

দীপ্তি শেষে নিরুপায় হইয়া স্কুলের দিকে গাড়ী চালাইতে বলিল।···

মেয়েরা তখন স্কুলে আসিয়াছে। তাদের কল-কল্লোলে স্কুলের বুকে কি ও হর্ষ ফুটিয়াছে! স্কুলের ফটকে গাড়ী থামিলে দীপ্তি শিহরিয়া উঠিল। তার বুকে এই মেয়ে!···এখনি সকলে প্রশ্ন তুলিবে, কে এ?···দীপ্তি ত' তা ইহাদের কাছে কোন কথাই বলিয়া যায় নাই! আজ হঠাৎ এই শিশুকে বুকে ধরিয়া ইহাদের মাঝে আসিয়া উদয় হইলে, এখানেও না জানি, কি কুৎসার সৃষ্টি হইবে!...তবু মন বলিল, এ কুৎসার কথা অরুণ তো পূর্ব্বেই তুলিয়াছিল। আর সে তখন বড় গলায় জবাব দিয়াছিল, এ সব কুৎসাকে কোন দিনই গ্রাহ্য করে না সে!···আজ একটু আগে পল্লীর মুখে ঐ সব কুৎসার

কথা শুনিয়া তার বুক কিন্তু কাঁপিয়া কিরূপ মুর্চ্ছিতের মত হইয়া পড়িয়াছিল!...এখানেও তেমনি বেদনার মাঝে পড়িতে হয় যদি!...

এখানেও আশ্রয় মিলিল না!...স্কুলের কর্ত্রী বলিলেন, দীপ্তি চলিয়া গেলে তিনি সব কথাই শুনিয়াছেন। দীপ্তির জীবনে যে মস্ত একটা রোমান্স না অ্যাডভেঞ্চার কি ঘটিয়া গিয়াছে, এ কথা স্কুলেও কাহারো অবিদিত নাই!...তবে এ দুর্ঘটনায় তাঁর সহানুভূতি থাকিলেও দীপ্তিকে স্কুলের পুরানো চাকরিতে বহাল করিয়া সে সহানুভূতি দেখাইবার দুঃসাহস তাঁর নাই! কারণ পাঁচ জন গৃহস্থ ভদ্রলোক মেয়েদের স্কুলে পাঠান শুধু যে লেখাপড়া শিখাইবার জন্যই, তা নয়। এখানকার নৈতিক আব-হাওয়াটাও তাঁরা পরিচ্ছন্ন দেখিতে চান...একেবারে বিশুদ্ধ রকমের!...তাকে লইয়া পাঁচটা আলোচনা হইয়া যাওয়ার পর তাকে আবার শিক্ষয়িত্রীর আসন দেওয়া... তার মানে, স্কুলটিও একেবারে ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইবে। কারণ কেহই এখানে অতঃপর মেয়ে পাঠাইবে না!...

দীপ্তির চোখে জল আসিল। হায়, তাকে ইহারা এমন অতলে নামাইয়া দিয়াছে যে সেখান হইতে উঠিবার সম্ভাবনাও নাই, আজ!...এ সব কথা, এ কথার মানে? সে কি করিয়াছে? কিছু না!...তার অভিমান হইল। সে তো শ্রেষ্ঠ সতী সাধ্বী কোনো নারীর চেয়ে এক তিল নীচে নয়! বিবাহই সে করে নাই! কিন্তু বিবাহের অর্থ যদি এই হয় প্রাণে-

প্রাণে সুগভীর অনুরাগ তো সে অনুরাগের চূড়ান্তই যে তার প্রাণে ফুটিয়াছিল! অরুণকে ভালবাসা, তার রোগে সেবা-শুশ্রূষা, তার স্মৃতি বুকে ধরিয়া অহর্নিশি এই প্রবল সংগ্রাম ...কোন্ সতী এর বাড়া কি করিয়াছে!...

দীপ্তি সবলে অশ্রু রুখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। স্কুলের কর্ত্রী কহিলেন,—ওটী মেয়ে বুঝি?

দীপ্তি কহিল,—হ্যাঁ।

কর্ত্রী কহিলেন,—আহা!

সেই আহা! দীপ্তির বুক যেন ফাটিয়া গেল! কৃপার পাত্রী কাঙালিনী হইয়া সে তো এখানে থাকিতে আসে নাই! তবে...কেন এ আহা! কেন ঐ করুণ নয়নে তার পানে চাওয়া গো!...জীবন-পথে কাহারো কৃপা সে চাহে নাই কোনদিন, কৃপা সে চায়ও না!...মেয়ের পানে প্রাণ-ভরা দৃষ্টিতে চাহিয়া সে তার মুখে চুম্বন করিল—বাছা আমার, বড় দুঃখের সান্ত্বনা আমার!...

তারপর সহসা দীপ্তি কোন কথা না বলিয়া বিদ্যুতের মতই ত্বরিতে স্কুল হইতে বাহির হইয়া গেল।...এখানে কাজ করিয়া সে জীবিকার সংস্থান করিবে, ভাবিয়াছিল! হায় রে!

স্কুল হইতে ফিরিয়া সে সমস্যায় পড়িল। মেয়েটীকে এখন মানুষ করিবে কি করিয়া! এখানে যত বড় কাজই করিতে ছোটো, সবার আগে নিজেকে খাড়া রাখা চাই তো!...আর সে খাড়া রাখিতে গেলে আগে চাই টাকা!...টাকা নহিলে এক পা এখানে চলিবার জো নাই!...

কিন্তু সেও পরের কথা।···এখন গাড়ীতে এমনি বসিয়াও তো দিন কাটানো চলে না!...একটা আশ্রয় চাই! তা হোক্ সে বন, হোক্ সে প্রান্তর···! আবার শুধু তাই? একটা ছাদ ও চারটা দেওয়ালের আড়ালে রচা চাই একটা আশ্রয়-নীড়...এ যে এই মুহূর্ত্তে চাই...নহিলে নয়!...

গাড়োয়ান কহিল,—কোথায় যাব, মা-জী?

দীপ্তি হতাশভাবে চারিধারে চাহিল। তারপরে গাড়োয়ানকে ডাকিয়া কহিল,—এমন কোন জায়গায় নিয়ে যেতে পারো, যেখানে ভাড়ার জন্য একখানা ছোট ঘর মেলে?...

গাড়োয়ান কহিল,—তা তো জানি না মা! তবে আমি থাকি মাণিকতলায়। সেখানে অমন ঘর মিলতে পারে!... কিন্তু ঘোড়া আমার ঘুরে ঘুরে হাঁপিয়ে উঠলো, মা...

দীপ্তি কহিল,—কোনমতে আমায় একটু আশ্রয়ে পৌঁছে দাও তুমি...বকশিস দেবো।

গাড়োয়ান তার গাড়ীতে এমন আরোহী কখনো তোলে নাই! সে একটু ভাবিয়া পরক্ষণেই মাণিকতলার দিকে গাড়ী চালাইয়া দিল।...

একটা ঘর মিলিল। মাণিকতলায় একটা বাগানের ফটকে লাল-কাঁকর ফেলা পথের পাশে ফ্লোরের উপর ছোট একখানি ঘর, দুধারে ছোট বারান্দা,—রান্না করিবার ছোট একটু জায়গাও আছে। বাগানের ভিতর-দিকে মস্ত বাড়ী, কোনো বিলাসী বাবুর আরাম-নিবাস। বাবু ক্বচিৎ আসেন! বাগানের মালী

এই ঘর দুখানি সুবিধা-মত ভাড়া দেয়। দীপ্তি কায়েমী-ভাবে থাকিবার বাসনা করায় মালী প্রথমে ইতস্ততঃ করিতেছিল, পাছে ধরা পড়িয়া যায়। কিন্তু দীপ্তি যখন বলিল, ঝামেলা কিছুমাত্র নাই! তার চাকর থাকিবে না, দাসীও না; সে শুধু এই ছোট শিশুটীকে লইয়া নিতান্ত নিভৃতে একা এখানে বাস করিবে, তখন মালী আর আপত্তি না তুলিয়া এক মাসের ভাড়া আগাম দশটী টাকা আদায় করিয়া ঘর খুলিয়া দিল। দীপ্তি নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। সকাল হইতে ঘোরার আর বিরাম ছিল না!

এখন ঘরে ঢুকিয়া প্রকাণ্ড সমস্যা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল, পেট চলিবে কি করিয়া! পুঁজি তো এমন বেশী নয়! যা আছে, তা ভাঙ্গিলে ফুরাইতে কতক্ষণ। তখন? স্কুলের চাকরি ফিরিয়া পাইবার কোন আশা নাই! তার মনের মতের সঙ্গে এইবার তো সংগ্রাম বাধিল! একদিকে সারা সমাজ দুর্গ-দ্বার রুদ্ধ করিয়া উপেক্ষার বাণ হানিতেছে, সরিয়া যাও, দূরে, আরো দূরে ...আমার সীমার কাছেও ঘেঁষিয়ো না!

আজ যদি অরুণ পাশে থাকিত! একা এ সংগ্রামে সে যে জর্জ্জর শ্রান্ত হইয়া পড়িবে, কেই বা তাকে উৎসাহের বাণী জোগাইবে, পাশে থাকিয়া শ্রান্তি ঘুচাইয়া দিবে? সান্ত্বনা! নেহাৎ কচি, এতটুকু মেয়ে!...

তবু ভাবিলে চলিবে না।...পাশে যখন কেহ নাই, কাহাকে পাইবারো আশা যখন নাই, তখন এই বিরুদ্ধ বিপক্ষ শক্তি

যত প্রচণ্ডই হোক, তার সঙ্গে প্রাণপণে সংগ্রাম করিয়া নিজেকে খাড়া রাখিতেই হইবে। অদৃশ্য অন্তরাল হইতে ভবিষ্যতের নারী-সমাজ তার এই সংগ্রামের ফলের উপর নিজের অদৃষ্ট লক্ষ্য করিতেছে!...তার এত-বড় বিশ্বাস...দীপ্তিকে তা পালন করিতেই হইবে!...

অনেক ভাবিয়া সে স্থির করিল, সে তো সেলাইয়ের কাজ জানে, গান-বাজনাতেও কিছু দখল আছে! ভাবনা কি!... কিস্তির সর্ত্তে সেলাইয়ের কল কিনিয়া সে ফ্রক-পেনি সেলাই করিলে অর্থ আসিবে, আর খপরের কগেজে বিজ্ঞাপন দিলে বহু পরিবারে গান-বাজনা শিখাইবার কাজও মিলিতে পারে!... তারপর বই লেখা!...নিজের মনে এ বিশ্বাস তার খুবই আছে, নূতন চিন্তার ফুলে গাঁথা বিচিত্র মালা সে উপহার দিতে পারিবে! আশায় আনন্দে প্রাণ তার ভরিয়া উঠিল! এত বড় পৃথিবী.. আশ্রয়ের জন্য আবার ভাবনা!...

এমনি করিয়া দীপ্তি এই শিশুর মুখ চাহিয়া জীবন-সংগ্রামে নামিল। ফ্রক পেনি সেলাই করিয়া কয়েকটা দোকানে নগদ দামে সে তাহা বিক্রয় করিত! তার হাতের কাজে বৈচিত্র্য ছিল, পারিপাট্য ছিল, অথচ দামেও শস্তা, কাজেই কয়েকটা দোকানের মালিক খুব আগ্রহেই দীপ্তির তৈরি জামা সেমিজ ফ্রক প্রভৃতি কিনিয়া লইত! খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়া দুই-চারিটা বড় ঘরে মেয়েদের গান-বাজনা শিখাইবার কাজও তার মিলিয়া গেল। তবে মুস্কিল বাধিল, এই যে সান্ত্বনাকে

একলা ফেলিয়া যাইতে হয়! বাধ্য হইয়া একটা দাসী রাখিতে হইল। সে বাহিরে গেলে দাসীই সান্ত্বনাকে দেখাশুনা করে।... তারপর রাত্রির নির্জ্জন অবসরে এক-একদিন দীপ্তি উপন্যাস লিখিতে বসিয়া যায়! সে এক বিচিত্র জগতের বিচিত্র কাহিনী··· তারি স্বপ্নের রঙে আগাগোড়া রঙানো!...তার মনের উপর দিয়া চিন্তার যে ঝড় বহিয়া চলিয়াছে, সে ঝড়ে কত ছবির টুকরাই ঝরিয়া পড়ে! দীপ্তি সেইগুলিকে কাগজের উপর সাজাইয়া গুছাইয়া ধরে...তার অঙ্কিত চরিত্রগুলি তারি প্রাণের রসে জীবন্ত হইয়া ওঠে!...ছয় মাস পরিশ্রম করিয়া সে উপন্যাস রচনা শেষ করিল। এখন প্রশ্ন, তার এ বই কিনিবে কে! তার তো বই ছাপিবার পয়সা নাই!···প্রকাশকের দ্বারে ফেরা... দীপ্তি কুণ্ঠিত হইল। তার বুকের রক্তে লেখা ছবি···কে ইহা গ্রহণ করিবে!—অনাদরে অবহেলায় যদি এর শির ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়ে। নৈরাশ্যের আশঙ্কায় দীপ্তির প্রাণ ঝন্‌ঝন্ করিয়া উঠিল!

তবু ঘরের কোণে জল্পনা লইয়া বসিয়া থাকিলেও চলে না! ···মনের কুণ্ঠা-সঙ্কোচ কাটাইয়া দীপ্তি একদিন লেখা খাতাখানি লইয়া বাহির হইয়া পড়িল।···বহু প্রকাশকের দ্বারে ঘুরিয়া নিরাশ হইয়া ভগ্ন প্রাণে বাড়ী ফিরিবে বলিয়া সে হেদুয়ার কোণে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে রিক্‌শ'র সন্ধানে, এমন সময় একখানা মোটর তাকে দেখিয়া পথে থামিয়া পড়িল। মোটর হইতে এক সুবেশ যুবা নামিয়া তার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

দীপ্তি বিস্ময়-ভরা দৃষ্টিতে তার পানে চাহিতেই সে কহিল—আপনি এখানে দাঁড়িয়ে!.....

দীপ্তি হাসিয়া কহিল,—বাড়ী যাবো ভাবছিলুম......

যুবা কহিল,—যদি আপত্তি না থাকে, আমার গাড়ীতে আসুন।...আপনার সঙ্গে আমার দরকারও আছে একটু।

দীপ্তি অবাক হইয়া গেল! তার কাছে দরকার! চিনিতে ভুল হয় নাই তো! সে যুবার পানে কুণ্ঠিত দৃষ্টিতে চাহিল।

যুবা বুঝিল, দীপ্তি দ্বিধা করিতেছে। সে বলিল,—আমি প্রভার দাদা...যে প্রভাকে আপনি গান শেখান!

—ওঃ! বলিয়া দীপ্তি আর আপত্তিমাত্র না করিয়া মোটরে উঠিল; যুবাও মোটরে উঠিয়া সোফারকে মাণিকতলার দিকে গাড়ী চালাইতে বলিল।

গাড়ী চলিলে দীপ্তি কহিল,—কি কথা আপনার, বলুন......

যুবা কহিল,—আমার নাম ক্ষিতীশ!...প্রভার কাছে শুনছিলুম, আপনি নাকি একখানি উপন্যাস লিখেছেন,...

দীপ্তি কহিল,—হ্যাঁ॥

ক্ষিতীশ কহিল,—আমি সম্প্রতি একটু পাব্লিশিং কাজ সুরু করছি...ক'জন নামজাদা লেখকের উপন্যাসও হাতে পেয়েছি,—সেই সঙ্গে আপনার বইখানিও ছাপতে চাই—অবশ্য যদি আপনার কোন আপত্তি না থাকে!—

আঁধারে আলো দেখিলে প্রাণ যেমন উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে,

দীপ্তি ঠিক তেমনি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল ; সে বলিল,—আপত্তি !···আমি এই নতুন লেখা সুরু করেছি—এই আমার প্রথম বই···এ ছাপানোয় ঝুঁকি কি কম !...আপনি নিজে স্বেচ্ছায় ছাপাতে চাইছেন, এ যে মস্ত লোভের কথা !···কিন্তু আপনার টাকাগুলোই হয়তো বাজে খরচ হয়ে যাবে !···

ক্ষিতীশ মৃদু হাসিয়া উত্তর দিল,—ব্যবসা করতে গেলে ঝুঁকি তো নিতেই হবে ! জানেন তো, কথাই আছে, No risk, no gain. কোন্ বই বাজারে কি-রকম বিকুবে, তা কেউ বলতে পারে না আগে থেকে ! বড় লেখকের লেখা বইও দেখা যায় তেমন বিকুচ্ছে না,...অথচ রামা-শামার বই ভীষণ রেটে বিক্রী হচ্ছে !···

দীপ্তি কহিল—সেই বই নিয়েই আজ বেরিয়েছিলুম। বড় বড় দোকানে ঘুরে এলুম। নতুন লোকের লেখা ছাপাতে কেউ ভরসা করলে না ! নিরাশ হয়ে ফিরছিলুম,···এমন সময় আপনি এলেন !···বই আমার কাছেই আছে !···

ক্ষিতীশ কহিল,—আমায় পড়তে দেন যদি একবার···

দীপ্তি কহিল,—নিশ্চয় পড়বেন। না পড়ে বুঝবেন কি করে ছাপাবার যোগ্যতা এর একটুও আছে কি না !

ক্ষিতীশ কহিল,—বেশ, আজ আমায় দেবেন,—রাত্রেই আমি পড়ে ফেলবো। কাল আপনাকে জানাতে পারবো,... আর বাকী কথাবার্ত্তা তখনি হবে'খন !

দীপ্তি কহিল,—রাত্রেই পড়ে উঠতে পারবেন !...হাতের

লেখাও অনেক জায়গায় জড়িয়ে আছে !…আমার তো তেমন তাড়া নেই—অবসর-মত পড়বেন'খন।

ক্ষিতীশ কহিল,—অবসর খুঁজলে তো ব্যবসা চলে না। আমার যে এই ব্যবসা !...কত রাবিশ যে ঘাঁটিতে হচ্ছে !… আপনার লেখা ত ভালো হবে বলেই আশা করা যায়। আমাদের দেশের শিক্ষিতা লেখিকারা নেহাৎ রাবিশ দেনও না, রাবিশের বোঝা যা দেয়, পুরুষ-লেখক। মনের কারবার নিয়েই তো উপন্যাস…আর এ মনের বিস্তার যদি কারো থাকে তো সে নারীরই আছে !…

ক্ষিতীশের কথা-বার্তায় তার প্রতি দীপ্তির একটু শ্রদ্ধাও জন্মিল। নারীর প্রতি তার এতখানি বিশ্বাস আর শ্রদ্ধা…এত-গুলা বহির দোকানে ঘুরিয়া সে তো কারো কাছে দরদের একটা কথাও শুনিতে পায় নাই ! বিপুল দম্ভে বুক ফুলাইয়া সব বসিয়া আছে...একজন লেখা আনিয়া ধরিতেছে, লেখাটা পড়িয়াই নয় ছ্যাখো—না, একেবারে গোড়া হইতেই সব সাব্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছে, নূতন লেখকের লেখা কি আর হইবে !...পুরানো লেখকের মামুলি কাসুন্দি ঘাঁটাও তাদের কাছে ঢের আদরের, লোভের সামগ্রী !…হারে দুনিয়া !

গাড়ী আসিয়া তার বাগানের সামনে পৌছিল। দীপ্তি বলিল—এইখানে আমি থাকি। ক্ষিতীশ গাড়ী থামাইল। দীপ্তি নামিল, কহিল,—আসবেন না ?

ক্ষিতীশ প্রসন্ন চিত্তে কহিল,—আসবো বৈ কি !…

উভয়ে নামিয়া ভিতরে আসিল। ছোট্ট গৃহ···তবু কি পরিচ্ছন্ন! চারিদিকে কি পারিপাট্য আর শৃঙ্খলা! ছোট দোলায় সান্ত্বনা ঘুমাইতেছে! ক্ষিতীশ কহিল,—এটি···?

দীপ্তি কহিল,—আমার মেয়ে!

তারপর নানা বিষয়ে কিছুক্ষণ নানা কথা-বার্ত্তা কহিয়া ক্ষিতীশ কহিল—আজ তাহলে উঠি। আপনার লেখাটা দিন—কাল সকালেই আমি আবার আস্‌ছি, কথা-বার্ত্তা কয়ে সব ব্যবস্থা ঠিক করে ফেলবার জন্য!···একসঙ্গে পাঁচ-সাতখানা বই প্রেসে দিতে চাই আমি।

খাতা লইয়া ক্ষিতীশ চলিয়া গেল। দীপ্তি দাঁড়াইয়া দেখিল। ক্ষিতীশের গাড়ী চলিয়া গেলে সে ফিরিয়া দাসীকে কহিল,—একে কখন খাইয়েছিস্ রে...? কালমেঘটা আর একবার দিয়েছিলি তো?···

দাসী জবাব দিল, দীপ্তির আদেশ সে যথারীতি পালন করিয়াছে। দীপ্তি কহিল,—তুই এখন যা। উনুনটা ধরিয়ে ফ্যাল্। উনুন যতক্ষণ না ধরে, আমি ততক্ষণ এই ফ্রকটা শেষ করে ফেলি···

দাসী উনুন ধরাইতে গেল। দীপ্তি আলোর সামনে সেলাই লইয়া বসিল।

— ১২ —

পরদিন। বেলা তখন আটটা। দীপ্তির দ্বারে ক্ষিতীশের মোটর আসিয়া দাঁড়াইল। দীপ্তি তখন সান্ত্বনার বালিশ কাঁথা-গুলা রৌদ্রে দিয়া, সাবান মাখাইয়া জামা কাচিতেছিল। ফ্লোরের কাছে সিঁড়ির নীচে আসিয়া ক্ষিতীশ কি বলিয়া কাকে ডাকিবে, তার কোন হদিশ না পাইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কতক্ষণ পরে দীপ্তি জামা কাচিয়া রৌদ্রে শুকাইতে দিতে আসিয়া দেখে, ক্ষিতীশ দাঁড়াইয়া আছে। সে কহিল,—আপনি !···কতক্ষণ এসেছেন ?···

ক্ষিতীশ দীপ্তির পানে চাহিল, কহিল,—এই আসচি···

—তা ওখানেই দাঁড়িয়ে আছেন যে ! আসুন···

দীপ্তির কাপড়-সেমিজ জলে ভিজিয়া গিয়াছিল, আঁচলটা কোমরে জড়ানো। আঁটা শরীরখানি প্রভাতের তরুণ অরুণ-আলোয় যৌবনের পরিপূর্ণ প্রভায় বিকশিত ! ক্ষিতীশ তাহা লক্ষ্য করিল, লক্ষ্য করিয়া সলজ্জভাবে মাথা নামাইল। দীপ্তি ডাকিল,—আসুন···

ক্ষিতীশ দীপ্তির আহ্বানে উপরে আসিল। দীপ্তি তাকে বসিতে বলিয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিতে গেল। ক্ষিতীশ ঘরখানার চারিধারে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। আসবাব-পত্র অল্পই, তবে সেগুলি পরিপাটী করিয়া সাজানো। দেওয়ালের

পাশে ছোট একটি টী-পয়। তার উপরে দোয়াত, কলম-দান, একখানি প্যাড, ছোট একখানি ফটো। ফটোখানি অরুণের। ফটোর ফ্রেমের মাথায় সদ্য-তোলা একটি রক্ত গোলাপ! খড়খড়ির গায়ে ঝালর দেওয়া সাদা পর্দা। চারিদিকেই গৃহ-স্বামিনীর সুরুচি ও পরিপাট্যের ছাপ! দীপ্তির প্রতি শ্রদ্ধায় ক্ষিতীশের মন এক-নিমেষে ভরিয়া উঠিল।

একটু পরেই দীপ্তি আসিল, আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ঘরে একখানি মাত্র চেয়ার ছিল।

ক্ষিতীশ তাড়াতাড়ি দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল,—আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন······

দীপ্তি কহিল,—তা হোক, আপনি বসুন...

ক্ষিতীশ কহিল,—সে কি হয়! আপনি দাঁড়িয়ে থাকবেন, আর আমি বসবো!

দীপ্তি হাসিয়া কহিল,—তাতে কি! চেয়ার আমার ঐ একখানিই মোটে আছে! আপনি অতিথি...

ক্ষিতীশ কহিল,—সে হোক্···আপনি এই চেয়ারে বসুন, আমি দাড়িয়ে থাকচি······

দীপ্তি কহিল,—কেন ব্যস্ত হচ্ছেন আপনি!···আচ্ছা, আমি মেঝেয় মাদুর পেতে নয় বসচি···

বলিয়াই একটা মাদুর টানিয়া মেঝেয় পাতিয়া তারি এক প্রান্তে দীপ্তি বসিয়া পড়িল, বসিয়া কহিল,—এই আমি বসছি... আপনি এখন বসুন তো......

ক্ষিতীশ কহিল,—আপনি মেঝেয়, আর আমি চেয়ারে...তা হয় না।

দীপ্তি হাসিয়া কহিল,—কিছু এসে যায় না তাতে!...এ তো অতি তুচ্ছ একটা ব্যাপার...এটায় অত মনোযোগ নাই বা দিলেন!

ক্ষিতীশ এই মহিলার কথার ভঙ্গিমায় এমন একটা তেজ লক্ষ্য করিল যে তার সঙ্গে তর্ক করিতে যাওয়া স্পর্দ্ধা, ইহা ভাবিয়া সে ক্ষান্ত হইল এবং চেয়ারে বসিয়া দীপ্তির লেখা খাতাখানি বাহির করিয়া কহিল,—তা হলে কাজের কথা পাড়া যাক্।

দীপ্তির বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। এইবার তার পরীক্ষা! সে মুখ তুলিয়া চকিতের জন্য ক্ষিতীশের পানে চাহিল, কহিল,—বলুন...

ক্ষিতীশ কহিল,—আপনার উপন্যাস কালই আমি পড়ে শেষ করেছি, রাত একটা অবধি জেগে!...চমৎকার বই হয়েছে; উপক্ষিতা নারীর মনের অসহ্য দুঃখ, তার নীরব মর্ম্মবেদনা, মুক্ত আলো-হাওয়ার জন্য তার প্রাণের অধীর আকাঙ্ক্ষা...এ-সব যেন ছবির মত ফুটিয়ে তুলেচেন!...বাংলায় এমন বই পড়িনি এর আগে...

দীপ্তির সারা অঙ্গ লজ্জায় ছমছম করিয়া উঠিল। কানের কাছে এই প্রশংসার বাণী, মনকে এ পাগল করিয়া তোলে!

ক্ষিতীশ কহিল,—বইখানির নাম-করণ করেননি এখনো, দেখলুম। নামটা কি দেওয়া যায়, বলুন তো?

দীপ্তি কহিল,—ভেবে ঠাওরাতে পারিনি!…তবে কাল রাত্রে মনে হচ্ছিল, ও আর বেশী ভেবে কাজ নেই…খুব সাধারণ নামই দেওয়া যাক। ভাবচি, 'উপেক্ষিতা' নাম দিলে কেমন হয়!

ক্ষিতীশ বলিল,—বেশ হয়!…আমারও ঐ নামটা মাথায় আসছিল।…তাহলে ঐ নামই থাক্।

দীপ্তি কোন কথা কহিল না, শুধু ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

ক্ষিতীশ একটা ঢোক গিলিয়া কহিল,—তাহলে…এর জন্য প্রণামী আপনাকে কি দিতে হবে, আদেশ করুন!

—প্রণামী!…দীপ্তি গম্ভীরভাবেই কহিল,—যা খুসী হয় দেবেন। আমি ও-সব জানি না! বই একটা লিখেচি, এইমাত্র! তবে আপনার কাছে গোপন করবো না, আমার টাকার খুব দরকার আছে। ঐ মেয়েটিকে মানুষ করা…এই সব করেই আমায় চালাতে হবে কি না!

কথাটার মধ্যে এমন গূঢ় বেদনা প্রচ্ছন্ন ছিল যে তাহা ক্ষিতীশের মনটাকে প্রচণ্ড দোলা দিল। সে কহিল,—বেশ, আপাততঃ দু'শো পেলে আপনার কোনো অসুবিধা যদি না হয়, তো তাই নিন…তারপর বই যেমন বিক্রী হবে, তেমনি শতকরা পঁচিশ টাকা হিসাবে কমিশন আপনি পাবেন। ছাপা, বাঁধাই, বিজ্ঞাপন—এ-সব খরচ আমার! আপনার কোন ঝুঁকি নেই।

দীপ্তি কহিল,—তা বলে আমার প্রতি দয়া দেখিয়ে লোকসান করবেন না যেন নিজের...

ক্ষিতীশ কহিল,—না,না, লোকসান হবে কেন। এটা দু-তরফ থেকেই fair। আর বড় বড় লেখকদের সঙ্গেও এই সর্ত্তই করচি আমি!

দীপ্তি হাসিয়া কহিল,—কিন্তু আমার নগণ্য লেখার দর তাঁদের সঙ্গে এক হতে পারে না তো।

ক্ষিতীশ কহিল,—আপনার এ প্রথম উপন্যাস হলেও এতে যে-শক্তি আপনি দেখিয়েছেন. তা অপূর্ব্ব, একেবারে খুব উঁচু দরের!

দীপ্তি এ প্রশংসায় লজ্জা পাইল। সে সলজ্জভাবে কহিল,—কি যে বলেন আপনি!

ক্ষিতীশ কিন্তু কাল রাত্রে দীপ্তির লেখা উপন্যাস পড়িয়া সত্যই বিস্মিত হইয়া গিয়াছে! নারী-চিত্তের এ-সব গোপন তথ্য, এ যে তার একেবারে অজানা! 'উপেক্ষিতা'র নায়িকা বিভার মন মুক্ত হাওয়ায় একেবারে জ্বল-জ্বল করিতেছে। এমনি আলোয় ভরপূর যে সে এক-নিমেষে প্রাণটাকে স্পর্শ করে! এ চিত্রটির কোথাও মামুলি ছাপ নাই—যেমন তার দীপ্ত ভঙ্গী, মনের প্রবাহও তেমনি সতেজ লীলায় বহিয়া চলিয়াছে। কেবল বিবেকের কাছেই সে জড়ো-সড়ো—তাছাড়া জগতে কারো কাছে আপন-কাজের কোন কৈফিয়তের তোয়াক্কাও সে রাখে না! তার কাজ-কর্ম্মের মধ্যেও নারী-জীবনের সেই সনাতন ধারা কোথাও

নাই, তা বলিয়া কোনো রকম অন্যায়ের ধারেও সে ঘেঁষে না, বা তার নারীত্বও কোথাও খর্ব্ব হয় নাই! বাংলার উপন্যাস-সাহিত্যে এ এক সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টি!

ক্ষিতীশ অবাক হইয়া তাই ভাবিতেছিল, এই নির্জ্জন নিরালা বন-প্রান্তবাসিনী নারী এ-চরিত্রের আভাষ পাইলেন কি করিয়া! একটা দুর্জ্ঞেয় হেঁয়ালির মতই দীপ্তিকে ঘিরিয়া বিপুল রহস্য ক্ষিতীশের প্রাণে কাল হইতে ক্রমাগত মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে!

ক্ষিতীশ কহিল,—আপনার বিভা এই মামুলি উপন্যাসের রাজ্যে এমন বিশিষ্ট কিরণ পাত করেছে যে তার রশ্মিচ্ছটায় সাহিত্য-জগৎ উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে!...তাই ভাবছিলুম, নারী আপনি, লোকালয়ের বাইরে ত থাকেন...এ চরিত্র সৃষ্টি করলেন কি করে!...মনের খুব অবাধ মুক্ত প্রসারতা না থাকলে এ চরিত্রের কল্পনা করাও যে সম্ভব নয়! ছোট্ট গণ্ডীর মধ্যে যে-সব লেখকের মন আবদ্ধ হয়ে আছে, তারা চর্ব্বিত-চর্ব্বণের জ্বালায় বাংলার উপন্যাস-রাজ্যটাকে গাঢ় অন্ধকারে ভরে তুলেছে...তাদের কল্পনার দৌড় আর কত হবে, বলুন!

উচ্ছ্বসিত আবেগে ক্ষিতীশ প্রশংসার নানা কথাই বকিয়া চলিল। দীপ্তির বুকের মধ্যটা সে প্রশংসায় যে কি-রকম তোলপাড় করিতেছিল!

ক্ষিতীশ তো জানে না, বুকের কতখানি রক্ত দিয়া দীপ্তি তার কল্পনার ছবিকে এই উপন্যাসে রাঙাইয়া তুলিয়াছে!... এ যে তারই মনের ছায়ায় বিভার চরিত্র আঁকিয়াছে সে!...

বহুক্ষণ বকিয়া ক্ষিতীশ নীরব হইল। দীপ্তি শুধু কহিল,—লিখলুম তো যা হোক,—বাজারে কি এ বই বিক্রী হবে?

ক্ষিতীশ কহিল,—বলেন কি! বিক্রী হবে না? বাঙালী পাঠকের বিবেচনা-শক্তি এখনও খুবই প্রখর হয়ে উঠেচে...তারা সঙ্কীর্ণ বাজে যা-তা লেখা পড়তেও চায় না, আর! অক্ষম লেখকদের হাত-মক্সোর জ্বালায় সব অস্থির। তারা চায়, প্রাণের স্পন্দনে স্পন্দিত মানব-মনের জীবন্ত ছবি! বাছা-গোপালের পন্থা আদর্শ তারা বিষ দেখে! অবশ্য সমঝদার পাঠকের কথা বলছি আমি।

দীপ্তি কহিল,—দেখুন, এখন আপনার হাত-যশ! আমার তো তুচ্ছ লেখা...

ক্ষিতীশ সাগ্রহে কহিল,—কিছু ভাববেন না আপনি!... মোদ্দা এইখানেই লেখা থামাবেন না। এ বই ছাপা হোক্, আপনি আরো উপন্যাস লিখুন! বাঙালীকে কিছু দেবার মত শক্তি আপনার আছে যখন, তখন দানে কার্পণ্য করবেন না!

এই অপরিচিত তরুণের কথায় দীপ্তির মন তার প্রতি আকৃষ্ট হইল। এমন উদার দরাজ মন...এর পূর্ব্বে সে আর একটী মাত্র দেখিয়া ছিল—অরুণের! আজ অরুণ নাই!...দীপ্তি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। তার মনে হইল, এই যে নিবিড় আঁধারের মধ্য দিয়া বাকী জীবনটা কাটাইয়া দিবে ভাবিয়া সে অত আকুল হইয়া উঠিতেছিল, কাহারো সঙ্গে আর কখনো মনের সুর মিলাইতেও পারিবে না বলিয়া...একা

নিঃসঙ্গ গৃহকোণের কীট হইয়া নিজের বেদনা লইয়াই তাকে তৃপ্ত থাকিতে হইবে...তা নয়! একজন বন্ধু এই শূন্য জীবনে আবার আসিয়া দেখা দিয়াছে! শুধুই কাজের কথা কহিতে-কহিতে প্রাণ আর হাঁপাইয়া মরিবে না, তাহা হইলে!...স্বস্তির আরামে দীপ্তির চিত্ত ভরিয়া উঠিল।

ক্ষিতীশ কহিল,—কেমন, তাহলে কথা দিন্ আমাকে, আরো লিখবেন..?

দীপ্তি কহিল,—দেখা যাবে। আমার তো উপন্যাস লেখার শক্তি নেই! এমনি চুপচাপ বসে থাকি, ভাবলুম, কিছু লেখবার চেষ্টা করে দেখি!...তাই ছাই-পাঁশ যা মনে এল, লিখতে সুরু করলুম!

হাসিয়া ক্ষিতীশ কহিল,—ছাই-পাঁশই বটে!...কথায় বলে না, যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই, মিলিলে মিলিতে পারে বিবিধ রতন!—এমনি ছাই-পাঁশ আরো পাঁচজন যদি দিতে পারতো, তাহলে বাংলা সাহিত্যের দুর্দ্দশা কতক ঘুচতো!...

এই ব্যাপার হইতে ক্ষিতীশের সঙ্গে দীপ্তির অন্তরঙ্গতাও বাড়িয়া উঠিল। দীপ্তি যেদিন প্রভাকে গান শিখাইতে যায়, সেদিনটা ক্ষিতীশও এমন অধীর আগ্রহে তার পথ চাহিয়া বসিয়া থাকে! দীপ্তি গান গায়, প্রভাও সেই সঙ্গে তার সুরে সুর মিশাইয়া যে স্বপ্ন-জালের সৃষ্টি করে, সে জালে ক্ষিতীশও কেমন মুগ্ধ আবেশে আপনাকে আবদ্ধ করিয়া ফেলে! প্রভা অবাক হইয়া গেল, গানের দিকে দাদার হঠাৎ এমন ঝোঁক

জাগিয়াছে দেখিয়া। আগে এই গান করাটাকে ক্ষিতীশ অলসতার প্রশ্রয় দেওয়া বলিয়াই উড়াইয়া দিত! আর এখন…!

একদিন হাসিয়া প্রভা কহিল,—গানটা তাহলে কুড়েমির চর্চ্চাই নয়…না দাদা?

ক্ষিতীশ এ কথায় অপ্রতিভ হইয়া কহিল,—তার মানে?

প্রভা কহিল,—আগে মার কাছে কত না লাগাতে, গান গাওয়া কি! প্যাঁ-প্যাঁ করে বাজনা আর তার সঙ্গে তা-না-না করে গাওয়া…এতে সময় নষ্ট না করে লেখাপড়া করুক্ না!—আর এখন যে নিজে তন্ময় হয়ে গান শুনতে বসে যাও…

দীপ্তি দৃষ্টিতে হাসি ভরিয়া ক্ষিতীশের পানে চাহিল। ক্ষিতীশ তা লক্ষ্য করিল, লক্ষ্য করিয়া কহিল,—তা বলে কি সে তোর ঐ প্যাঁ-প্যাঁ!…এঁর গান শুনে মনে হচ্ছে বটে যে, হ্যাঁ, গান জিনিষটা বসে শোনবার মত!…

প্রভা অভিমানের সুরে বলিল,—তা, আমি বুঝি দু'দিনেই অমন শিখে ফেলবো!…গাইতে গাইতেই তো গলা হবে—নয় দিদি? প্রভা দীপ্তির দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল। দীপ্তিকে সে দিদি বলিয়া ডাকে।

দীপ্তি কহিল,—তা বৈ কি!…প্রভার গলা ভালো, দানা আছে…গাইতে গাইতে ওর গলাও চমৎকার খুলবে!…

প্রভা সহর্ষে কহিল,—শুনলে তো!…

ক্ষিতীশ কহিল,—শুনলুম। তাইতো…তোর গলার evolution লক্ষ্য করি বসে-বসে…যাক্, এখন তর্ক ছেড়ে ঐ

গানটা শিখে ফেল্!...বেশ গান,—রবি বাবু না হলে গান লিখবে কি ঐ ওপাড়ার মথুর, কুণ্ডু, না, শিবু সা...? কেমন ভাব, দ্যাখ্ দিকি...আর কি সুরের ঝর্ণাই বয়ে চলেছে!—বিদায় যখন চাইবে তুমি দখিণ সমীরে!...আহা—বিদায়ের বেদনা কি অপরূপ করুণ হয়ে ফুটে উঠচে...অশ্রুর মালা গলায় ধরে বিদায়-বেলাটুকু যেন টল্‌টল্ করছে!...

দীপ্তি কহিল,—রবি বাবুর গান গাইতে সুখ, শুনে সুখ ...বাংলা দেশে এ-সব গান দেখে, অন্য লোক গান লেখে কি সাহসে, তাই আমি ভাবি মাঝে-মাঝে...

ক্ষিতীশ প্রবল উচ্ছ্বাসে মাথা নাড়িয়া কহিল,—ঠিক কথা! Fools rush in, where angels fear to tread.

— ১৩ —

দীপ্তির উপন্যাস 'উপেক্ষিতা' যথাসময়ে ছাপিয়া বাহির হইল—এবং তরুণ প্রকাশক ক্ষিতীশ প্রবল উৎসাহে তাকে বিজ্ঞাপনের তাঞ্জামে চড়াইয়া মহা সোরগোল বাধাইয়া লোকের দৃষ্টি-আকর্ষণে কার্পণ্য করিল না! বহু নিষ্কর্ম্মা অলস ব্যক্তি— যারা দুনিয়ার কোন কাজে সাফল্য লাভ করিতে না পারিয়া হিংসার আগুনে পুড়িয়া দুনিয়াকেও পুড়াইবার জন্য মাথা কুটিয়া মরিতেছিল,—এবং বসিয়া-বসিয়া নভেল নাটক ও কবিতায় হাত মক্সো করিতে গিয়া কলম আঁচড়াইয়া কিছুতেই লেখা বাহির

করিতে পারিল না, তারা শেষে সমালোচকের গদি পাতিয়া সমালোচনার কাজে লাগিয়া গেল। তাদের লেখায় আর কিছু না থাক্, সনাতন সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য প্রচণ্ড চেষ্টা এবং যাদের রচনায় একটু প্রাণের স্পন্দন দেখা যায়, গুণ্ডার মত তাদের সেই প্রাণটুকুকে চাপিয়া মারিবার জন্য অমানুষিক বিক্রম আর গালি-কুৎসার বিষ এমন আত্ম-প্রকাশ করিতে যে তারা অচিরে বাণীর কমল-বনের ধারে লোলুপ ব্যাঘ্র ও বন্য বরাহের মত দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিল। তারা সর্ব্বদাই ওৎ পাতিয়া বসিয়া থাকিত, কখন্ কার লেখা বাহির হয়! বাহির হইলেই চিড়িয়া-খানার খাঁচায়-পোরা বাঘ মাংস-খণ্ড পাইলে যেমন লাফ দিয়া তার উপর পড়িয়া সেটাকে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া নিজের রুদ্ধ আক্রোশ মেটায়, তেমনি ভাবেই এরা সে-লেখাকে দাঁতে কাটিয়া নখে ছিঁড়িয়া তচ্‌নচ্ করিয়া দেয়।

দীপ্তির উপন্যাস বাহির হইলে তেমনি নির্ম্মম বিক্রমে তার প্রতি পৃষ্ঠা কলমের খোঁচায় জর্জ্জরিত করিয়া সকলকে তারা মহা-কলরবে জানাইয়া দিল যে, এ বই বাংলা সাহিত্যের কলঙ্ক, বাঙালীর সমাজকে ধূমকেতুর মতই ধ্বংস করিবার জন্য উদয় হইয়াছে! শুধু এইটুকু বলিয়াই তারা ক্ষান্ত রহিল না— লেখার ফাঁক দিয়া লেখিকার সম্বন্ধে এমন গ্লানিকর কুৎসার সৃষ্টি করিয়া তুলিল যে তা পড়িয়া নিতান্ত নিরীহ শান্ত পাঠকের মনও রাগে ঘৃণায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। নিজেদের মনের যা-কিছু কালি ঘাঁটিয়া তারি গাঢ় প্রলেপে সারা উপন্যাসখানিকেই

সে কালি লেপিয়া কালো করিয়া ছাড়িল না, তারা দীপ্তির নাম, দীপ্তির চরিত্র এ-সবের উপর সেই কালি ছিটাইয়া তাকেও নিবিড় কালো করিয়া তুলিল।

তাদের অধ্যবসায় এই কুৎসা লিখিয়াই ক্ষান্ত রহিল না। অসাধারণ উদ্যমে দীপ্তির ঠিকানার সন্ধান করিয়া সেই কুৎসা-ভরা আলোচনা দীপ্তির ঠিকানায় পাঠাইয়া তবে তাদের সাহিত্য-প্রীতি ও সমাজ-অনুরাগ শান্ত হইল। দীপ্তি সে আলোচনা পড়িল। পড়িয়া অসহ্য বেদনায় তার নিশ্বাস বন্ধ হইবার মত হইল। দুই চোখে কোথা হইতে জলও ঠেলিয়া আসিল! দীপ্তি একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল।

ক্ষিতীশ আসিয়া কহিল,—এ রকম বসে আছেন যে?

দীপ্তি সেই লেখাগুলা তার দিকে আগাইয়া দিয়া কহিল,—পড়েচেন?

ক্ষিতীশ হাসিয়া কহিল,—কি, ঐ সব রোতো গালাগাল?

দীপ্তি কহিল,—সমালোচনা!

ক্ষিতীশ ঝাঁঝালো স্বরে কহিল,—একে সমালোচনা বলে সমালোচনার অপমান করবেন না। ভাড়াটে গুণ্ডার দল, এদের বলেন, সমালোচক! Failure has made monsters of these vile creatures!. সব নর্দ্দামার পোকা—দুর্গন্ধ পাঁকের মধ্যে নাক-মুখ গুঁজে পড়ে আছে সারাক্ষণ—ফুলের গন্ধ, আলোর লহর এরা সহ্য করতে পারে কখনো?…এদের ছুঁচো বললেও এদের খর্ব্ব করা হয়—সব রামছুঁচো…

দীপ্তি ক্ষিতীশকে এর পূর্ব্বে এমন উত্তেজিত কখনো দেখে নাই! সে অবাক হইয়া গেল। তার রাগ দেখিয়া ধীর স্বরে সে কহিল,—একজন নয় তো, তিনজনে তিনটে লেখা পাঠিয়েচে—আমার ঠিকানাও তো জেনেচে!...আশ্চর্য্য!

ক্ষিতীশ কহিল,—এই তো কাজ ওদের!...দিন্ দিকি এই কাগজগুলো—পা দিয়ে চেপে পিষে তারপর আগুন জ্বালি—জেলে পুড়িয়ে ছাই করে দি!...

বলিয়া সে মুহূর্ত্ত থামিল, তারপর বলিল,—না, না, নিজে এ কাজ করবো না। একটা ম্যাথর নেই? তাকে পা দিয়ে মাড়াতে বলি, তারপর সে-ই এগুলো আগুনে পোড়াক! তাহলেই এর যোগ্য মর্য্যাদা একে দেওয়া হবে!...বলিয়া সে কাগজগুলা মেঝেয় ফেলিয়া জুতায় মাড়াইয়া জুতার ঠোক্করে ঘরের বাহির করিয়া দিল।

তারপর ক্ষিতীশ কহিল,—এর জন্মে মাথা ঘামাবেন না মোটে!...যাঁরা প্রাণবন্ত সাহিত্য ভালোবাসেন,—অবশ্য এমন লোকের সংখ্যা খুব কম,—তাঁরা এ বইয়ের খুব আদর করচেন! এই দেখুন তাঁদের সমালোচনা—সমালোচনা যাকে বলে...আর ওগুলো? চার আনা পয়সা দিন, কি দু'খানা বাসি কাট্‌লেট ঐ পথের ধারের হোটেলের—এরা সুর ফিরিয়ে কি পুষ্পাঞ্জলিই যে তখন বর্ষণ করবে, দেখবেন আবার! এরা লিখিয়ে? ভাড়াটে গুণ্ডা সব ..এখন আসল সমালোচনা দেখুন...

ক্ষিতীশ একখানা মাসিক-পত্র খুলিয়া দীপ্তির সামনে

ধরিল। দীপ্তি দেখিল, তার 'উপেক্ষিতা'র একটা ক্ষুদ্র সমালোচনা বাহির হইয়াছে। দীপ্তি আগ্রহে পড়িতে লাগিল। সমালোচক নানা কথার পর লিখিয়াছেন, বইখানিতে প্রতিভার ছাপ আছে। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির মতের সঙ্গে আমাদের মত না মিলিতে পারে, তবু বলিব, গল্পটিতে এমন কৌতূহল উদ্রিক্ত হইয়াছে যে এ বহি রুদ্ধ নিশ্বাসে পড়িয়া শেষ করিতেই হইবে! মানব-জীবনের এমন ট্রাজেডি বাংলায় আর নাই। মনস্তত্ত্বের এমন বিচিত্র বিশ্লেষণ—যে, দেখিয়া অবাক হইতে হয়! অবসাদের তীব্র বেদনায় নৈরাশ্যের হাহাকারে বহিখানির প্রতি পৃষ্ঠা ভরা—তবু এর আগাগোড়া প্রাণের যে স্পন্দন জাগিয়াছে, তা অভিনব। সমাজের নানা কলুষিত প্রথার বিরুদ্ধে এমন সতেজ সঙ্কেত—লেখিকার এই বিপুল নির্ভীকতা, তাঁর যুক্তির অমোঘ আবেগ অস্বীকার করা যায় না। তবে এ বহি আরো পঞ্চাশ বৎসর পরে লিখিত হইলে বোধ হয় এর যোগ্য আদর হইত। সর্ব্বপ্রকার সংস্কার হইতে পাঠকের মন মুক্ত না হইলে এ উপন্যাসের মর্ম্ম-কথা তারা উপলব্ধি করিতে পারিবে না, ইত্যাদি-ইত্যাদি···

পড়া শেষ করিয়া দীপ্তি ক্ষিতীশের পানে চাহিল। ক্ষিতীশ কহিল,—পড়লেন···! তার পর থামিয়া আবার সে কহিল,—সমালোচনা জিনিষটা আমাদের দেশে নেইও। কাল্‌চার তেমন না থাকলে, প্রাণটা খুব দরাজ বড় না হলে সমালোচনা করা যার-তার কাজ নয়। ঐখানে বানান ভুল হয়েছে, ওখানে ঐ ভাষার

দোষ—এ তো সমালোচনা নয়—এর নাম পাঠশালার গুরু-মশায়গিরি! আমাদের এ দেশটা হলো অতি-বিজ্ঞের দেশ—সবাই এখানে সব দিকে অসাধারণ ওস্তাদ, আর জ্ঞানী! যে দালালী করছে, কি স্কুলে অঙ্ক কষায় বা তর্জ্জমার কাগজ দেখে, সেও যখন সাহিত্যের আসরে আচম্‌কা এসে দেখা দেয়, তখন কাব্য, পুরাণ, নাটক থেকে সমস্ত ব্যাপারের আলোচনায় এমন বিপুল স্পর্দ্ধা প্রকাশ করে, যে তা দেখে স্তম্ভিত হয়ে যাই! এদের দৃষ্টির সীমা খুব সঙ্কীর্ণ—নিজেদের প্রত্যক্ষ-করা সেই ছোট্ট গণ্ডীর বাহিরে সবই অন্ধকার! কল্পনার দৌড় এদের সেই গণ্ডীর কানাচ অবধি! সমালোচকের কল্পনা-শক্তি কত বেশী থাকা দরকার!... আমাদের এই অতি-উর্ব্বর দেশে যেমন সবাই সমাজপতি, তেমনি সবাই সমালোচক, সবাই এডিটর—পাঠক নেই! নাহলে রবিবাবু—যাঁর নামে দেশ গৌরবে-গর্ব্বে ফুলে উঠবে, তাঁর লেখা নিয়েও রামছুঁচোর দল টিটকিরী দেয়, ব্যঙ্গ করে!... আপনি কি ছার···!

দীপ্তি মৃদু হাসিয়া কহিল,—আপনি তর্ক থামান্ দিকি। ও গালাগাল পড়ে আমি একটুও বিচলিত হই নি! লেখকের নিজের মন বলে একটা জিনিষ তো আছে! সে মনের কাছে ফাঁকি চলে না! সেই মন লেখককে বলে দেয় সে যা দিচ্ছে, তার মধ্যে কতখানি প্রাণ, কতখানি সারবস্তু তাতে আছে!···সমালোচকের কথায় সে মন টলবার নয়!

ক্ষিতীশ কহিল,—ঠিক বলেছেন!...আপনি আবার উপন্যাস

লিখুন—আমি ছাপ্‌বো। আমি তো বরাবর বলেছি, দুনিয়াকে কিছু দেবার শক্তি আপনার আছে, দেবার জিনিষও দিতে পারেন যখন, তখন তা না দেবেন কেন!...

দীপ্তি কহিল,—দেখা যাক্!...

দীপ্তির লেখা চলিল—কিন্তু অতি-ধীরে। বছরে একখানি উপন্যাস লেখা হয়! ক্ষিতীশ উৎসাহে তা ছাপে—এবং এই লেখার উৎসাহে-আলোচনায় কোথা দিয়া যে পাঁচটা বছর কাটিয়া গেল...সে যেন স্বপ্নের কথা! সান্ত্বনা বড় হইতেছে—তার মুখে-চোখে লাবণ্যের হিল্লোল! পরী-শিশুর মত নাচিয়া সে খেলা করে, গানের সুরে কত কথা বলে, কত গল্প করে...দীপ্তির প্রাণ তাতে আরামের উচ্ছ্বাসে ভরিয়া ওঠে!

এই দীর্ঘ পাঁচ বৎসর সমস্ত জগৎ হইতে দূরে থাকিয়া দীপ্তির দিন কাটিয়া চলিয়াছিল। শুধু ক্ষিতীশ এখানে প্রায় আসে—তার খোলা প্রাণের সরল কথা-হাসি দীপ্তির নিঃসঙ্গ পুরীটিকে কি কলোচ্ছ্বাসেই ভরিয়া তোলে!

একদিন দৈবাৎ কি-একটা সভায় দীপ্তির দেখা হইয়া গেল তার পিতার সঙ্গে। পশুপতি চক্রবর্ত্তী ছিলেন সে সভার সভাপতি। সমাজ ও মানুষের মনের উপর তিনি বক্তৃতা করেন। সভাভঙ্গ হইলে সকলে বাহির হইয়া গেল—দীপ্তি শুধু দাঁড়াইয়া রহিল। পশুপতি চক্রবর্ত্তী সভাস্থল হইতে বাহির হইবার সময় হঠাৎ দীপ্তিকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন। দীপ্তি ডাকিল,—বাবা...

পশুপতি চক্রবর্ত্তী কহিল,—কে...দীপ্তি!

দীপ্তি কহিল,—হ্যাঁ। বলিয়া পিতাকে সে প্রণাম করিল।

পশুপতি চক্রবর্ত্তী কহিলেন,—যা করেছ, তার জন্য অনুতাপ জেগেছে তোমার মনে?

দীপ্তি বেশ শান্ত স্বরে কহিল,—অনুতাপ! না বাবা! আমি তো কোন অন্যায় কাজ করিনি—যার জন্য অনুতপ্ত হবো! ...আপনার সঙ্গে দেখা হলো যখন, তখন আপনার আশীর্ব্বাদ নেব বলে দাঁড়িয়ে আছি। আমায় আশীর্ব্বাদ করুন, জীবনের সঙ্গে যে যুদ্ধ চলেছে আমার, তাতে যেন কাতর না হই... সে-যুদ্ধে যেন আমি জয়ী হই···

পশুপতি চক্রবর্ত্তী দীপ্তির পানে চাহিলেন—তাঁর দুই চোখে জল ঠেলিয়া আসিল। তিনি ডাকিলেন,—দীপ্তি···

দীপ্তি ডাকিল—বাবা...তার পর দুজনেই নির্ব্বাক!

পশুপতি চক্রবর্ত্তী কহিলেন,—তোমার কথা এক দিনও ভুলিনি আমি, দীপ্তি! কাঁটার মত তুমি আমার বুকে ফুটে আছো সারাক্ষণ!...আমার বুক তোমায় ফিরে নেবার জন্য কি যে উদ্‌গ্রীব···কিন্তু যতদিন না অনুতপ্ত প্রাণে তুমি আমার কাছে এসে দাঁড়াচ্ছ, ততদিন তোমায় আমি ফিরিয়ে নিতে পারছি না মা। ঘরে আমার অন্য ছেলে-মেয়েরা আছে, তাদের ভবিষ্যৎ আছে, সমাজ আছে,—তাদের সঙ্গে এ-মন নিয়ে তুমি তো একঘরে থাকতে পারো না!...পশুপতি চক্রবর্ত্তী

ক্ষণেকের জন্য স্তব্ধ হইলেন, পরে কহিলেন,—শুনেছি, তোমার একটি মেয়ে হয়েছে··· !

দীপ্তি কহিল,—হ্যাঁ, সান্ত্বনা !···সেও এসেছে আমার সঙ্গে ··দাসীর কাছে গাড়ীতে আছে...

নিমেষের আগ্রহে পশুপতি চক্রবর্ত্তী কহিলেন,—এসেছে ! ···বলিয়াই তিনি পথের দিকে অগ্রসর হইলেন। দু'খানি গাড়ী সামনে দাঁড়াইয়াছিল, একখানি পশুপতি চক্রবর্ত্তীর জন্য —আর-একখানি...তাতে ঐ যে ছোট একটি শিশু···শিশু অধীর চোখে তার মার পানেই চাহিয়া ছিল। সে ডাকিল,—মা...

পশুপতি চক্রবর্ত্তী ছুটিয়া গাড়ীর সামনে গেলেন ; তার পর সহসা থামিয়া পড়িলেন। থামিয়া দীপ্তির পানে চাহিয়া কহিলেন, —তুমি আজ আমার এ হাত দুটোকে কি বাঁধনে যে বেঁধে দিয়েছ ! ঐ নিষ্পাপ সবল শিশু, তাকে বুকে নিতে গিয়েও নিতে পারলুম না !···এখনো ফেরো দীপ্তি···এখনো উপায় আছে। বাপের বুকের চেয়ে একটা তুচ্ছ খেয়ালই এত বড হলো তোমার...!

দীপ্তি জল-ভরা চোখে পিতার পানে চাহিয়া কহিল—খেয়াল নয়, বাবা...

—বেশ, তবে তোমার ঐ মত নিয়েই তুমি সুখে থাকো... বলিয়া তিনি গাড়ীতে বসিয়া গাড়ী হাঁকাইয়া দিতে বলিলেন। গাড়ী চলিয়া গেলে দীপ্তি তার গাড়ীতে উঠিল। সান্ত্বনা কহিল, —কে মা, ঐ বুড়ো মানুষটি ?···কথা কইছিলে তুমি···?

—তোমার দাদু...দীপ্তি আর কোন কথা বলিতে পারিল না। একরাশ স্মৃতি আসিয়া তার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল, বুকের মধ্যে নিমেষে তারা প্রচণ্ড কলরব জাগাইয়া তুলিল।

সান্ত্বনা মার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল,—দাদু! দাদুর কাছে যাবো মা···

—না সান্ত্বনা, দাদু নেবে না···বলিয়া সান্ত্বনাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া দীপ্তি চক্ষু মুদিল। গাড়োয়ান গাড়ী হাঁকাইয়া দিল।

— ১৮ —

এক সপ্তাহ পরে আর-একটা ঘটনা ঘটিল। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় ক্ষিতীশের গাড়ীতে তার এক ধনী বন্ধু আসিয়া হাজির হইল। বন্ধুটী গাড়ীতেই বসিয়া রহিল। ক্ষিতীশ আসিয়া দীপ্তির ঘরে প্রবেশ করিল। দীপ্তি তখন একখানা নূতন উপন্যাস লিখিতেছিল; ক্ষিতীশকে দেখিয়া কাগজ-পত্র রাখিয়া বলিল,—বসুন...

ক্ষিতীশ বসিল, বসিয়া কহিল,—নতুন বই এগুচ্ছে বেশ?

দীপ্তি কহিল,—বেশ আর কৈ! আজ একটু সেলাইয়ের কাজ নিয়ে পড়েছিলুম—এই তো বই নিয়ে বসছি!···

ক্ষিতীশ কহিল—শীগগির সেরে নিন্।...আপনার ভক্তদল আমায় ভারী অস্থির করে তুলেছে, আপনার নতুন বইয়ের জন্য!

দীপ্তি কহিল,—আমার ভক্ত?

ক্ষিতীশ কহিল,—হ্যাঁ, ভক্তই!...একজন আমার সঙ্গে এসেছেন আজ আমার গাড়ীতে!...

দীপ্তি সলজ্জ কুণ্ঠিত ভাবে চারিধারে চাহিল। ক্ষিতীশ কহিল,—গাড়ীতেই তিনি বসে আছেন। আপনার অনুমতি না পেলে তো তাঁকে এখানে আনতে পারি না!...

দীপ্তি কথাটা ভালো বুঝিতে না পারিয়া ক্ষিতীশের পানে চাহিয়া রহিল।

ক্ষিতীশ কহিল,—আপনাকে তিনি একবার দেখতে চান্। আপনার এমন ভক্ত পাঠক আর দুটী নেই! তাঁর ভক্তি-নমস্কার তিনি জানাতে এসেছেন!...

দীপ্তি কোন কথা কহিল না। ক্ষিতীশ একটু অপ্রতিভ হইল। দীপ্তি কি পছন্দ করিল না...? ক্ষিতীশ কি তার অধিকারের বাহিরে গিয়াছে, এ কথা তুলিয়া...? সে দীপ্তির পানে চাহিল।

দীপ্তি কহিল,—তিনি দেখা করতে চান্! বেশ—তা কবে...?

ক্ষিতীশ প্রসন্ন হইল। সে কহিল,—যবে বলেন!...তবে আজ তিনি এসেছেন এখানে...

—এসেছেন! দীপ্তি শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল...দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাহিল।

ক্ষিতীশ কহিল,—তিনি বাড়ীতে আসেন নি, বাইরে গাড়ীতে বসে আছেন।

—গাড়ীতে! • দীপ্তি কহিল,—তাঁকে নিয়ে আসুন।

ক্ষিতীশ গর্ব্বিত বক্ষে গাড়ীর দিকে ছুটিল, এবং অনতিবিলম্বে বন্ধুকে লইয়া ফিরিয়া আসিল; আসিয়া কহিল—ইনিই উপেক্ষিতা-রচয়িত্রী। তার পর বন্ধুর পানে চাহিয়া কহিল,—আর ইনি আমার সাহিত্য-রসিক বন্ধু বিমলচন্দ্র দত্ত। কলকাতায় এঁর অসংখ্য বাড়ী, কারবার...কিন্তু তাতেই আচ্ছন্ন হয়ে থাকেন না. সাহিত্যের রীতিমত পাঠক আর সমঝদার ইনি।···আপনার লেখার ভারী ভক্ত। আপনার উপেক্ষিতা বই পড়ে উচ্ছ্বসিত আনন্দে বলেছিলেন, আজ এই বাংলা ভাষায় প্রথম উপন্যাস বার হলো! স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন ভঙ্গী, মৌলিকতা আর স্বাস্থ্যে ভরপূর, নবযুগের এই প্রথম উপন্যাস!

প্রশংসায় উচ্ছ্বাসে দীপ্তি সলজ্জ কুণ্ঠায় মাথা নত করিল।

বিমল কহিল,—একটি কথাও আমি অত্যুক্তি করিনি···

ক্ষিতীশ কহিল,—সমস্ত বিদেশী কাব্য-উপন্যাস বিমল পড়ে ফেলেছে! শুধু পড়া নয়, সেগুলির সৌন্দর্য্য একেবারেও আয়ত্ত করে রেখেছে! আপনার উপেক্ষিতার একটা সমালোচনাও লিখে ফেলেচে··তবে কোনো মাসিক-পত্রে তা ছাপায়-নি! ওর ইচ্ছা, নতুন একখানা কাগজ ও বার করে—আর আপনাকে সেই কাগজের প্রধান লেখিকা করে কায়েমিভাবে আপনাকে আটকে ফেলে...

দীপ্তি মুখ তুলিয়া বিমলের পানে চাহিল। বিমল কি শ্রদ্ধার আবেগ-ভরা দৃষ্টিতে দীপ্তির পানে চাহিয়া ছিল! দীপ্তি

মুখ তুলিতেই দু'জনে চোখাচোখি হইল। বিমল চোখ নামাইল।

বিমল কহিল,—ক্ষিতীশ আমার বন্ধু। বন্ধুত্বের খাতিরে আমার সম্বন্ধে ও অনেক অতিরঞ্জিত কথা বলেছে! সেজন্য ওকে ক্ষমা করবেন। আমি শুধু সাহিত্যের ভক্ত—কাজেই আপনার লেখারো খুব ভক্ত পাঠক—আমার এইটুকু পরিচয়মাত্র আপনি জেনে রাখুন।

দীপ্তি কহিল,—আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন যে! বসুন... বলিয়া চেয়ারটা টানিয়া দিতে গেল।

বিমল ক্ষিপ্র হাতে চেয়ারখানা দীপ্তির হাত হইতে ছিনাইয়া টানিয়া লইল; লইয়া কহিল,—আমি বসবো, আর আপনি দাঁড়িয়ে থাকবেন! তা হয় না...। আপনি বসুন, আমি এই মেঝেয় সতরঞ্চিতে বসচি!...বলিয়া সে মেঝেয় পাতা সতরঞ্চির একধারে বসিয়া পড়িল।

দীপ্তি কহিল,—সে কি...না, না, ওখানে বসবেন না। আপনি চেয়ারে বসুন, আমি নীচেয় বসছি...

বিমল কহিল,—সে হতেই পারে না!...আপনার দুর্ভাগ্য যে, এই বাংলা দেশে এ প্রতিভা নিয়ে জন্মেছেন! বিলেত হলে আজ আপনাকে সকলে রত্ন-সিংহাসনে বসিয়ে দিতো!

লজ্জার রক্তিম উচ্ছ্বাসে দীপ্তির মুখ রাঙা হইয়া উঠিল।

ক্ষিতীশ কহিল,—বিমল অনেকদিন থেকেই আপনার এখানে আসতে চাইছিল, কিন্তু আমার সাহস হয়নি আপনার

এ নির্জ্জন ধ্যান ভঙ্গ করতে! আমি যে অধিকারটুকু পেয়েছি—কি জানি, তার গণ্ডী বাড়াতে গেলে যদি আপনি বিরক্ত হন।

—বিরক্ত! হাসিয়া দীপ্তি কহিল,—এ তো আনন্দের কথা! যে-পাঠক লেখার পক্ষপাতী, সে পাঠক যে লেখকের বরেণ্য অতিথি, অন্তরঙ্গ বন্ধু! তাঁর আসায় কোনো লেখক বিরক্ত হতে পারে কখনো!...

বিমল কহিল,—দেখুন তো ক্ষিতীশের অতি-সতর্কতা... তার ভয় হচ্ছিল, যদি আপনাকে আমার কাগজে টেনে নিতে পারি, তাহলে ওর বইয়ের ব্যবসা হয়তো মাটী হয়ে যেতে পারে!

দীপ্তি এ কথার অর্থ ভালো বুঝিতে না পারিয়া বিমলের পানে চাহিল।

বিমল কহিল,—নতুন আনকোরা বইয়ের কাটতি বেশী কি না, মাসিকে প্রকাশিত বইয়ের চেয়ে! একবার মাসিকে কোনো উপন্যাস পড়ে আবার সে বই ছেপে বেরুলে তা কিনে পড়বে, বাংলা দেশে এমন পাঠকের সংখ্যা খুব কম কি না...

এই নূতন অতিথির সরল-স্বচ্ছন্দ কথা-বার্ত্তার ভঙ্গী নিমেষে দীপ্তির হৃদয় স্পর্শ করিল। বাজে লৌকিকতার বা অর্থহীন শিষ্টাচারের কোন ধার এ ধারে না! মনে যখন যে কথা আসিয়া দাঁড়ায়, অকুতোভয়ে এবং কেমন অবলীলায় তখনি সে তা প্রকাশ করিয়া ফেলে! চমৎকার! দীপ্তি নিমেষে বিমলকে আপনার হৃদয়-কক্ষে আসন ছাড়িয়া দিল।

এর পর হইতে ক্ষিতীশের সহিত বিমলও দীপ্তির গৃহে নিত্য-

অতিথি হইয়া উঠিল। কয়জনে মিলিয়া সাহিত্যের কমল-বনে অবলীলায় বিচরণ করিয়া বেড়ায়, বিচিত্র মানস-কুসুম তুলিয়া কত রকমেরই যে সব মালা গাঁথে, আর নিজেরা সে-মালার বৈচিত্র্য উপভোগ করিয়া মুগ্ধ হয়!...এমনি করিয়া এই তিনটি প্রাণীর মধ্যে মিলনের ডোর ক্রমেই বেশ ঘন ও নিবিড় হইয়া উঠিতে লাগিল!

সান্ত্বনার সঙ্গেও তাদের আলাপ জমিল খুব। ক্ষিতীশের কাছ হইতে বিস্কুট, লজেঞ্জেস আর চকোলেট এ তো নিত্য উপহার মিলিত! দম-দেওয়া মোটর গাড়ী, বেবি-পুতুল, সেলু-লয়েডের খোকা-পুতুল, এ-সব বিমল তাকে আনিয়া দিল। দীপ্তি আপত্তি তুলিল,—কেন এ সব খরচ করছেন! দুই বন্ধুতে জবাব দিল,—সে ওর সঙ্গে বোঝাপড়া! আপনি এদিকে চেয়েও দেখবেন না!

এই সঙ্গে বিমলের মাসিক-পত্রের আলোচনাও চলিত সবেগে। দীপ্তির উপর বিমলের অগাধ নির্ভর!

দীপ্তি বলিল—কিন্তু আমি তো কুড়ের হদ্দ! এক বছরে কোনমতে একখানি উপন্যাস লিখে শেষ করি।

বিমল বলিল,—প্রবন্ধও দু-একটা ফী মাসে আপনাকে জোগান দিতে হবে। আমাদের দেশের এখনকার নারী-সমাজের আলোচনা—তার সর্ব্বাঙ্গীন আলোচনা।

দীপ্তি কহিল,—ভারী তো আমার বিদ্যে! আমি লিখবো প্রবন্ধ!

বিমল বলিল,—এতে তো এম-এ পাশ করার দরকার নেই! এ সম্বন্ধে আপনার যা মত, যা আপনি দেখেছেন, দেখে যেটা দোষ বলে বুঝেছেন, তা কি করে সাফ হয়...সে সম্বন্ধে আপনার যা প্ল্যান—এই সব আর কি লিখবেন। এ লিখতে সোপেনহাউয়ারের লেখা ঘাঁটতে হবে না, মিল-স্পেন্‌সারের নাম করবারও দরকার নেই! সাফ মনের কথা! পাণ্ডিত্য জাহির করার দুশ্চেষ্টা তো চাইছি না! আজকাল বহু লেখিকার এই বিদ্যাবত্তার জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেচি! খালি কোটেশন আর জ্যাঠামি!

দীপ্তি কহিল,—ও সব লেখার চেষ্টা তো কখনো করিনি! তবে হাঁ, এ সম্বন্ধে অনেক কথা ভাবি বটে!

বিমল কহিল,—আমি তাই চাইছি, সেই ভাবনাটুকুই লেখার অক্ষরে গেঁথে দেবেন!

দীপ্তি কহিল,—তা যেন লিখলুম! কিন্তু আমার একখানি উপন্যাস আর ঐ রকম একটা প্রবন্ধ, এতেই তো কাগজ চলবে না। বাকী লেখার কি হবে? অত বড় কাগজ ভরাবেন কি দিয়ে?

বিমল বলিল,—অত বড় মানে, ঢাউস কাগজ তো আমি বার করছি না!...গন্ধমাদন বওয়া আমার কাজ নয়। আমি চাই, কাগজ খুব বড় হবে না, অল্প লেখা তাতে যা থাকবে, তা প্রাণবন্ত হবে, প্রাণের কথায় প্রতি পৃষ্ঠা ভরপুর থাকবে।

দীপ্তি কহিল—আর ছবি! ছবি না দিলে তো কাগজ চলবে না!

বিমল কহিল,—ছবি মৌলিক না হলে দেবো না। বিলিতী কাগজের ছবি কেটে তার ব্লক এঁটে চুরি-বিদ্যার প্রশ্রয় দিতে চাই না আমি! আজকাল মাসিক কাগজে ছবি যা বেরুচ্ছে—দেখচি, এ শুধু পরস্পরের মধ্যে একটা ভীষণ কামড়া-কামড়ি চলেছে, চুরির কারবারে কে বেশী দড়, এইটেই প্রমাণ করতে!... যে যত বেশী ছবি চুরি করতে পারে, সেই তত বাহাদুর! কোনো বিদেশী লোক যদি আজ আমাদের দেশের একটা ঢাউস মাসিক-পত্র খুলে দেখে তো ঘৃণায় তার প্রাণ ভরে উঠবে—এতে বাংলার প্রাণ কৈ! উপন্যাস কবিতায় সেই লেসের ঝালর, নেট, পর্দ্দা, আর চা-কাটলেট্ ছুরি-কাঁটার ঝন্‌ঝনি! ছবিতেও সাহেব-মেমের মুখ-চোখ হাত-পা, তাতে বাংলার প্রাণের সাড়া কোথাও নেই!

দীপ্তি কহিল—কথাটা যা বলেছেন, তাই দেখচি একরকম হচ্ছে বটে!

বিমল কহিল,—আমি চাই, বাংলার কাগজ বার করতে! যাতে বাংলার প্রাণের পরিচয় আগাগোড়া পাওয়া যাবে, বাংলার প্রাণের সুর বইবে যার পাতায় পাতায়! খাঁটি সাহিত্য-রস বিলুতে চাই আমি! আর এ বিশ্বাস আমার খুব আছে, তাতে আপনার সাহায্য পেলে আমি এ কাজ সুসম্পন্ন করতে পারবো! ...আপনি যদি ভরসা দেন, তবেই কাজে নামি,—না হলে এ আকাশ-কুসুম চয়ন করা ছেড়ে দি...

দীপ্তি কহিল,—বেশ, আমি ভেবে দেখি! এ

তো অষ্টি মাস চলছে…আপনি কাগজ বার করবেন কবে থেকে ?

বিমল কহিল,—পৌষ মাস থেকে আরম্ভ করবো। কাগজের নাম দিচ্ছি নব্যবঙ্গ। কি বলেন ?

দীপ্তি কহিল,—মন্দ কি! এতে খালি নব্যবঙ্গের চিন্তার ছাপ থাকবে!

বিমল কহিল,—হ্যাঁ। প্রাচীন প্রত্নতত্ত্ব মোটেই স্থান পাবে না।

দীপ্তি কহিল,—তারও তো দাম আছে সাহিত্যের দিক থেকে…

বিমল কহিল,—মাটী খোঁড়া বা ঢিপি বওয়ার জন্যে দেশে এত কাগজ তো রয়েওছে…আর একটা কুলির সংখ্যা নাই বাড়ালুম!

হাসিয়া দীপ্তি কহিল,—বেশ!…তা আমার দ্বারা কতটা সাহায্য হতে পারবে, ভেবে দেখে বলবো আমি!

— ১৫ —

আষাঢ়ের মাঝামাঝি দীপ্তির নূতন উপন্যাস "মন্দাক্রান্তা" বাহির হইল। এ উপন্যাস বাহির হইতেই দুইটা দলের দুই রকম বিভিন্ন সমালোচনাও বাহির হইল। একদল রচনায় চরিত্র-সৃষ্টিতে লেখিকার অদ্ভুত তেজ আর অসীম নির্ভীকতা দেখিয়া তাঁর শিরে অজস্র পুষ্পাঞ্জলি বর্ষণ করিল, অপর দল

এমন কুৎসিত কদর্য্যতা তুলিয়া সমাজকে সতর্ক হইতে বলিল যে তাদের সেই ইতর লেখা পড়িলে সর্ব্বাঙ্গ রী-রী করিয়া ওঠে! একখানা লক্ষ্মীছাড়া সাপ্তাহিক কাগজ সর্ব্ব-শাস্ত্রে আশ্চর্য্য নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়া সকল বিষয়ে এমন মুরুব্বিয়ানা প্রকাশ করিত যে সে কাগজখানা ভদ্র শিক্ষিত দলের ঘৃণা যে-পরিমাণে বহন করিতেছিল, অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের কৌতুককেও ঠিক সেই পরিমাণে জাগাইয়া তুলিত। সাহিত্য এবং সমাজ সম্বন্ধে এই কাগজখানার আশ্চর্য্য অভিমত শুনিলে গায়ে কাঁটা দেয়—এবং এই অভিমত প্রচণ্ড অজ্ঞের মত মুরুব্বির ভঙ্গীতে কাগজের পৃষ্ঠায় নিলর্জ্জ নিঃসঙ্কোচে ছাপিয়া এ কাগজখানা অতি অল্পকালের মধ্যেই ইতরতা ও বর্ব্বরতায় আপনার আসন কায়েমি করিয়া ফেলিয়াছিল। দুই-একখানা ভদ্র কাগজ ইহার এই নির্ব্বুদ্ধিতার প্রতি সামান্য একটু ইঙ্গিত করিবামাত্র এ এমন গালি দিয়া বসিল যে সে গালি কোন ভদ্রলোক মুখে উচ্চারণ করা দূরে থাক, মনের কোণেও আনিতে পারেন না! এই সাপ্তাহিক খানার নাম ছিল 'ধুরন্ধর'। ধুরন্ধরে 'মন্দাক্রান্তার' এক অপূর্ব্ব সমালোচনা বাহির হইল। বহির সমালোচনা ঠিক নয়,—বহির লেখিকার পরিচয় সংগ্রহ করিয়া তাঁকে অসহ্য বর্ব্বরভাবে কুশ্রী গালি দিয়া লেখিকার বহিকে ও লেখিকাকে বাংলা দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিবার রায় লিখিয়া সে মনের ঝাল মিটাইল! এই লেখিকার বহি যে আইনের সাহায্যে বন্ধ করিয়া দেওয়া দরকার, এ কথাও মূর্খ সম্পাদক আইন না জানিয়া

বেশ অকুতোভয়ে লিখিয়া দিল! অরুণের সহিত দীপ্তির সম্পর্কটুকু খুঁজিয়া বাহির করিয়া তার প্রতি এমন অভদ্র কটাক্ষ করিল যে শনিবারের অফিস-ফেরত কেরাণীর দল দুর্নিবার লোভে এক-একখানা কাগজ কিনিয়া রবিবারটা এই দীপ্তির আলোচনাতেই কাটাইয়া পরমানন্দ উপভোগ করিল। মানুষের আদিম বর্ব্বরতার নির্লজ্জ পরিচয়, কুৎসার প্রতি এই যে অন্ধ অনুরাগ, মনুষ্যত্বকে এ কতখানি লাঞ্ছিত পতিত করিয়া তোলে, এ-সব কাগজের পাঠকের সে জ্ঞান মোটেই নাই—তাই তারা নিলর্জ্জ কৌতুকে এ ভাবে মত্ত হইতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বা সঙ্কোচ বোধ করিল না!

ধুরন্ধর-সম্পাদকের সংবাদ-সংগ্রহের শক্তিও অসাধারণ! দীপ্তির পূর্ব্ব পরিচয় সে যেমন আশ্চর্য্য তৎপরতায় সংগ্রহ করিয়াছিল, তার এখনকার ঠিকানাও সে তেমনি চটপট্ খুঁজিয়া বাহির করিল এবং বাহির করিয়া মন্দাক্রান্তার সমালোচনা যে-কাগজে ছাপা হইল, তার একখানা দীপ্তির কাছেও পাঠাইয়া দিতে সে ভুল করিল না! আরো ক'খানা কাগজের মত 'ধুরন্ধর'ও যথাসময়ে দীপ্তির হাতে আসিয়া পৌছিল, এবং দীপ্তি সে সমালোচনা পড়িল। পড়িয়া তার মাথা ঝাঁ-ঝাঁ করিতে লাগিল! এমন ময়লাও সমাজের বুকে এভাবে জড়ো করা আছে,—এই বর্ব্বরতা, এই ইতরতা!... লেখার কথা, রচনার সমালোচনা তাতে একটুও নাই, আছে তাকে না বুঝিয়া ব্যক্তিগত গালাগালি! দীপ্তির পায়ের তলায়

পৃথিবীখানা যেন ভূমিকম্পের বেগে দুলিয়া উঠিল! কিন্তু উপায় কি? ইতরের মুখ বন্ধ করিবার শক্তি কারো নাই!

সে যখন সমালোচনা পড়িয়া বিমূঢ়ের মত বসিয়া আছে, তখন সহসা ঝড়ের মত ক্ষিতীশ আসিয়া হাজির হইল।

ক্ষিতীশ আসিয়াই বলিল,—এ কি! এ কাগজখানাও আপনার হাতে এসে পৌঁচেছে!…কি করে এলো?

দীপ্তির বেদনাবিদ্ধ স্বরে কহিল,—ডাকে এসেছে।… এরাই বোধ হয় পাঠিয়েছে।

ক্ষিতীশ রাগে জ্বলিয়া উঠিল, তীব্র স্বরে কহিল,—দেখচি তাই! এত-বড় শয়তান…এ শয়তানীর কিছু সাজাও দিয়ে আসচি আমি, এইমাত্র…

দীপ্তি ম্লান দৃষ্টিতে ক্ষিতীশের পানে চাহিল, কহিল,— তার মানে?

ক্ষিতীশ কহিল,—কাল রাত্রে এই ইতর লেখাটা আমার হাতে পড়ে! তখন অনেক রাত হয়ে গেছলো…সারারাত বিছানায় পড়ে রাগে জ্বলেছি শুধু! তারপর সকালে উঠে মাথায় মস্ত আইডিয়া এলো—কি করে তার এ দুর্বৃত্ততার সাজা দেওয়া যায়! ভাবলুম, পুলিশ কোর্টে একটা কেশ করে দি,… তারপর ভাবলুম, তাতে ওকে আরো বড় করে দেওয়া হবে— ওর স্পর্দ্ধা আর গর্ব্ব তাতে বেড়ে যেতে পারে! তার চেয়ে অন্য সাজা—ছুঁচোর ছুঁচোমির সাজাই ঠিক হবে। এই ভেবে চাবুক নিয়ে ওদের অফিসে গিয়ে হাজির হলুম। সম্পাদকের

খোঁজ করলুম! একটা লোক রোগা বেঁটে কালো হতভাগা মর্কটের মত চেহারা—রোয়াকে বসে বিড়ি টানছিল, ছুঁচোর মত ছোট দুই চোখ তুলে আমায় জিজ্ঞাসা করলে, কাকে চান, মশায়? আমি বললুম, ধুরন্ধর-সম্পাদক-প্রবরকে! সে বললে,—আমিই সম্পাদক। আমি ধুরন্ধরখানা খুলে বললুম, এ গালাগাল কে লিখেচে? তাতে মুচকে হেসে সে বললে, আমিই লিখেচি!... সেই শোনা, অমনি আর কোন কথা না তুলে শপাশপ তাকে চাবুক কষিয়ে দিয়েছি। তারপর আমার শোফারকে দিয়ে কাণ ধরিয়ে তাকে দৌড় করিয়েছি! আরো পাঁচজন লোক এসে পুলিশ ডাকাডাকি করতে লাগলো...আমি তাতে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করে তাকে ধরে পথের মাঝে নাকে-খৎ খাইয়ে নিয়ে তবে ছেড়েচি। সে নাকে খৎ দিয়ে বলেছে, আসছে হপ্তায় মাপ চেয়ে সে এর প্রায়শ্চিত্ত করবে। না হলে আমি বলে এসেছি, তাকে কলকাতা-ছাড়া করতে আমি কাতর হবো না—যত টাকা খরচ হয় এর জন্য, খরচ করবো, বলেছি!

উত্তেজনায় ক্ষিতীশ থর-থর করিয়া কাঁপিতেছিল! দীপ্তি অবাক হইয়া তার কথা শুনিতেছিল। কথা শেষ হইলে সে কহিল,—এ করেছেন কি আপনি?

ক্ষিতীশ কহিল,—ঠিক কাজ করেছি। কি আনন্দই যে হচ্ছে আমার—দুর্জ্জনকে সাজা দিয়ে এত আনন্দও হয়!

দীপ্তি কহিল,—এখন সে যদি নালিশ-মকর্দ্দমা করে?

ক্ষিতীশ কহিল,—করুক! আদালতে গিয়ে হাকিমের সামনে বলে আসবো, দুর্ব্বৃত্ততার সাজা দিয়েছি, তাতে জরিমানা হয়, সেই দণ্ডে জরিমানা দেবো...মহিলার অপমান করে পার পাবে আমার হাতে, এত বড় শয়তান আজো জন্মায়-নি!

দীপ্তি অবাক হইয়া গেল, এই তরুণের শ্রদ্ধার ভঙ্গী আর সাহস দেখিয়া! সে বলিল—ছি, ভালো কাজ করেন-নি! কি বয়ে গেছে এতে!...গালাগাল,—দু'দণ্ড চীৎকার করে কারো কৌতুক যোগাবে, মানি—কিন্তু তার পর হাউইয়ের আগুনের মতই ছাই হয়ে কোথায় কালো মাটীর বুকে মিশিয়ে যাবে! আমি তো ও-সব গ্রাহ্যও করি না!...

ক্ষিতীশ কহিল, - আমাদের দেশে সমালোচনার নামে মাঝে মাঝে এই যে সব ইতর গালাগাল কাগজে বেরোয়, তার জবাব কলমে না দিয়ে এই চাবুকে দিতে হয়। অভদ্রতা তাতে শায়েস্তা হয়, সাহিত্য-কুঞ্জের জঞ্জালও কতক সাফ হবার সুযোগ পায়!...মাথায় যাদের তিলমাত্র বোধ-শক্তি নেই, ভদ্রতার বিন্দুও যারা জানেনা, কলমের লেখায় তাদের বুদ্ধি দেওয়া যায় না—চাবুকেই তাদের মেধা পরিষ্কার হয়।

এমনি নানা আলোচনার পর ক্ষিতীশ বলিল,—আমায় একবার এর মধ্যে এলাহাবাদ যেতে হচ্ছে। ওখানে এক বন্ধুর বিয়ে—না গেলে নয়! বোধ হয় হপ্তা-খানেক থাকবো। কাল যাবো বলে ভাবচি।...'মন্দাক্রান্তা' বিক্রী হচ্ছে বেশ—

এর রয়ালটীর দরুণ কিছু টাকা আজ এনেছি—রাখুন। আমি গেলে যদি এর মধ্যে আপনার টাকার দরকার হয়…

দীপ্তি কহিল,—টাকা তো অনেক নিচ্ছি! বই বিক্রীর চেয়েও ঢের বেশী যে…

ক্ষিতীশ কহিল,—যাঁদের নিয়ে আমার ব্যবসা, তাঁদের কোনরকম অসুবিধা না হয়, সেদিকে নজর রাখা চাই তো! লেখক-লেখিকা যদি অসুবিধা ভোগ করেন, তা হলে আমার ব্যবসারো ক্ষতি হবে, যে তাতে! এই জন্যে আমি লেখক-লেখিকাদের খুসী রাখতে চাই সর্ব্বক্ষণ। পাটের কার-বারে দাদন দেয় না? এও আমাদের তাই আর কি! বলিয়া ক্ষিতীশ হাসিয়া উঠিল।

দীপ্তি কহিল,—আপনার মত প্রকাশক যদি আরো দু'চার-জন থাকতেন, তাহলে লেখক-লেখিকার দুঃখও ঘুচতো—আর তাঁদের হাত থেকে সত্যই সতেজ সবল সাহিত্য বার হতো! …দারিদ্র্যে জর্জ্জর কাতর বিষণ্ণ মনের রচনায় সাহিত্য নিপীড়িত হয়!…লেখক-লেখিকার মন স্বচ্ছন্দ না থাকলে তাঁরা অব্যাহত ভঙ্গীতে সৃষ্টি করবেন কি করে!…

ক্ষিতীশ কহিল,—লেখক-লেখিকার ঘরের খপর প্রকাশক রাখতেও পারে না তো! তবে হ্যাঁ; নিজের তবিলের দিকে নজর রাখার সঙ্গে সঙ্গে লেখক-লেখিকার তবিলের দিকেও নজর দেওয়া চাই তো!—তাছাড়া আরো একটা কথা আছে, আগে টাকা নিয়ে অনেক লেখক লেখা-সম্বন্ধে যেমন উদাসীন

থাকেন, তেমনি অনেকে আবার বিশ্বাসঘাতকতা করে লেখাটুকু অন্য প্রকাশকের হাতে চুপি চুপি তুলে দিয়ে সেখান থেকে নগদ আরো-কিছু লাভ করেন! পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাসের সম্পর্ক দাঁড়ালে কারো দিক থেকে কোন অনুযোগও যেমন উঠতে পারে না, তেমনি পরস্পরের বিশ্বাসে-সহযোগিতায় পরস্পরের লোকসানও হয় না কোনদিকে।...সবার আগে এই বিশ্বাস আর সহযোগিতাই চাই! লেখকের উপর প্রকাশকের বিশ্বাস যদি থাকে, তাহলে বই কবে পাবো সে তারিখ না খতিয়েও লেখককে প্রকাশক আগাম টাকা দিতে পারেন, এবং এ-রকম অনেক প্রকাশক অনেক লেখককে টাকা দিয়েও থাকেন!

দীপ্তি কহিল,—দেখুন, সময়-সময় আমি ভাবি, আমাদের দেশের লেখকদের দারিদ্র্যই তাঁদের মনকে কুণ্ঠিত সঙ্কুচিত রাখে। সাহিত্য-সেবায় যদি তেমন টাকা মিলতো, তাহলে বাংলা সাহিত্য আরো সরস, আরো প্রাণবন্ত হতে পারতো! বিলেতে লেখকরা যে এত বেশী পয়সা পান্ তার একটা কারণ স্বীকার করি, তাঁদের পাঠক সমস্ত বিশ্ব জুড়ে রয়েছে—আর এখানে লেখক খুব সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই তাঁর পাঠক সংগ্রহ করেন! বিলেতের পাঠকের তুলনায় এ যেন সিন্ধুর কাছে বিন্দু! তবে লেখকের সাংসারিক অবস্থা ফিরলে তাঁরা নির্ব্বিবাদে সাহিত্য সাধনা করতে পারেন। এদেশে সাহিত্য-সেবায় লেখকের পেট চলে না বলে বেশীর ভাগ সময় তাঁকে অফিসে কলম পিষে, নয় ওকালতি করে, নয় হাকিমি করে কাটাতে হয়—তারি ফাঁকে যেটুকু অবসর

মেলে তাতেই সাহিত্য সাধনা করে যা তৃপ্তি সংগ্রহ করেন।
এতে সাহিত্য ক্ষুন্ন হয় কতখানি, ভাবুন তো! কল্পনা ঐ কাজ-কর্ম্মের ভিড়ে চাপা থাকে সর্ব্বক্ষণ—সে ভিড় একটু সরলে খুব কুণ্ঠিত পায়ে সে বেরিয়ে আসে, আর সে কতটুকু বিচরণ করে—কাজেই স্বষ্টিও যা হয়, তা কুণ্ঠিত, সঙ্কুচিত,—অর্থাৎ অত্যন্ত দীন মূর্ত্তিতে সকলের সামনে এসে সে দাঁড়ায়।... সংসারের ভাবনা ভাবা, আর সাহিত্য-স্বষ্টি করা, দুটো একেবারে বিভিন্ন ব্যাপার—দুটোয় বিরোধ চিরকাল!

ক্ষিতীশ কহিল,—দেখুন, আপনাকে একটা সত্য কথা বলি তাহলে। আমি যে প্রকাশক হলুম—এর একটা কারণ, লেখকদের সাংসারিক অবস্থা একটুও ভালো করতে পারি যদি—তাঁদের মনকে যদি সংসারের দায়-দুর্ভাবনার হাত থেকে একটুও মুক্ত রাখতে পারি, এই জন্য! সেইজন্যই কোনো লেখক টাকা চাইলে আমি কখনো তা দিতে ওজর-আপত্তি তুলি না! প্রকাশক ছাড়া লেখকের বন্ধুই বা আর কে আছে!

দীপ্তি কহিল,—আপনার বন্ধুর মাসিক পত্রের খপর কি?

ক্ষিতীশ কহিল,—সে শুধু তার কল্পনা নিয়েই আছে! মনের মত আয়োজন না হলে বার করবে না। তার পর দেখুন, শুধু গ্রাহকের চাঁদায় মাসিক-পত্র চলে না, চলতে পারে না। যদি বিজ্ঞাপন জোগাড় করতে পারে প্রচুর, তাহলেই কাগজ চলে! বিজ্ঞাপন জোগাড় করতে হলে ভালো ক্যান্‌ভাসার

চাই—তেমন বিশ্বাসী ক্যান্‌ভাসার পাওয়া খুবই শক্ত ব্যাপার।—বিমল এ-সম্বন্ধে কিছু বলেনি?

দীপ্তি কহিল,—না, চার-পাঁচদিন তিনি আসেন-নি এধারে!

ক্ষিতীশ কহিল,—আসেনি!...আমার সঙ্গেও তার দেখা হয়-নি। শুনলুম, সে নাকি 'মন্দাক্রান্তার' প্রকাণ্ড সমালোচনা লিখে ফেলেছে একটা!

দীপ্তি কহিল,—বিমলবাবুর মতামত একটু অদ্ভুত রকমের! সব-তাতে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন!

ক্ষিতীশ হাসিয়া কহিল—ওর সবই অদ্ভুত! মাসিকপত্র নিয়ে এই তো ক্ষেপে উঠেচে—হঠাৎ কোনদিন যদি শুনি যে মাসিক-পত্রের ওপর খাপ্পা হয়ে সে বোতামের কারখানা খুলেছে তো তাতে আশ্চর্য্য হবো না আমরা, তার বন্ধুর দল, যারা ওকে চিনি!...

দীপ্তি হাসিয়া কহিল,—ভারী মজা তো! অথচ মাসিক-পত্র নিয়ে কি আলোচনাই যে করেন!

ক্ষিতীশ কহিল,—আলোচনা না হলে ও থাকতে পারে না! সারা জীবন ধরে একটা না একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেই! যাক্—কারো আড়ালে তার সম্বন্ধে এ সব আলোচনা করাও ঠিক নয়!...

— ১৩ —

বিমল যে কত-বড় অদ্ভুত জীব, দীপ্তি আর এক রকমে শীঘ্রই তার পরিচয় পাইল।

সেদিন সন্ধ্যার দিকে মেঘ খুব কালো হইয়া ঘনাইয়া আসিল! পৃথিবীর বুক বেড়িয়া একটা শীতল পরশ জাগিয়া উঠিয়াছিল। মেঘের আঁধারে-ঘেরা পথের উপর দিয়া পথিকের দল অধীর আগ্রহে গৃহে ফিরিতেছিল। দীপ্তি তার ঘরের জানলা খুলিয়া সামনে ঐ পথের পানেই উদাস দৃষ্টি মেলিয়া বসিয়া ছিল—এমন সময় বিমলের গাড়ী আসিয়া হাজির। বিমল গাড়ী হইতে নামিয়া ভিতরে আসিল...হাতে তার মস্ত একটা কাগজের মোড়ক। বিমল আসিয়া ডাকিল—সান্থ...

সান্ত্বনা বিছানার উপর পুতুল পাড়িয়া বসিয়া খেলা করিতেছিল; বিমলের আহ্বানে ফিরিয়া চাহিল।

বিমল কহিল,—এই ছাখো, তোমার বাজনা এনেছি।

কাগজের মোড়ক খুলিয়া বিমল একটা পিয়ানোফোর্ বাহির করিয়া বাজাইতে লাগিল। সান্ত্বনা মহাখুসী হইয়া বলিয়া উঠিল,—দিন্, দিন্ আমায়···

বিমল বাজনাটা তার হাতে দিয়া কহিল,—বাজাও খুব... তার পর গান শিখবে যখন, তখন একটা বড় বাজনাও দেবো, প্রাইজ—কেমন?

সান্ত্বনা কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসে কহিল,—আচ্ছা!

দীপ্তি কহিল,—আপনি কেন এ কৃতজ্ঞতা এত বাড়িয়ে তুলছেন, বিমল বা ?

বিমল কহিল,—তার মানে ?

দীপ্তি কহিল,—নয় তো কি ! নিত্যি এই উপহার—কেন মিছে এত পয়সা খরচ করেন !

বিমল কহিল,—মোটেই এত নয় !···বাজে পয়সা অনেক দিকে ঢের বেশী খরচ হচ্ছে, এবং সেগুলো একেবারেই বাজে !··· এ তো খুবই সামান্য-কিছু, এতে যদি শিশুর মুখে হাসি ফোটানো যায় তো মূল্য পেলুম কতখানি, ভাবুন তো !···মানুষের বাল্য-জীবনটাও এ-সবের অভাবে নেহাৎ ফাঁকা থেকে যায় না হলে···

দীপ্তি কহিল,—কিন্তু আমি ওকে প্রাচুর্য্যের মধ্যে মানুষ করতে চাই না মোটে !···প্রাচুর্য্য থেকেই অভাবের সৃষ্টি হয় আর এই অভাব থেকেই মনে যা-কিছু বেদনা, অনুযোগ আর হাহাকার !

বিমল কহিল,—সে অভাবের সম্ভাবনা যার থাকবে না, তার···?

বিমল কথাটা সম্পূর্ণ না করিয়া উত্তরের প্রতীক্ষায় দীপ্তির পানে চাহিল।

দীপ্তি কহিল,—তা' কেউ বলতে পারে কখনো ! রাজ-রাজেন্দ্রানীর ছেলে-মেয়ের ভবিষ্যৎও সমান অনিশ্চিত যে—এ তো গরীবের মেয়ে !

বিমল একটু স্তব্ধ থাকিয়া দীপ্তির পানে চাহিয়া কহিল,—আপনার এ দারিদ্র্য তো স্বেচ্ছাকৃত···

দীপ্তি একটু বিস্ময়ের স্বরে কহিল,—কেন ?

বিমল একবার আকাশের পানে তাকাইল, পরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—তা নয় তো কি !

দীপ্তি এ কথার অর্থ না বুঝিয়া অবাক হইয়া বিমলের পানে চাহিল !...পাশের ঘরে সান্ত্বনা তখন পিয়ানোফোরে প্রচণ্ড এলোমেলো রব তুলিয়াছে !

বিমল কোন কথা কহিল না, দীপ্তিও নীরব···ঠিক এমনি সময়ে আকাশ ফাটিয়া ঝম্‌ঝম্ করিয়া শ্রাবণের ধারা নামিল। চারিদিক অন্ধকারে ঢাকিয়া গেল। দীপ্তি উঠিয়া আলো জ্বালিল! তারপর বিমলের পানে চাহিল,—ক্ষিতীশের সেদিনকার কথাটা তার মনে পড়িল, বিমলের সবই অদ্ভুত ! সত্যই তো,···খামকা কি তুচ্ছ কথা তুলিল, তুলিয়াই একেবারে চুপ !

দীপ্তি কহিল,—কি ভাবছেন এত বিমল বাবু ?

বিমল যেন কোন্ মহাধ্যানে তন্ময় ছিল ! দীপ্তির কথায় ধ্যান ভাঙিয়া দুই নেত্র বিস্ফারিত করিয়া দীপ্তির পানে চাহিল, পরে শান্ত স্বরেই কহিল,—আপনার কথাই ভাবছিলুম···

—আমার কথা ! দীপ্তি হাসিয়া উঠিল।

সে হাসিতে চমকিয়া বিমল কহিল,—হ্যাঁ, আপনারই কথা!...আপনার কথা সেদিন সব শুনলুম, এক জায়গায় !

আশ্চর্য্য রোমান্স কিন্তু!···শুনে বড় দুঃখ হলো, আহা—অরুণ বাবু যদি মারা না যেতেন!

দীপ্তির প্রাণের কোণে সুপ্ত বেদনা এ কথায় এক নিমেষে তার জর্জ্জর স্মৃতি মাখিয়া মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিল! বুকের মধ্যটা ঐ বাহিরের মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মতই জমাট শোকে আচ্ছন্ন হইল।

বিমল কহিল,—আপনার মতের সঙ্গে আমারো মত মেলে খুব! সত্যই তো, বিবাহ কি!···যার সঙ্গে যার মনের মিল হবে, তার সঙ্গেই মনে-প্রাণে মিশে যাবে!···তারপর অতৃপ্তি ধরলো যদি তো ব্যস, মুক্ত, স্বাধীন, দোসরা পথে চলে যাও!··· এই জন্যই আমি আজ পর্য্যন্ত বিয়ের ফাঁশে ধরা দিই নি! তাতে কি অনুতাপ হয়েছে কোনদিন?...মোটে না! অথচ I have known sweet company.

বিমলের কথায় দীপ্তি শিহরিয়া উঠিল। তার সে সদ্য-জাগরিত শোকস্মৃতি এ কথায় আহত হইয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। সে নির্ব্বাক বিস্ময়ে বিমলের পানে চাহিল।

বিমল বেশ সতেজেই কহিল,—তাই তো বলছিলুম, আপনার এ দারিদ্র্য-দুঃখ স্বেচ্ছাকৃত!···আপনি ইঙ্গিত করলে রাজার ঐশ্বর্য্য আপনার পায়ে লুণ্ঠিত হয়ে পড়ে যে···শুধু একটা ইঙ্গিতের ওয়াস্তা!

দীপ্তির মন জ্বলিয়া উঠিল। সরোষ কণ্ঠে সে কহিল,—বিমল বাবু···

বিমল কহিল,—আপনার উপন্যাসে এই স্ত্রী-লভের এমন নিপুণ প্রশ্রয়ও আপনি দিয়েছেন যে, আমি ভাবছিলুম,…এর মধ্যে introspectionটা সবই জীবন্ত !…

দীপ্তি কহিল,—আমায় মাপ করবেন বিমল বাবু, আমার উপন্যাস তাহলে আপনি মোটেই বোঝেন নি…

বিমল কহিল,—তা না বুঝলেও আপনার পরিচয় পেয়ে আপনাকে বুঝেচি…

দীপ্তি কহিল,—তাও বোঝেন নি !

বিমল কহিল,—আমি আপনার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না !…তবে অনুমতি করেন যদি তো আপনার জীবনটিকে এই দারিদ্র্য আর দুঃখ-কষ্টের আবহাওয়া থেকে একেবারে প্রাচুর্য্য আর স্বাচ্ছন্দ্যে ঘিরে দি…প্রকাণ্ড প্রাসাদ, দাসী, চাকর, জুয়েলারি, কোনখানে কোন অভাব থাকবে না! আর সানুও রাজকন্যার আদরে মানুষ হবে !…

এ কথার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত দীপ্তির মনে কাঁটার মত বিঁধিল। তবু সে কাঁটার আঘাত গোপন করিয়া সে কহিল,—এ তো ইন্দ্রজালের সৃষ্টি হবে, দেখচি তাহলে। কিন্তু আপনি যে আমার জন্য এতখানি করবেন, এর কারণ…

বিমল কহিল,—কারণ বলচি…আর, এই জন্যই গোপনে আপনার সঙ্গে আমার কতকগুলো কথা ছিল। অনেক দিন থেকেই বলবো, ভাবছিলুম,—কিন্তু ক্ষিতীশের সামনে

কথা পাড়া কতটা ঠিক হবে, বুঝতে পারছিলুম না

বলেই বলিনি। এখন ক্ষিতীশ বাইরে গেছে,—তাই বলতে এসেছি!

দীপ্তি কহিল,—বলুন!...কিন্তু আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি, আমার সঙ্গে আপনার গোপন এমন কি-বা কথা থাকতে পারে!... তারপর ক্ষণেকের জন্য স্থির দৃষ্টিতে বিমলকে লক্ষ্য করিয়া হাসিয়া কহিল,—আপনিও কি পাব্লিশিং হাউস খুলছেন তবে—দুই বন্ধুতে পাছে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাধে, তাই এ গোপনতা!

বিমল কহিল,—তা নয়, তবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বটে!

দীপ্তি কহিল,—তাহলে পাব্লিশিং হাউসই খুলছেন, মাসিক পত্র ছেড়ে!...আমার গর্ব্ব বোধ হচ্ছে, আমার লেখা এমন যে তার জন্য দু'জনের এই রেষারেষি...

বিমল গম্ভীর স্বরে কহিল,—রেষারেষিই বটে!...তবে লেখার জন্য নয়...কারণ সম্প্রতি পাব্লিশিং হাউস খোলবার বাসনা আমার মোটেই নেই।

দীপ্তি কহিল,—তবে...?

বিমল কহিল,—সেই কথাই বলচি...পয়সার জন্য খেটে লিখে, কাজ করে, যে ভাবে আপনি শরীরটাকে ক্ষয় করেছেন, এ আমার ভালো লাগচে না! তুচ্ছ পয়সার জন্য আপনার এই কষ্ট—এতে আমার প্রাণে ভারী বাজে...অথচ এই পয়সাই আমি কি-ভাবে না বাজে খরচ করে উড়িয়ে দিচ্ছি...

দীপ্তি কহিল,—আপনি আমার পরিচয় পেয়েছেন, বললেন না? তা যদি পেয়ে থাকেন, তাহলে এ কথাও জেনেছেন

যে, স্ত্রীলোকের এই আর্থিক দাস্য ঘোচাবার দিকে আমার আগ্রহ কতখানি!—আর আপনার সঙ্গে যে বন্ধুত্ব, তার মধ্যে এ পয়সার কথাই বা আনছেন কেন! পয়সা ভিক্ষা করাটাকে আমি হেয় মনে করি!

বিমল কহিল,—পয়সাটা ভারী নোংরা জিনিষ, সন্দেহ নেই। বন্ধুত্বের মধ্যে পয়সার কথা আনতেও নেই।...তবু এই পয়সা নাহলেও একদণ্ড চলে না!

দীপ্তি কহিল,—কিন্তু আপনার কাছে হাত না পেতেও আমার বেশ চলে যাচ্ছে! আর কখনো বোধ হয় আপনার কাছে পয়সার দুঃখের কথা আমি তুলিও-নি...তবে এ কথা আপনিই বা বলছেন কেন! নোংরা পয়সার কথা আমাদের এ বন্ধুত্বের মধ্যে নাই আনলেন!...

বিমল কোন জবাব না দিয়া মুগ্ধ নয়নে দীপ্তির পানে চাহিয়া রহিল। এই তেজস্বিতার পায়েই যে সে আপনাকে বিকাইয়া দিয়াছে!...

দীপ্তি কহিল,—আপনি রাগ করবেন না! আপনার কথাটা আমার কানে এমন অকস্মাৎ এসে বাজলো যে, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, এ কথা কেন আপনি তুলচেন!...

একটা ঢোক গিলিয়া বিমল কহিল,—তার কারণ...আমি আপনাকে ভালবাসি!...আমার গৃহে এসে সে গৃহের সব ভার নিয়ে আপনি তার অধীশ্বরী হয়ে বসুন...এইটুকু বলা

হইবামাত্র বিমল লক্ষ্য করিল, দীপ্তি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়াছে। তাই সে থমকিয়া তখনি আবার বলিল,—কেন থাকবেন না? যতদিন আপনার ভালো লাগে···বিবাহ নয়···শেষের দিকে বিমলের স্বর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

দীপ্তি কহিল,—আপনি আমায় ভালবাসেন···অতএব আপনার সঙ্গে আমার যেতে হবে! কিন্তু আপনি ভুলে যাচ্ছেন বিমলবাবু, আপনার যেমন একটা মন আছে,—যে-মন আমার জন্য অধীর, যে-মন আমায় গ্রাস করবার দুর্ব্বার লোভ আমার কাছে প্রকাশ করতে আপনাকে এতটুকু কুণ্ঠিত করছে না···তেমনি আমারো একটা মন আছে...তার দিক থেকে তো বিরূপতা উঠতে পারে...

বাধা দিয়া বিমল কহিল,—কেন তা উঠবে!...আপনি তো সমাজের সে-সব সঙ্কীর্ণ আচার মানেন না, মিলন সম্বন্ধে আপনার তো কোন কুণ্ঠাই নাই···

দীপ্তি কহিল,—আমার সম্বন্ধে এত বড় ভুল ধারণা আপনি করলেন কি করে! আমি শুনে আশ্চর্য্য হয়েছি...এত ছোট, এমন লঘু আমার মন···ছি!

বিমল কহিল,—কিন্তু অরুণ বাবুকে তো বিবাহ করেন নি জানি...আজ তিনিও বেঁচে নেই···

দীপ্তি কহিল,—তা নেই, কিন্তু তাঁর স্মৃতিতে আজো আমার মন ভরে আছে···

বিমল কহিল,—একটা তুচ্ছ স্মৃতি, যার কোন অস্তিত্ব নেই,

যে কোন সান্ত্বনা দেবে না, তৃপ্তি দেবে না—শুধু দুঃখই বাড়াবে...? আপনার এই তরুণ বয়স, জগতের তৃপ্তির পাত্র কানায় কানায় যখন ভরে আছে...

দীপ্তি কহিল,—আপনি যাকে তৃপ্তি বলছেন, সেটা হীন লিপ্সা—তাছাড়া আর কিছুই নয়। তুচ্ছ পশুর লিপ্সা! আর স্মৃতি?...মানি, তার কোন কায়িক অস্তিত্ব নেই, তবু যে-বন্ধু আমার জন্য প্রচণ্ড ত্যাগ মাথায় করে নেছেন, তাঁর প্রতি, তাঁর সে ত্যাগের স্মৃতির প্রতি আমার একটা কৃতজ্ঞতা আছে তো!

বিমল কহিল,—কিন্তু আমার এই প্রাণ-ভরা ভালবাসা—এই দান, এই ত্যাগ—আপনার সাস্থও আমার কাছে খুব আদরে-যত্নে থাকবে!...এ-সব বৃথা হবে?

দীপ্তি কহিল,—আপনি গোড়ায় ভুল করেছেন।...নারীর মনটা নিছক কবি-কল্পনা নয়, যে, তা নিয়ে যা-খুসী করবেন! ...আর পয়সার প্রলোভনে যে-নারী মনকে বিলিয়ে দিতে পারে, জানিনা কি-নামে তাকে অভিহিত করবো!...আপনি নারীর বন্ধু বলেই পরিচয় দিতেন না? তবে নারীকে নিজের খেয়ালের সামগ্রী, বাসনার পুতুল বলে ধরে নিলেন কি করে, তাই ভাবচি...! নারীর সঙ্গে বন্ধুত্বর মানে এ নয়, যে, তার শরীর-মন আয়ত্ত করবেন, তাকে ভোগের জন্য গ্রাস করবেন...

বিমল অপ্রতিভ হইল, লজ্জিতও হইল!...চুপ করিয়া সে বসিয়া রহিল!...তারপর সহসা একটা কথা আগুনের শিখার মত মনের মধ্যে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল! ঠিক...

তখনি দীপ্তির পানে চাহিয়া সে ব্যঙ্গ-স্বরে কহিল,—আপনি ক্ষিতীশকে ভালোবাসেন, আমি তা বুঝি।

দীপ্তি কহিল,—হ্যাঁ, বাসি।

বিমল কহিলেন,—ক্ষিতীশ তা জানে···?

দীপ্তি কহিল,—তিনি আমার বন্ধু! বন্ধুকে মানুষ ভালোই বাসে—আর সে কথা বিজ্ঞাপন দিয়ে তাকে জানাতেও হয় না কোনদিন!

বিমল কহিল,—তা নয়। ক্ষিতীশ বলে, আপনাকে বিবাহ করার সৌভাগ্য যদি কখনো তার হয়, তবেই সে বিবাহ করবে —না হলে জীবনে সে বিবাহ করবে না কখনো!

এ কথা শুনিয়া দীপ্তি নিমেষের জন্য বিমূঢ় স্তব্ধ হইয়া রহিল; তারপর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—তিনি বলেচেন এ কথা?

বিমল কহিল,—বলেছেন বৈ কি! তাই না আমি আমার কথা আপনাকে বলবার অবসর খুঁজছিলুম···প্রতিদ্বন্দ্বিতা বুঝলেন!

দীপ্তি কোন কথা কহিল না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বিমল কহিল,—তাহলে আমার কোন আশা নেই···?

—না।

—বেশ! ক্ষিতীশ ভাগ্যবান···

বাধা দিয়া দীপ্তি বলিয়া উঠিল,—তিনিও যদি এমন আশা করে থাকেন, তাহলে তাঁর জন্য আমি দুঃখিত!···বলিয়া সে আবার নীরবে বসিয়া রহিল—বিমলও চুপ!

বাহিরে ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি পড়িতেছিল…ঘরের মধ্যে দু'জনে নীরব স্তব্ধ!…

সহসা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বিমল কহিল,—তাহলে উঠি…

—এই বৃষ্টিতে?

—তাছাড়া উপায়! বিমল উঠিল।

দীপ্তি কহিল,—দেখুন, নারীর সম্বন্ধে একটু ভালো ধারণা করতে শিখুন—তার বন্ধুত্বের সুযোগে তাকে হীন অপমানে লাঞ্ছিত করবেন না…নারীকে ভোগের বস্তু বলেই ভাববেন না। নারী সহায়হীনা হলেই সুলভ হয় না—এ কথাটাও মনে রাখবেন!…

বিমল ফিরিয়া দীপ্তির পানে চাহিল।

দীপ্তি কহিল,—এই বৃষ্টিতে আপনার ওঠবারো এমন প্রয়োজন দেখচি না!…লজ্জা হয়েছে? অনুতাপ হয়েছে?…তার কারণ নেই! আমি তো আমাকে চিনি—আপনার কথায় এতটুকু বিচলিত হইনি। আপনি চান যদি তো আমি আপনার বন্ধুত্বকে এখনো বরণ করে নিতে প্রস্তুত আছি। আজকের এ কথা একটা স্বপ্ন বলেই মনে করবো…

বিমল কহিল,—কিন্তু আমি যে জীবনে আমার এ দুর্ব্বলতার কথা ভুলতে পারবো না…

দীপ্তি কহিল,—তাহলে আমাদের বন্ধুত্ব এইখানেই শেষ…?

বিমল স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া পরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—আমি যদি আমার দুর্ব্বলতাকে কোন দিন ক্ষমা করতে পারি, তাহলে আপনাকে এসে তা জানাবো এবং সেদিন আবার বন্ধুত্ব স্থাপন করবো।...আজ আর দাঁড়াতে পারচি না, চললুম !

— ১৭ —

এর পর পাঁচ-সাত দিন অবধি ক্ষিতীশেরও দেখা নাই। কবে তার এলাহাবাদ হইতে ফিরিবার কথা !

দীপ্তি ভাবিল, কেন সে আসে না! এই মেঘলা দিনে সন্ধ্যার ক্ষণটুকু তার অভাবে দীপ্তির খুবই নির্জ্জন, নিঃসঙ্গ মনে হয়! আকাশ যখন মেঘে ভরিয়া ওঠে, অন্ধকার যখন ঘন হইয়া চারিধার ঢাকিয়া ফেলে, দীপ্তির মন তখন সে অন্ধকারের তলায় কোথায় যে চাপা পড়িয়া হাঁপাইয়া ওঠে !...কেন সে আসিতেছে না? এখনো ফেরে নাই ?...

সেদিন দুপুরবেলা দীপ্তি ক্ষিতীশের অফিসের দিকে চলিল, তার সংবাদ লইবার জন্য। প্রভা শ্বশুর-বাড়ী গিয়াছে,—কাজেই প্রভার সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা নাই! হঠাৎ ক্ষিতীশের সন্ধানে তার বাড়ীতে যাওয়াও ঠিক মনে হইল না!

অফিসে ক্ষিতীশ তখন কাজে ব্যস্ত, দীপ্তি আসিয়া কহিল,—এই যে আপনি!...বাঃ! আর আমি ভাবচি...বেশ লোক তো!...কবে ফিরলেন ?

ক্ষিতীশ রুদ্ধ নিশ্বাসে কহিল,—দিন পাঁচেক হলো, ফিরেছি···

দীপ্তি কহিল—আমার ওখানে যান্‌নি যে?

ক্ষিতীশ কহিল,—ক'দিন এখানে ছিলুম না,কাজেরও বেগোচ হয়ে রয়েছে,—তাই যেতে পারছিলুম না...

দীপ্তি কহিল,—আজ একবার সময় করে যাবেন? কতকগুলো কথা আছে...

ক্ষিতীশ কহিল,—যাবো।...আপনার বই কতদূর?

দীপ্তি কহিল,—শেষ হয়েছে।...একবার পড়ে দেখবেন ..

ক্ষিতীশ কহিল,—দেখবো বৈ কি।···এবার আপনার বইখানির বাইণ্ডিং যা করবো, একেবারে নতুন রকমের। বিলিতী বইয়ের মত তেমন বাঁধানো কোনো বাংলা বই এ-পর্য্যন্ত বেরোয় নি।

দীপ্তি কহিল,—সে আপনার যা-পছন্দ হয়, করবেন! কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করছিলুম...

ক্ষিতীশ মুখ তুলিয়া কহিল,—কি?

দীপ্তি কহিল,—বই বিক্রী হচ্ছে কেমন?

ক্ষিতীশ কহিল,—মন্দ নয়!···আপনার উপেক্ষিতার বিক্রী সব-চেয়ে বেশী···

দীপ্তি চলিয়া গেল। তারপর সন্ধ্যার সময় ক্ষিতীশ দীপ্তির গৃহে আসিল! দীপ্তি তখন সান্ত্বনাকে কোলের কাছে লইয়া রূপকথার গল্প বলিতেছে। সদ্য-বৃষ্টি-ধোওয়া গাছপালার উপর

মেঘ-ভাঙা আকাশের মধ্য হইতে চাঁদের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না আসিয়া লুটাইয়া পড়িয়াছে।

ক্ষিতীশ আসিয়া কহিল,—কি সান্থু, গল্প শুনছো?

সান্ত্বনা কহিল,—হ্যাঁ, শুনুন না, রাজপুত্তুর কি-রকম চালাকি করে বেঁটে দৈত্যটাকে ঠকিয়ে রাক্ষসের পুরীতে ঢুকলো!... মাগো, ভয় করে না? চারদিকে রাক্ষসগুলো মুলোর মত দাঁত বের করে দাঁড়িয়ে, হাতে সব ঢাল-তলোয়ার—রাজপুত্তুরের কি সাহস!

ক্ষিতীশ কহিল,—রাজপুত্তুরদের ভয় থাকে না কিছুতেই!

সান্ত্বনা কহিল,—তা বলে রাক্ষসদের সামনে অমন করে যাওয়া—এ কেউ পারে?...আপনি পারেন?

হাসিয়া ক্ষিতীশ কহিল,—না সান্থু, রাক্ষসকে আমি ভারী ভয় করি!

সান্ত্বনা হাসিয়া কহিল,—শুনুন না কাণ্ড! তারপর কি, মা...?

দীপ্তি কহিল,—আজ এই অবধি থাক্ সান্থু, আজ খেলা করগে,...আমরা একটু কাজ করি...

সান্ত্বনা মুখখানি ম্লান করিয়া বলিল,—কিন্তু বড্ড শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে মা...

ক্ষিতীশ কহিল,—গল্পটা শেষ করুন নয়...আমি বসছি!... আমিও শুনি আপনার গল্প...

দীপ্তি কহিল,—শেষ করবো?...

ক্ষিতীশ কহিল,—শেষই করুন! মাসিকে ক্রমশঃ-উপন্যাস

গুলো কি রকম জ্বালায়, জানেন তো !...পরের সংখ্যার জন্মে মনে এতটুকু সোয়াস্তি থাকে না !...সে দুঃখ আর এতটুকু সান্তুকে দেন কেন ?

দীপ্তি কহিল,—বেশ, তবে শেষ করে দি...

দীপ্তি রাজপুত্রের কথা বলিতে লাগিল,—আর সান্তু বিস্ফারিত চোখে ছোট্ট প্রাণের সমস্ত আগ্রহটুকু লইয়া রাক্ষসের গল্প শুনিতে লাগিল !

গল্প শেষ হইলে মার কথায় সান্ত্বনা চলিয়া গেল,—পাশের ঘরে গিয়া সে খেলনা পাড়িয়া বসিল। সে চলিয়া গেলে দীপ্তি ক্ষিতীশের পানে চাহিল—ক্ষিতীশ কি-একটা ইংরাজী বইয়ের মধ্যে তখন সুগভীর মনঃসংযোগ করিয়াছে ! দীপ্তি বহুক্ষণ তার পানে চাহিয়া রহিল—এই তরুণ যুবার স্বাস্থ্যের স্বচ্ছতা, সুস্থ মনের সহজ আনন্দ-জ্যোতির রেখা মুখে-চোখে প্রদীপ্ত উজ্জ্বল বর্ণে ফুটিয়া রহিয়াছে ! দীপ্তি একটা নিশ্বাস ফেলিল, তারপর কহিল,—আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।

ক্ষিতীশ চোখ তুলিয়া চাহিল—চাহিতেই দুইজনের দৃষ্টি মিলিল। ক্ষিতীশ দেখিল, দীপ্তির দৃষ্টি যেন গাঢ় বেদনায় ভরা ! তার সারা অঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল—বিমলের কাছে সে কতকগুলা কথা শুনিয়াছে, তার কতটা আসল, আর তার সঙ্গে কতখানি কল্পনা যে জুড়িয়া দিয়াছে...! সে কথা শুনিয়া ক্ষিতীশ বিরক্ত হইয়াছে ! রাস্কেল ! তার সম্বন্ধে কোন কথা দীপ্তির কাছে তুলিবার অধিকার তাকে কে দিয়াছিল ! তার মনের অতি-গোপন

সাধ-আশার কথা…সে নিজে এ কথা কোন দিনই একটা অস্ফুট নিশ্বাসের উচ্ছ্বাসেও তা প্রকাশ করিত না!

দীপ্তির কথায় ক্ষিতীশ দীপ্তির পানে চাহিল,—তার মুখে সহসা কোন কথা ফুটিল না!

দীপ্তি কহিল,—বিমলবাবু একদিন এসেছিলেন এর মধ্যে—এসে একটু বিপ্লব বাধিয়ে গেছেন ..

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ক্ষিতীশ কহিল,—আমি শুনেচি সে কথা।…

দীপ্তি কহিল,—শুনেচেন!…আশ্চর্য্য! স্ত্রীলোক সম্বন্ধে এঁরা ভাবেন কি, বলুন তো! পুরুষের সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক স্ত্রীলোকের থাকতেই হবে!…

ক্ষিতীশ কহিল,—ও কথা ভুলে যান! আমি তাকে সতর্ক করে দিছি—সে আর কখনো আপনার দোরে আসার স্পর্দ্ধা রাখবে না!…

দীপ্তি কহিল,—তার জন্যে আমি কিছু মনে করিনি…তবে দুঃখ লাগে এই যে, স্ত্রীলোকের মাথার উপর যদি কোন পুরুষ না থাকে, অর্থাৎ স্ত্রীলোক যদি কারো সম্পত্তি হয়ে না থাকে, তাহলে পুরুষ তাকে এমন সুলভ ভাবে কি করে!…এর মধ্যে এই কথাটাই আমার বুকে সব-চেয়ে বেজেছে…

ক্ষিতীশ কহিল,—এটা পুরুষের আদিম বর্ব্বরতার চিহ্ন…বলে নারীকে সে প্রথম গ্রহণ করেছিল, এবং নিজের ভোগের সামগ্রী বলেই জেনে এসেছে, বরাবর…তাই!

দীপ্তি কহিল,—নারীর যে একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকতে পারে ঠিক পুরুষের মতই—এ কথাটা পুরুষ একেবারে ভাবেও না, আশ্চর্য্য !

ক্ষিতীশ কোন কথা কহিল না। দীপ্তিও চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ক্ষিতীশের মনের মধ্যে একটা কথা প্রবলভাবে ঝাঁকিয়া উঠিতেছিল, প্রকাশের পথ খুঁজিয়া সে যেন অধীর আকুল হইয়া উঠিতেছিল···

কোনমতে সে বলিয়া ফেলিল,—আমার সম্বন্ধেও সে নাকি অনেক অপমানের কথা বলে গেছে...তার জন্য ক্ষমা করবেন...

দীপ্তি ক্ষিতীশের পানে চাহিল, তারপর শান্তস্বরে কহিল,—হ্যাঁ।···কথাটা...?

ক্ষিতীশ কহিল,—তার স্পর্দ্ধা আর অবিনয়ের সীমা নেই !... এ কথা তাকে কোনদিন বলিনি আমি,—এ তার নিজের মন-গড়া। এ কথা নিয়ে আমার সঙ্গে অনেকদিন সে তর্ক করেছে... আপনার সম্বন্ধে কোন আলোচনা আমি সহ্য করিনি, তাই সে নিজে থেকে ঐ সব কথা গড়ে নিয়েচে···

দীপ্তি কহিল,—তাহলে ওটা মিথ্যাই...?

ক্ষিতীশ চট্ করিয়া কোন জবাব দিতে পারিল না। সে মাথা নামাইয়া নীরবে বসিয়া রহিল !

দীপ্তি কহিল,—আশা করি, আমাদের বন্ধুত্ব চিরদিন অম্লান থাকবে, অটুট থাকবে···

ক্ষিতীশ কহিল,—আমারো প্রাণের তাই একান্ত কামনা…। এর মাঝে কোন ঝড় যেন না বয়, কোন স্বার্থ যেন না আসে…।

এ কয়দিন দীপ্তি প্রভার কাছে যায় নাই। প্রভা শ্বশুর-বাড়ী গিয়াছিল রংপুরে। সেখানে প্রায় মাসখানেক থাকিয়া প্রভা ফিরিয়া দীপ্তিকে চিঠি লিখিয়া পাঠাইল,—

বড় দিদি আমি ফিরিয়াছি! আপনি কাল আসিবেন। কাল আবার গান শিখিব। ইতি

স্নেহের প্রভা

চিঠি পাইয়া দীপ্তি যথাসময়ে প্রভাকে গান শিখাইতে গেল। প্রভা কহিল,—আমার বড় মামীমার কাছ থেকে রবিবাবুর দুটো নতুন গান শিখে এসেচি, দিদি…শুনুন তো!

প্রভা গাহিল,—

তার বিদায়-বেলার মালাখানি
আমার গলে রে
দোলে দোলে বুকের কাছে
পলে পলে রে।…

দীপ্তি নিথর নিস্পন্দ হইয়া গান শুনিতে লাগিল। গানের সুরে কথায় তার বুকটা একেবারে তোলপাড় করিয়া উঠিল। এ গান সেই কোদার্মার ঘরে সে শেষ গাহিয়াছিল—অরুণের সামনে! গান শুনিয়া অরুণের দুই চোখ ছলছলিয়া উঠিয়াছিল! অরুণ বলিয়াছিল,—এ গান কেন গাইছ দীপ্তি? বিদায় বেলার

তো দেরী আছে ? মিলনের কথা যদি কিছু জানা থাকে তো তাই গাও...। তারপর···

তার বুকের মধ্যে দীর্ঘনিশ্বাস প্রলয়ের ঝড়ের মত ফুঁসিয়া ফুলিয়া উঠিল। প্রভা গাহিতেছিল—

দিনের শেষে যেতে যেতে
পথের পরে
ছায়াখানি মিলিয়ে দিল
বনান্তরে
সেই ছায়া এই আমার মনে,
সেই ছায়া ঐ কাঁপে বনে
কাঁপে সুনীল দিগঞ্চলে রে !

কি বেদনাই যে এ গানের সুরে ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল ! এই ইট-কাঠের বাড়ী, এই সজ্জিত ঘর—এ-সব দীপ্তির চোখের সামনে হইতে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল !···মনের মধ্যে নিমেষে জাগিয়া উঠিল সেই সবুজ শ্যামল বনের আড়াল, সেই ধূমল মেঘের নীচে দূরে-দূরে ছায়ার মত পাহাড়ের গা...আকাশে সেই সজল মেঘের আবরণ···কে যেন বনের গণ্ডী টানিয়া সমস্ত পৃথিবীটাকে এতটুকু করিয়া ফেলিয়াছে !...তবু সেই ছোট গণ্ডীটুকুর মধ্যেই কোথায় ফাঁক পাইয়া তার জীবনের যা-কিছু সুখ সেখান দিয়া সরিয়া পলাইয়া গিয়াছে !...তার সে সুখ-স্বপ্নের ছায়াটুকু ঐ বনান্তরেই মিলাইয়া গেছে···যাইতে যাইতে অমনি ঐ পথের পরে !···দীপ্তির দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল।

গান শেষ করিয়া প্রভা কহিল,—এ গানটা জানেন আপনি?

দীপ্তি ঘাড় নাড়িয়া কহিল,—জানি।

প্রভা কহিল,—গান্ না…এ সুর শিখেছি বটে,—কিন্তু এতে ভাব আরো যেন ফোটানো যায়! এ সুর প্রাণে তেমন লাগচে না যেন…

দীপ্তি কহিল,—খোঁচগুলো ঠিক হচ্ছে না।

প্রভা কহিল,—রবিবাবুর গানের মজাই ঐ। স্বরলিপি আছে, তবু তাঁর নিজের সুরটুকু তা থেকে ঠিক আয়ত্ত করা যায় না! সকলের মুখে রবিবাবুর গান এক-রকমও শুনি না। খুব উঁচুদরের আর্টিষ্ট আর ভাবুক না হলে রবিবাবুর গানে ঠিক প্রাণটুকুও কেউ জাগিয়ে তুলতে পারে না!...এই দেখুন না, আপনি যেমন গান,—তেমন তো আর কারো গলায় খোলে না।

দীপ্তি কহিল,—পাগল!…আচ্ছা, আমি ও গানটি গাইছি, শোনো।…স্বরলিপি থেকে intonation ঠিক করা যায় না।

দীপ্তি ঐ গানই গাহিতে বসিল।…তার সুরে কি যে ছিল,…সমস্ত আকাশ-বাতাস এক নিমেষে করুণ সুরের প্লাবনে ভরিয়া উঠিল! সে সুরে বুক-ভাঙা এমন বেদনা, এমন হাহাকার ফুটিয়া বাহির হইল যে বিদায়-ক্ষণের করুণ বিষাদ যেন সে সুরে দুলিতে লাগিল!...

সেদিন দীপ্তির বিদায় লইবার সময় প্রভা কহিল,—একটা কথা আছে, দিদি...

দীপ্তি উদ্‌গ্রীবভাবে চোখ তুলিয়া চাহিল কহিল,—কি কথা প্রভা ?

প্রভা কহিল,—দাদার সম্বন্ধে...

দীপ্তি চমকিয়া উঠিল। দাদার সম্বন্ধে...ক্ষিতীশবাবু...! কি কথা ? তাঁর কোন অসুখ হইয়াছে নাকি ?

প্রভা কহিল,—না।

দীপ্তি কহিল,—তবে ?

প্রভা কহিল,—দাদার জন্যে বাবা-মা কারো মনে সোয়াস্তি নেই !...

দীপ্তি নির্ব্বাক বিস্ময়ে প্রভার পানে চাহিয়া রহিল। প্রভা কহিল,—দাদার বিয়ের সব ঠিক করেছেন ওঁরা...দাদা কিন্তু এমন বেঁকে বসেছে বিয়ে করবে না বলে...সে একেবারে দুর্জ্জয় গোঁ!...

তবে কি...? একটা অতি-ক্রূর সংশয় কাঁটার মত দীপ্তির বুকে খচ্‌ করিয়া বিঁধিল !—দুই হাতে সবলে সে কাঁটাটাকে চাপিয়া দীপ্তি কহিল,—বিয়েয় আপত্তি কেন ?

প্রভা ক্ষণেক স্তব্ধ হইল, পরে কহিল,—বলবো...?

—বল, প্রভা...

দীপ্তি বেশ সতেজেই তাকে প্রশ্ন করিল।

প্রভা কহিল,—দাদা কিছুতেই বলতে চায়না ! শেষে অনেক করে আমি জেনেছি...

—কি ?

দীপ্তি ব্যাকুল আগ্রহে প্রভার পানে চাহিল।

প্রভা একটু কুণ্ঠিতভাবে কহিল,—দাদা···বলিয়াই সে দীপ্তির পানে চাহিল, পরে কহিল,—আপনাকে দাদা কোন কথা বলেনি ?

—কি কথা ?

—এই বিয়ে-থার কথা !

—না।

আসল কথাটা প্রভা কিছুতেই বলিতে পারিল না। বলা যায় না ! শেষে বুদ্ধি করিয়া সে কহিল,—আপনি দাদাকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন, বিয়েতে তার আপত্তি কিসের !

তাকে কেন এ কথা জিজ্ঞাসা করার ভার, দীপ্তি আভাষে তাহা বুঝিল, বুঝিয়া কহিল,—কিন্তু আমাব পক্ষে এ কথা জিজ্ঞাসা করা কি ভালো দেখাবে, প্রভা ?···কোন্ অধিকাবে আমি এ কথা জিজ্ঞাসা করবো ?

প্রভা কহিল,—আপনাকে দাদা শ্রদ্ধা করে,···

দীপ্তি কহিল,—আচ্ছা, যদি তিনি আমার ওখানে যান, তাহলে জিজ্ঞাসা করবো···

দীপ্তি চুপ করিল, প্রভাও ইহার পর কি বলিবে, ভাবিয়া না পাইয়া চুপ করিয়া রহিল। বহুক্ষণ এমনি নীরব থাকিবার পর দীপ্তি উঠিল, উঠিয়া ডাকিল—প্রভা...

—কেন দিদি...?

গলাটা একটু পরিষ্কার করিয়া লইয়া দীপ্তি বলিল,—আমি

যা ভাবচি যদি তাই হয়, তাহলে তোমরা ভুল বুঝেচ। আমার দিক থেকে কোনো-কিছু নেই, শুধু বন্ধুত্ব!···তবে উনি যদি এমন কোন কথা ভেবে আপনাদের কষ্ট দিয়ে থাকেন, তাহলে সে খুবই দুঃখের কথা, সন্দেহ নেই!···যাই হোক, তিনি আমার বন্ধু, তোমাদেরো আমি প্রাণের স্বজন বলে ভাবি, এ রকম ভুল-চুক আমাদের মধ্যে থাকা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়!···তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, প্রভা, আমার দিক থেকে কোনো দুঃখ পেতে হবে না তোমাদের!

কথাটা বলিয়া উত্তরের প্রতীক্ষামাত্র না করিয়া দীপ্তি চলিয়া গেল।

— ১৮ —

দীপ্তির মনে ধিক্কার জাগিতেছিল! পুরুষের বন্ধুত্ব কি এখানে এমন দুর্লভ! অন্তরঙ্গতা করিতে গেলে কি ঐ একই ধারায় মন তাদের ছুটিয়া চলিবে! ছি! দীপ্তি ভাবিল, ক্ষিতীশকে সে একটা চিঠি লিখিবে!···

কাগজ লইয়া দীপ্তি তখনি চিঠি লিখিতে বসিল।···দুই-চারি ছত্র লিখিয়া ভাবিল, তাই তো, সহসা এমন হীন সন্দেহ সে কি বলিয়া করিতেছে! হয়তো ক্ষিতীশের বিবাহ না করার অন্য কারণ আছে!···

চিঠিখানা সে ছিঁড়িয়া ফেলিল,—ছিঁড়িয়া আকাশের পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

বাগানে মিস্ত্রীদের কোলাহল উঠিয়াছিল। মিস্ত্রীর দল বড় বাড়ীটা সারাইতে আসিয়াছে! গাড়ী-গাড়ী চুণ-বালি আসিতেছে! দীপ্তি ভাবিল, ক্ষিতীশকে একবার আসিতে বলা যাক—তার মুখে কারণটা শুনিয়াই ব্যবস্থা করা যাইবে! সে তখন ক্ষিতীশকে শুধু লিখিয়া দিল,—আপনি একবার আসিবেন, বড় দরকার। তারপর চিঠিখানা ডাকে পাঠাইল।

পরের দিন দুপুরবেলায় ক্ষিতীশ আসিয়া হাজির হইল। দীপ্তি তখন সান্ত্বনাকে পড়াইতেছিল। ক্ষিতীশ কহিল,—সান্নুকে ইস্কুলে দিন না!

দীপ্তি কহিল,—তাই ভাবছিলুম।...ঐ যে ক্যাথরিন ইনষ্টিউট রয়েছে না...সার্কুলার রোডে? সেইখানে দেব। ওখানে বাইবেল পড়ায় না, আর কোন দিকে গোঁড়ামিরও কিছু নেই। সেলাই, গান, রান্না, এ-সবগুলোও শেখায়!...আমি যদি ওর পিছনে সমস্ত সময়টুকু দিতে পারতুম, তাহলে স্কুলে দেবার কথা ভাবতুমও না। তা যখন পারি না, তখন স্কুলে দেওয়াই ঠিক।

ক্ষিতীশ কহিল,—বলেন তো, আমি নিয়ে গিয়ে ভর্ত্তি করে দিয়ে আসি!

দীপ্তি কহিল,—আপনাকে আর এ সামান্য ব্যাপারে কষ্ট দি কেন! আমিই নিয়ে যাবো'খন!

ক্ষিতীশ বসিল, বসিয়া সান্ত্বনাকে কহিল,—স্কুলে যাবে তো সান্নু? মন কেমন করবে না, মার জন্যে?

সান্ত্বনা হাসিয়া মাথা নাড়িয়া কহিল,—না।

দীপ্তি কহিল,—তুমি যাও, তোমার ছুটী।

সান্ত্বনা বই তুলিয়া রাখিয়া বাগানে ছুটিল।

ক্ষিতীশ কহিল,—আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন কেন...কি দরকার, বলুন তো!

দীপ্তি একটা ঢোক গিলিয়া কহিল,—হ্যাঁ, দরকার আছে! দীপ্তি হঠাৎ গম্ভীর হইয়া উঠিল।

ক্ষিতীশ দীপ্তির এ গম্ভীর ভাব দেখিয়া অবাক হইল। সে বিস্ময়ে দীপ্তির পানে চাহিল!

দীপ্তি কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়া একেবারেই কহিল,—আপনার না কি বিবাহের কথা হচ্ছে? কাল শুনে এলুম···

ক্ষিতীশ লজ্জিতভাবে মাথা নত করিল, কোন জবাব দিল না।

দীপ্তি কহিল,—তা, আপনি নাকি বিবাহে ভীষণ আপত্তি তুলে সকলকে খুব কষ্ট দিচ্ছেন?

ক্ষিতীশ চকিতের জন্য চোখ তুলিয়া দীপ্তির পানে চাহিল, কহিল—বিয়েয় আমার মত নেই!

দীপ্তি কহিল,—মত নেই!···কেন শুনি?

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ক্ষিতীশ কহিল,—এ বেশ আছি, না? ···বিয়ে করলেই স্বাধীনতা যাবে, অনর্থক একটা মহা-দায়িত্বের ভারে অস্থির হয়ে উঠতে হবে।

দীপ্তি কহিল,—কিছুমাত্র না।···আর্থিক অবস্থা যার অস্বচ্ছল নয়, তার পক্ষে এ কথা খাটে, আপনার নয়...

ক্ষিতীশ কোন জবাব দিল না, মুখ নামাইয়া নীরবে বসিয়া রহিল। দীপ্তি তাকে বেশ করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া কহিল,—শুধু তাই...? না, আর কোন কারণ আছে?...একটু থামিয়া সে আবার কহিল,—আপনার মত অবস্থাপন্ন লোক যখন বিবাহ করতে চায় না, মা-বাপের অত্যন্ত আগ্রহ-সত্ত্বেও...তখন তার মধ্যে জটিল কোন কারণ থাকে—অন্ততঃ আমার তো তাই বিশ্বাস!...আপনি কি বলেন?

ক্ষিতীশ অত্যন্ত অপ্রতিভের মত মুখ তুলিল। তারপর ধীরে ধীরে কহিল,—না, এর আবার কারণ কি!

দীপ্তি কহিল,—এ কথা সত্য...আর, আমায় এ কথা বিশ্বাস করতে বলছেন?

ক্ষিতীশ কুণ্ঠিত হইল, মিথ্যা কথা এর কাছে!...না, এ তো ঠিক নয়। সে কহিল,—আমার ক্ষমা করবেন। যদি অন্য কোন কারণই থাকে, তা একান্ত গোপনীয়—সে কথা নাই বা শুনলেন!

সে সংশয় দীপ্তির বুকে আবার খচ্ করিয়া উঠিল। সে কহিল,—কিন্তু লোকে বোধ হয় আমাকই এর জন্য দায়ী করবে!

ক্ষিতীশ একেবারে যেন আকাশ হইতে পড়িল! সে গর্জ্জন করিয়া উঠিল,—আপনাকে দায়ী...! পরক্ষণেই নিজের সেই স্বরের তীব্রতা অনুভব করিয়া সে যেন মরমে মরিয়া গেল। স্বর মৃদু করিয়া সে কহিল,—আপনাকে কারা দায়ী করছে, জানতে পারি?

দীপ্তি কহিল,—ঠিক মুখের কথায় কেউ দাবী করেনি! তবে, আমার মনে হয়···বলিয়া দীপ্তি একেবারেই প্রশ্ন করিল,—আমায় আপনি বন্ধু বলে স্বীকার করেছেন, বন্ধুর কাছে গোপন কথা প্রকাশ করতে, আশা করি, আপনার কোনো আপত্তি হবে না!···বলবেন কি আমায় সে গোপনীয় কারণ...?

ক্ষিতীশকে কে যেন বাঁধিয়া কশাঘাত করিল!···সে যে অতি-গোপন কথা, সে যে বুকে ইষ্টমন্ত্রের মত!···সে জানে, এ কথা কাহারো কাছে প্রকাশ করিবার নয়, প্রকাশ করা চলে না,—বিশেষ দীপ্তির কাছে!

দীপ্তি কহিল,—বলবেন না?···তাহলে আমাকেই বলতে হচ্ছে! এতে কুণ্ঠা করলে চলে না!···আশা করি, আমি আপনার মনে এমন কোনো আশা জাগিয়ে তুলিনি, যাতে আপনি···

ক্ষিতীশ এ-কথায় বেত্রাহতের মত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল—তার মাথার মধ্যে রক্ত চন্ চন্ করিয়া উঠিল। সে একেবারে আর্তের মত দীপ্তির পায়ের কাছে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া কহিল,—আমায় ক্ষমা করবেন। আমি আপনার বন্ধুত্বের অপমান করেছি...এ গৃহে আমার প্রবেশের অধিকার আর নেই!···

দীপ্তি কহিল,—এ কি করছেন, ক্ষিতীশ বাবু?··· ছি, উঠুন...

ক্ষিতীশ উঠিয়া কহিল,—আপনি কেন এ-সব কথা তুললেন?...

দীপ্তি কহিল,—বলুন, আপনি বিবাহ করবেন?···

ক্ষিতীশ গদ্গদ কণ্ঠে কহিল—বিবাহ করতে বলছেন,…কিন্তু যাকে বিবাহ করবো তার প্রতি কর্ত্তব্য…?

দীপ্তি কহিল,—মনে করলেই সে কর্ত্তব্য পালন করতে পারবেন! মনকে সবল সচেতন করে তুলুন! মানুষকে ভালোবাসা একটুও কঠিন নয়, ক্ষিতীশবাবু! ঘৃণা করা সহজ, জানি,—কিন্তু তাতে মনে সুখ পাবেন না! ভালবাসুন, কি আমোদে যে প্রাণ বিভোর হয়ে উঠবে!…আমি চিরদিন আপনার বন্ধুত্বের গৌরব করবো, জানবেন!…আপনার মনের আলোয় আপনার স্ত্রীও প্রচুর আলো পাবেন…একটা নারীর আত্মাকে আলোয় ভর-পূর করে তুলে তার জীবনকে সার্থক করা…এ যে মস্ত কাজ!…

ক্ষিতীশের দুই চোখে জল আসিল। সে কহিল,—আপনি আমায় ক্ষমা করবেন। দুরাশার গহনে আমার যে-মন অধীর হয়ে ছুটেছিল, তা থেকে তাকে ফিরে আন্‌বার শক্তি দিন্…

দীপ্তি কহিল,—আমি তো বলেছি, আমি আপনার বন্ধু!… এখন বলুন, বিবাহ করবেন আপনি?

ক্ষিতীশ কহিল,—করবো! কিন্তু তাকে তৈরী করবার ভার আপনার!…

—তাই হবে!…দীপ্তি শান্তির নিশ্বাস ফেলিল।

ক্ষিতীশ কহিল,—এ ঘটনা আমাদের বন্ধুত্বকে কোনদিন আঘাত করবে না? একটুও না…?

—না। দীপ্তির স্বর অশ্রুর বাষ্পে গাঢ়।

তিন দিন পরে দীপ্তি যখন প্রভাকে গান শিখাইতে গিয়া শুনিল, ক্ষিতীশ বিবাহ করিতে রাজী হইয়াছে, তখন মুহূর্তে তার চেতনা যেন লুপ্ত হইল! সে নারী—ক্ষিতীশের ভালবাসা নিজের মনে সে অনুভব করিয়াছিল। তাই কথাটা প্রথম উঠিবামাত্র সে কেমন চমকিয়া উঠিয়াছিল! অরুণ···? একটা স্মৃতি! তবু তার ভালবাসার চেয়ে ত্যাগটাই মনে বেশী ফুটিয়া আছে। প্রথম যৌবনের মোহ সে! তবু সেই ত্যাগের স্মৃতির পায়েই দীপ্তি আপনাকে বিকাইয়া বসিয়া আছে! তার প্রেম, সে যেন সেই ব্রত, সেই কর্ত্তব্যকে নির্ভর করিয়াই উদয় হইয়াছিল! আর এ···? প্রাণের প্রতি প্রাণের কি অসহ্য আকর্ষণ! তবু...না, এ আকর্ষণকে চাপিয়া দিতে হইবে। দেওয়া চাই। তাই দীপ্তি জোর করিয়া ক্ষিতীশকে বিবাহে রাজী করাইয়াছে!

সে ভাবিল, ক্ষিতীশের বন্ধুত্বটুকু পাইলেই তার ঢের পাওয়া হইল। ক্ষিতীশের জীবনকে নিজের সঙ্গে কষিয়া বাঁধিতে গেলে সে যে দারুণ স্বার্থপরের কাজ হইবে! তার পর সান্ত্বনা···! না, চারিদিকে একটা বিশ্রী জট পাকাইয়া যাইবে!···এই বেশ, চারিদিকে কোন বিরোধ নাই,···এ বয়সে বিরোধ আর ভালোও লাগে না!...মনকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া লাভ নাই তাছাড়া সান্ত্বনা...! তার কথাই এখন আগে ভাবা চাই—নিজেকে তুচ্ছ করিয়া, বলি দিয়াও!···

দীপ্তি কহিল,—বেশ হয়েছে। একটী বৌ না এলে সত্যি বাড়ীও মানায় না। তা, মেয়েটি লেখাপড়া জানে তো?

—জানে। ম্যাট্রিক্ পাশ করে ইণ্টারমিডিয়েট পড়ছে!...

—পড়া এবার বন্ধ করে দেবে···?

—মা তাই বলছিলেন। বাবা বললেন, তা কেন! বাড়ীতে পড়ে এগজামিন দেবে। দাদারও তাই মত!

—সেই ভালো। যতদিন পড়া চলে, চালাতে দেওয়া ঠিক, বন্ধ করা উচিত নয়।···

গৃহে ফিরিয়া দীপ্তি দেখে, সেখানে ভারী ধূম বাধিয়া গিয়াছে, বাগানের বড় বাড়ী ভাড়া হইয়াছে। কোথাকার কে জমিদার, কামাখ্যা বাবু—তাঁর স্ত্রীর কঠিন পীড়া; তাঁকে এখানে আনা হইয়াছে চিকিৎসার জন্য। লোকজনের ভিড়ে সারা বাগান-বাড়ী একেবারে গম-গম্ করিতেছে!

দীপ্তি গৃহে ফিরিয়া ডাকিল,—সাবু······

দাসী কহিল,—ঐ যে বাবুরা বড় বাড়ীতে ভাড়া এসেছে, তাঁদের দুটী মেয়ে এসে সাবুকে নিয়ে গেছে, ওদের ওখানে ···!

দীপ্তি চমকিয়া উঠিল! তার নির্জ্জনতার মাঝখানে এ কি আবার কোলাহল জাগিল আজ? সে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বিছানার উপর গা ঢালিয়া দিল···

— ১৯ —

পরের দিন দীপ্তির গৃহে অতিথি আসিল, বড় বাড়ীর জমিদার ভাড়াটীয়া কামাখ্যা বাবুর দুই কন্যা। দুজনেই বয়সে তরুণী—দুজনেরই বিবাহ হইয়া গেছে। বড়র নাম হিরণ, ছোটর নাম কিরণ। হিরণের বিবাহ হইয়াছে কলিকাতায়; তার স্বামী এক এটর্নির বাড়ী আর্টিক্‌ল্‌ আছে; ছোটর স্বামী মফঃস্বলের জমিদার-পুত্র। হিরণ আসিয়া দীপ্তিকে কহিল—আপনি বই লেখেন, না? লেখিকা দেখতে কেমন, তাই দেখতে এলুম···

হাসিয়া দীপ্তি কহিল,—তার দুটো হাত, দুটো পা আছে··· এবং লেখিকা ঠিক সাধারণ মানুষের মতই! দেখলেন তো?

হাসিয়া হিরণ কহিল,—দেখতে তাই বটে!

দীপ্তিও হাসিয়া জবাব দিল,—আপনারা ভেবেছিলেন, চিড়িয়াখানার কোনো জীবের মত দেখবেন,—না? নিরাশ হলেন দেখে···?

হিরণ কহিল,—সত্যি, কি করে যে লেখেন, তাই ভাবি।

দীপ্তি কহিল,—কালি-কলম আর কাগজ নিয়ে।

হিরণ কহিল,—শুধু কালি-কলম আর কাগজ নিয়েই যদি বই লেখা যেত, তাহলে বাঙালীর ঘরে লেখকের আর অভাব থাকতো না!

দীপ্তি কহিল,—আমার বই তাহলে পড়েছেন? পড়ে বোধ হয় খুব গাল দেছেন?

কিরণ কহিল,—মোটে না। আমরা শুধু অবাক্ হয়ে গেছি, বাঙালীর ঘরের মেয়ে বই লেখে কি করে, এই ভেবে! সংসার দেখাশোনা করার পর…এ যে আশ্চর্য্য ব্যাপার! বাইরের কতটুকুই বা আমরা জানি! ক'জন মানুষকেই বা দেখেছি!

দীপ্তি কহিল,—কিন্তু আমি তো ঘরের মধ্যেই বন্ধ থাকি না।...আমায় পুরুষ মানুষের মতই বাইরে আনাগোনা করতে হয়, বোন্।

কিরণ কহিল,—তাই!...আমি তো অনেক সময় ভাবি, আচ্ছা, একটু ভেবে কিছু লেখবার চেষ্টা করে দেখিই না! কিন্তু মন ঐ বাড়ীর পাঁচিল অবধি গিয়েই থেমে যায়। বাইরে কেবল ভিড়, আর অন্ধকার! সে ভিড় ঠেলে মন বেরুতেই পারে না।

দীপ্তি কহিল,—লেখার দিকে যদি আগ্রহ থাকে, তাহলে ঐ পাঁচিল-ঘেরা গণ্ডীটুকুর মধ্য থেকেই লেখার জিনিষ খুঁজে নিতে হবে!

কিরণ কহিল,—তাও বুঝি হয়!...

হিরণ কহিল,—কাল কিন্তু এসেই আপনার মেয়ের সঙ্গে ভাব করে ফেলেচি। দিব্যি ফুলের মত মেয়েটি! দাঁড়িয়ে অবাক্ হয়ে আমাদের দেখছিল। থাকতে পারলুম না। আপনার সন্ধান করলুম, শুনলুম, কোথায় গেছেন, তাই আপনার অনুমতি না নিয়েই সানুর সঙ্গে ভাব করে ওকে আমাদের ওখানে নিয়ে গেলুম! আমার মা রুগ্ন—তিনি কত আহ্লাদ করলেন।

মা আপনার সঙ্গেও ভাব কর্‌তে চান্‌—যাবেন কি? মা বলে পাঠিয়েছেন!...

দীপ্তি কহিল,—কেন যাবো না? আপনার মার কি অসুখ?

হিরণ কহিল,—কার্ব্বাঙ্কল্‌। অনেক দিন ধরে ভুগছেন, একেবারে শয্যাগত! আমরা থাকি বহরমপুরে—সেখানে চিকিৎসার হদ্দ হয়ে গেছে···কোনো ফল হলো না। তাই এখানে আনা হয়েছে। এখানে চিকিৎসার ভালো ব্যবস্থা যাতে হয়, এই জন্যে!···মন আমাদের ভারী উদ্বিগ্ন সর্ব্বক্ষণ। কি যে হবে!

দীপ্তি কহিল,—বেশ, আমি যাবো!···তা এখানে কে দেখছেন?

হিরণ কহিল,—আজ দু' তিনজন ডাক্তার এসে পরামর্শ করবেন—কাকে দেখানো মত হয়!...সানু কোথায়?

দীপ্তি কহিল,—স্কুলে গেছে।

কিরণ কহিল,—আপনার বাজনা রয়েছে, দেখচি। আপনি গান-বাজনা করেন?

দীপ্তি কহিল,—একটু-আধটু করি।

হিরণ কহিল,—মা গান শুনতে এমন ভালো বাসেন। তা কি করেই বা শোনেন! একটা গ্রামোফোন কেনা হয়েছে, শুয়ে শুয়ে তাই শোনেন!...আপনি গান গাইতে পারেন শুনলে মা কত যে খুসী হবেন!...আপনি কখন যাবেন?···

দীপ্তি কহিল,—এখন যাবো···?

হিরণ কহিল,—আপনার কোন অসুবিধা হবে না তো?

দীপ্তি কহিল,—না, অসুবিধা আর কি! চলুন...

হিরণ-কিরণ দুই বোন মহা-উৎসাহে দীপ্তিকে তাদের মার কাছে লইয়া চলিল। মা খুব খুসী হইলেন, বার-বার বলিলেন, এখানে নির্জ্জন রোগ-শয্যায় তিনি যে কি কাতর হইয়াই পড়িয়া আছেন—দীপ্তি যদি মাঝে মাঝে আসিয়া দেখা-শুনা করে, তাহা হইলে এ কাতরভাব মাঝে তাঁর কতক শান্তি মেলে! রোগে ভুগিয়া ভুগিয়া নিজের উপর তাঁর ধিক্কার জন্মিয়া গিয়াছে। স্বামী ও আত্মীয়-বন্ধু সকলকে সর্ব্বক্ষণ এমন বদ্ধ বন্দী করিয়া রাখা, তাঁদের যত কাজ-কর্ম্ম স্বাচ্ছন্দ্য সব বিসর্জ্জন দিয়া দিবারাত্র এই রোগের পরিচর্য্যা করিতেছেন—এত বড় দুর্ভাগ্য নারীর আর নাই!

দীপ্তি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়া কহিল,—আপনি তো সখ করে রোগ ভোগ করছেন না!...আপনার রোগ-যাতনা লাঘব করতে পাবলে যে ওঁদের এ পরিশ্রম কতক সার্থক হয়!...

হিরণ কহিল,—ইনি মা, গান-বাজনাও জানেন!...শুনবে গান?

মা কহিলেন,—গাইবে মা?

দীপ্তি কহিল,—আপনার এখানে বাজনা আছে?

কিরণ কহিল—একটা বক্স-হার্ম্মোনিয়ম আছে—দাদা ঐ গ্রামোফোনের গানের সঙ্গে মাঝে মাঝে বাজায়। দাদা তো গাইতে পারে না...শুধু বাজাতে জানে, তাও একটু-একটু!

দীপ্তি কহিল,—বাজনা আনিয়ে দিন। গাই না হয় দু-একটা গান...

কিরণ-হিরণ দুইজনে গিয়া বক্স-হার্মোনিয়মটা আনিয়া দিলে দীপ্তি গাহিতে সুরু করিল। একটি, দুইটি তিনটি গান হইল। হিরণ ও কিরণ গান শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। মা বলিলেন,—চমৎকার গলা মা, তোমার!—আমি এদের বলি, তোরা যদি একটু-আধটু গান শিখতিস!...তা এঁর তো ও-সব দিকে মনও নেই!—তবে গোবিন্দর সখ আছে। গোবিন্দ আমার বড় জামাই···তার বড় সাধ, হিরণ গান শেখে। তা ওর শ্বশুর-বাড়ীতে তা হবার উপায়ও নেই। শাশুড়ী-টাশুড়ী সব সেকেলে ধরণের মানুষ, বলেন, বৌ-মানুষ বাজনা নিয়ে গান গাইবে কি! তা ওঁকে বলি, হিরণকে একটু শেখাও গো, জামাইয়ের সখ! উনি বলেন, কার কাছে শিখবে! তা তুমি মা যদি একটু কষ্ট কর!...

দীপ্তি কহিল,—তার আর কি! শেখাব!···

এই গান-গল্পের মাঝে এই পরিবারটির সঙ্গে দীপ্তির বেশ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া গেল।···কিরণের মা কহিলেন,—মাঝে মাঝে এসো মা। তোমার সঙ্গে দুদণ্ড কথা কয়ে রোগটাকে তবু একটু ভুলে থাকবো!···

দীপ্তি কহিল—আঁসবো বৈ কিঁ।

কিরণ কহিল—আপনি কখন বই লেখেন?

দীপ্তি কহিল,—ওর আর সময়-অসময় নেই। যখনই সময় পাই, একটু একটু লিখি।

হিরণ কহিল,—এখন কি কোন বই লিখছেন?

দীপ্তি কহিল,—হ্যাঁ! একটা তো ধরেছি!…না লিখলে চলে না, ভাই! এই সব করেই আমায় চালাতে হয় কি না!

মা কহিলেন,—কদ্দিন এ দশা হয়েছে?

দীপ্তি এ কথার ইঙ্গিত বুঝিল; বুঝিয়া কহিল,—অনেকদিন হয়ে গেল।

মা কহিলেন—মা-বাপ, শ্বশুর-শাশুড়ী নেই?

একটা ঢোক গিলিয়া দীপ্তি কহিল—আছেন।

মা কহিলেন,—তবে এখানে একলাটি থাকো যে?

দীপ্তি কোন উত্তর দিল না; চুপ করিয়া রহিল।

মা কহিলেন,—তাঁদের সঙ্গে বনিবনা নেই?…তারপর কিছুক্ষণ স্থিরভাবে দীপ্তিকে লক্ষ্য করিয়া তিনি আবার কহিলেন,—ছি মা, মা-বাপের ওপর অভিমান করতে নেই! তাঁদের প্রাণ যে কতখানি কাতর হয়ে আছে!…তুমিও তো বোঝো মা, তুমিও মা—ছেলে-মেয়ে অভিমান করে আলাদা আছে, এ কথা ভাবতেও যে মার প্রাণ শিউরে ওঠে!…অভিমানকে এত বড় করে তুলতে নেই, বিশেষ মা-বাপের ওপর! জগতে কেউ যদি আপনার থাকে তো মা-বাপ,—স্বামীর ভালবাসাতেও বরং স্বার্থ থাকে, কিন্তু সন্তানের ওপর মা-বাপের যে স্নেহ-ভালবাসা, তাতে একেবারে কোন স্বার্থ নেই।…

দীপ্তি অবিচল প্রাণে এ কথা শুনিল!…এ একটা পরীক্ষা!

হায়, এঁরা তো জানেন না, কত বড় মতের পায়ে সে মা-বাপ, সমাজ, সকলকে কি-ভাবে বলি দিয়াছে!—অথচ এ কথা এখানে তুলিলে কেই বা তার সে ত্যাগের মূল্য বুঝিবে ...কেহ না! মাঝে হইতে অবজ্ঞার স্রোতে তাকেই ভাসিয়া যাইতে হইবে!...এ ভাসাও আর ভালো লাগে না! সে তো ভাসিয়াছে অনেকদিন,—আজ যদি বা তীরের কাছে স্নেহ-প্রীতি দিয়া রচা তীর-ভূমির হাওয়া একটু গায়ে লাগিতেছে, সে হাওয়া-টুকু প্রাণে আরামও জাগাইয়া তুলিতেছে, তখন এ হাওয়া ছাড়িয়া দূরে সরিয়া যাইতেও প্রাণে বেদনা বাজে!...তবু...সে যা করিয়াছে, তার কোথাও অন্যায় কিছু নাই!...হায়রে, মানুষ এটুকু যে কেন বোঝে না!...

দীপ্তিকে নীরব দেখিয়া মা আবার কহিলেন,—বাপ-মার সঙ্গে দেখা কর মা...একরত্তি ঐ মেয়েটিকে নিয়ে এমন নির্জ্জনে থাকা—বিপদ-আপদ আছে তো! তখন...?

সেই তখনকার কথা আগে মনেও হইত না, এখন মাঝে মাঝে সে কথা কাঁটার মত মনে বেঁধে!...চারিপাশে আত্মীয়-বন্ধু যদি থাকিত, তাহা হইলে অরুণ কি অমন অসময়ে চলিয়া যাইত! কে জানে! এ-সব কথা ভাবা যায় না—এ ভাবনার কুল-কিনারা নাই! এ সব কথা মনে আসিলে দীপ্তি সন্তর্পণে সেগুলাকে সরাইয়া দেয়। শেষে এ চিন্তায় নিশ্বাস বন্ধ হইবার মত হইলে সে বাড়ী ছাড়িয়া পথের বিরাট ভিড়ের মাঝে আপনাকে টানিয়া লইয়া গিয়া নিক্ষেপ করে!

মা বলিলেন,—আমার এ কথাটা রেখো মা !...সংসারে ক'দিনের জন্তেই বা থাকা ! কে কখন চলে যায়, তারো ঠিক নেই ! এর মাঝে বিরোধ-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করা পাগলামি, সাধ করে দুঃখ আনা বৈ আর কিছু না ! আমার বয়স হয়েছে অনেকখানি —বিরোধ-দ্বন্দ্বও ঢের এসেছে জীবনে। তার মাঝে আমি এতটুকু উত্তেজিত না হয়ে মনকে তাতিয়ে না তুলে শান্ত হয়ে সামঞ্জস্য এনে সে বিরোধ-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে এসেছি চিরকাল !···চারি দিকে ঝড়ও তাতে থেমে গেছে···সূর্য্যের অত যে আলো বিরোধের মেঘে ঢাকা পড়তো, সে আলো আবার হেসে চোখ মেলে চেয়েছে !...বুড়ো মানুষের কথা একটু ভেবে দেখো মা !... তোমায় দেখে আমার কেমন মায়া পড়েছে, তাই এত কথা বললুম।···জীবনে অনেক দুঃখ আছে, অনেক বিপদ···তার মধ্যে সামান্য ছোট-খাট স্বার্থ নিয়ে কেনই বা বিরোধ তোলা !... কোন লাভ নেই তাতে !···আর কারো স্বার্থ যদি প্রবল হয়, হোক্, একটু সয়ে যাও···সওয়ার বাড়া গুণ আর নেই, বিশেষ মেয়েদের !···

এ কথাগুলা তীক্ষ্ণ শরের মতই দীপ্তির বুকে গিয়া বিঁধিল ! আত্মীয়-বন্ধুর এই প্রীতি...এ ছাড়িয়া যে নির্জ্জন পথ সে বাছিয়া লইয়াছে—যে-পথে প্রীতির শ্যামল ছায়ার চিহ্নও কোথা নাই— সে তবে ভুল পথ···?...মন সগর্জ্জনে বলিয়া উঠিল, না, না, এই ক্ষুদ্র সংসারের গহ্বর, তুচ্ছ হাসি-খেলা—এ লইয়া তো সকলেই থাকে !···এখানে প্রকাণ্ড কোন কাজ করিতে গেলে প্রচণ্ড

কল্যাণ সাধনা করিতে গেলে তারো যে মূল্য দিতে হয়!... সে সেই মূল্যই দিয়াছে! এ মূল্যে যদি অতখানি কল্যাণ সে কিনিয়া লইতে পারে, তো তা ছাড়িয়া দিবে! দীপ্তি নিজের মনকে নিমেষেই স্থির করিয়া লইল। মা কহিলেন,—কি ভাবচো?

দীপ্তি কহিল,—সে অনেক কথা! আর একদিন আপনাকে বলবো'খন...আজ তাহলে আসি। সান্ত্বর স্কুল থেকে ফেরবার সময় হয়ে এলো! তার জল-খাবার তৈরী করতে হবে!

মা কহিলেন,—বেশ মেয়েটি! তাকে এখানে পাঠিয়ো মা। একলা থাকি...ভারী মিষ্টি কথা কয়, আর ভারী শান্ত! যে ক'দিন এখানে মেয়াদ আছে, তোমাদের দেখি-শুনি...!

দীপ্তি বিদায় লইয়া চলিয়া গেল।...

পরের দিন আর এক মস্ত ঘটনা ঘটিল। আগের দিন সন্ধ্যার পর দুই ঘণ্টা ধরিয়া নানা পরামর্শের পর ডাক্তারের দল কামাখ্যা-বাবুর স্ত্রীকে বিচক্ষণ প্রবীণ ডাক্তার অভয় মিত্রর হাতে চিকিৎসার জন্য সমর্পণ করাই মত করিলেন। এবং পরদিন ডাক্তার অভয় মিত্রর প্রকাণ্ড মোটর আসিয়া বাগান-বাড়ীতে ঢুকিল।

অভয় মিত্র রোগী দেখিয়া ফিরিতেছিলেন—সান্ত্বনাও সে সময় স্কুলে যাইবার জন্য ফটকের সামনে দাঁড়াইয়াছিল, স্কুলের গাড়ীর প্রত্যাশায়। মেয়েকে স্কুলের পোষাক পরাইয়া দীপ্তি স্নান করিতে গিয়াছিল। সান্ত্বনা অন্যমনস্কভাবে চাহিয়া ছিল,

গাড়ীর দিকে তার হুঁসও ছিল না। অভয় মিত্রর মোটরের সামনে পড়িলে সোফার হর্ণ বাজাইয়া চীৎকার করিয়া গাড়ী থামাইয়া ফেলিল। সে চীৎকারে অভয় মিত্রর নজর পড়িল সান্ত্বনার উপর। ফুলের মত সুন্দর মেয়েটি—কার মেয়ে?···সান্ত্বনা কেমন হকচকিয়া গিয়াছিল। অভয় মিত্র গাড়ী হইতে নামিয়া তাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। এ কি! এ মুখ···এ মুখ যে তাঁর বুকে আঁকা রহিয়াছে!···অরুণের মুখের ছায়াটুকুর মত!···সেই চোখ, সেই নাক···সব সেই! এ যেন তাঁর অরুণই শিশু-মূর্ত্তি ধরিয়া তাঁর সামনে আবার আসিয়া দাঁড়াইয়াছে! সান্ত্বনাকে আদর করিয়া তাকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমার নাম কি মা?

—সান্ত্বনা।

—তোমার বাবার নাম?

—অরুণচন্দ্র মিত্র।

অরুণচন্দ্র মিত্র!···অভয় মিত্রর বুকে কে যেন ছুরি বিঁধিয়া দিল! তিনি শিহরিয়া উঠিলেন; কহিলেন,—তোমার বাড়ী?

ছোট গৃহটির পানে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া সান্ত্বনা কহিল,—ঐ।

—তোমার বাবা আছেন?

—না।

না! অভয় মিত্রর পায়ের তলায় মাটীটা প্রচণ্ড দোলে দুলিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন,—তোমার কে আছেন?

—মা।

মা! না, কোন ভুল নাই! অভয় মিত্র কহিলেন,—তোমার মার নাম জানো?

—শ্রীমতী দীপ্তি দেবী।

সব ঠিক! এ নামও যে তাঁর বুকে ফুটিয়া আছে, সর্ব্বক্ষণ, তীক্ষ্ণ কাঁটার মত!...

অভয় মিত্র কাঁপিয়া উঠিলেন। সান্ত্বনাকে বুকে করিয়া তিনি তার পানে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। তারপর তার মুখে চুমা দিয়া কহিলেন,—আমি কে, জানো?

সান্ত্বনা দুই চোখের বিস্ফারিত দৃষ্টি তাঁর মুখে স্থাপিত করিয়া কহিল,—ডাক্তার বাবু।

হাঁ, ডাক্তার বাবুই' এইমাত্র তাঁর পরিচয়! একটা অজানা বেদনায় তাঁর মন টন্‌টন্ করিয়া উঠিল! সান্ত্বনাকে বুক হইতে নামাইয়া তিনি কহিলেন,—স্কুলে যাচ্ছ?

—হ্যাঁ।

—কোন্ স্কুলে পড়?

—ক্যাথারিন ইন্‌ষ্টিউটে।

—চল, আমার গাড়ীতে করে! আমি তোমায় তোমার স্কুলে নামিয়ে দিয়ে যাই।

এত বড় মোটরে চড়িয়া! সান্ত্বনা মহা-খুসী হইয়া কহিল,—যাবো।

অভয় মিত্র সান্ত্বনাকে গাড়ীতে তুলিয়া লইলেন। পরে

সোফারকে কহিলেন,—তুমি এর বাড়ীতে বলে এসো, ডাক্তার বাবুর গাড়ীতে করে এ স্কুলে যাচ্ছে। স্কুলের গাড়ী এলে যেন ফিরিয়ে দেয়!

সোফার দাসীর কাছে খবর দিয়া গাড়ী চালাইয়া পথে বাহির হইল।

— ২০ —

সান্ত্বনার সেদিন গর্ব্ব আর আমোদের সীমা রহিল না। এত বড় মোটরে চড়িয়া স্কুলে আসা...অভয় মিত্রর উপর এক নিমেষে তার প্রচুর ভালবাসা জন্মিল!...স্কুল হইতে কখন বাহির হইয়া বাড়ী ফিরিয়া মার কাছে এত বড় সৌভাগ্যের খপর দিবে এই চিন্তায় সারাদিন সে আকুল হইয়া রহিল। স্কুলের ছুটীর পর বাড়ী ফিরিতে মা জিজ্ঞাসা করিল,—কার সঙ্গে স্কুলে গেছলে আজ সান্থ...?

—ডাক্তারবাবুর সঙ্গে। সান্ত্বনা পুলকে একেবারে উচ্ছ্বসিত! তারপর সে একটা গিনি মার হাতে দিয়া কহিল,—ডাক্তার বাবু আমায় দেছেন, বলেছেন, এই দিয়ে পুতুল কিনো...সোনার টাকা। একে গিনি বলে, ডাক্তার বাবু বললেন...

দীপ্তি অবাক হইয়া গেল। কে অজানা ডাক্তার তার মেয়েকে হঠাৎ এতখানি আদর করিয়া উপহার দিয়া গেল! এ উপহার দেওয়ার মানেই বা কি!...

সান্ত্বনা কহিল,—এ কিন্তু আমার। এতে আমি খেলনা কিনবো—খুব অনেকগুলো পুতুল, আর কলার-বক্স, ছবি আঁকবো বলে...

সে কথা দীপ্তির কানেও গেল না। সে শুধু ভাবিতেছিল, কে এই ডাক্তার বাবু!...ছেলেমেয়ের উপর যাঁর এতখানি দরদ আর ভালবাসা...এ সমস্যার সেদিন কোন মীমাংসাও হইল না।...

পরদিন বেলা তখন ন'টা। সান্ত্বনাকে স্নান করাইয়া দীপ্তি তাকে আহারে বসাইয়াছে, এমন সময় দ্বারের সামনে কে ডাকিল,—সান্ত্বনা...

কে ডাকে?...এ স্বর যেন পরিচিত! দীপ্তি বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া দ্বার-প্রান্তে চাহিল।...তাই তো, এ যে...কি আশ্চর্য্য, অভয় মিত্র!...দীপ্তি চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অভয় মিত্র ঘরে ঢুকিয়া কহিলেন,—আমি ও-বাড়ীতে রোগী দেখতে এসেছিলুম। কাল সান্ত্বনার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়েছে।...তারপর তুমি এখানে আছো...? কদ্দিন?

দীপ্তি মাটীর পানে চাহিয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল,—সেই অবধি... সানু হবার পর থেকেই!

অভয় মিত্র একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন,—তোমাদের চলছে কি করে?

দীপ্তি কহিল,—এক রকমে চলে যাচ্ছে।

অভয় মিত্র কহিলেন,—কোনো অভাব...? থাকে যদি,

বলো। এ তো অরুণের মেয়ে···এর প্রতি আমারো একটা কর্ত্তব্য আছে! তাই বলছিলুম...

দীপ্তি কহিল,—কোনো দরকার নেই!···তারপর এক নিমেষে দীপ্তির মনে পড়িয়া গেল, জনহীন বিদেশে চরম বিদায়ের ক্ষণে সেই নির্ম্মম অবহেলা, সেই নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যান... তার সমস্ত অন্তরাত্মা শিহরিয়া একমুহূর্ত্তে হাহাকার করিয়া উঠিল।

সে কহিল,—আপনি তো সব ত্যাগ করেছেন—তবে আবার কেন প্রচণ্ড লোভ নিয়ে এই শিশুর সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়েছেন! আপনার কাছে কোনো দয়ার প্রত্যাশী হয়ে আমি তো হাত পেতে দাঁড়াই নি! ঐ গিনি দিয়ে কেন আমার মেয়েকে প্রলোভনে বশ করতে এসেছেন!···ফিরিয়ে নিন আপনার গিনি...এ দয়ার কোন প্রয়োজন নেই।

অভয় মিত্র অবাক হইয়া গেলেন। এত তেজ!...তিনি কহিলেন,—ছোট ছেলে, তাকে কিছু দিয়ে ফিরিয়ে নেওয়া যায় না!...না হয় পথের লোক ভালোবেসেই ওকে দিয়েছে, ভেবো।

—না,পথের লোকের কাছে হাত পাতবার মত দুর্ভাগ্য হয় নি এখনো—ওর নয়, আমারো না!···ফিরিয়ে নিন্ আপনার গিনি। আর আপনাকে মিনতি করছি, এর প্রতি মায়া দেখাবার আগে দয়া করে ভেবে দেখবেন, এর বাপ-মার প্রতি আপনার অসীম দয়া-মায়ার কথা! আপনি যান্। গরীবের কুঁড়ে আপনার পায়ের ধূলো পাবার যোগ্যও নয় তো!

অভয় মিত্র কহিলেন,—সান্ত্বনাকে একটিবার দেখে যাবো!...

দীপ্তি বাধা দিয়া তাঁর সামনে দাঁড়াইল, কহিল,—না। তার সঙ্গে আপনার কোন সম্পর্ক যখন নেই, তখন দেখা করবারো কোন দরকার বুঝি না আমি। আপনি দয়া করে ওকেও ত্যাগ করুন, যেমন একদিন তার বাপকে ত্যাগ করেছিলেন...তাকে আর স্নেহের অত্যাচারে বিঁধে কাতর জর্জ্জরিত করবেন না!... আপনার কাছে এইটুকুমাত্র ভিক্ষে চাইছি...

অভয় মিত্র কহিলেন,—কাল একটা কথা ভাবছিলুম, শোনো, বলি...পুরোনো কথাগুলো কাঁটার মত আবার আমার মনে বিঁধেছে, কাল সর্ব্বক্ষণ! অরুণের পরশ কাল আবার নতুন করে পেয়েছি।...তাই একটা কথা বলছিলুম...অর্থাৎ মেয়েটিকে আমায় দাও। ওকে বড় করবার, মানুষ করবার ভার আমি নি...আমার নাতনী, পরম আদরে আমি ওকে বুকে করে রাখবো। আমার কাছেই সান্ত্বনা থাকবে। তুমি তাকে যখন খুসী দেখতে পাবে, আমিই ওকে নিয়ে আসবো।...ওর জীবনটাকে দারিদ্র্য আর অভাবের মধ্যে নিক্ষেপ করো না। আমার অরুণের মেয়ে...তোমায় আমি অনেক টাকা দেবো... অনেক টাকা...

রাগে দীপ্তির মন একেবারে তাতিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সে কহিল,—আমায় আপনি টাকার লোভ দেখাতে এসেছেন! মেয়ে-বেচা আমার ব্যবসা নয়। আমি গরিব,

আপনাদের এ উচ্চ আদর্শকে গ্রহণ করতে আমি একান্ত অক্ষম!…আপনি যান…মরা ছেলেকে ফেলে যেমন একদিন চলে গেছলেন…

অভয় মিত্র কহিলেন,—ভালো করে বুঝে দেখো কথাটা। আমি এখনি ওকে নিয়ে যাচ্ছি না। ভেবে ছাখো, হঠাৎ যদি তোমার খুব বিপদ হয়—তখন সান্ত্বনা কোথায় থাকবে, তার কি হবে…

দীপ্তি কহিল,—সে আমি ভেবে রেখেছি।…সহরে অনাথ-আশ্রম আছে…এমন যদি ঘটেই, ও অনাথ-আশ্রমে থাকবে…তবু …আপনার কাছে নয়!

অভয় মিত্র গম্ভীরভাবে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় দীপ্তির পানে এমন বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গেলেন যে সে দৃষ্টি মেঘ-ভাঙা বিদ্যুৎ-শিখার মত দীপ্তির বুকে বিঁধিল। দীপ্তি ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া আত্মগতভাবেই কহিল, মায়া দেখাতে এসেছেন, করুণা প্রকাশ করতে এসেছেন…! পুরানো স্মৃতির সেই গাঢ় অন্ধকারে অরুণের দুই দীপ্ত চোখের দৃষ্টি জ্বলজ্বল করিয়া তার মনে অমনি ফুটিয়া উঠিল!

দীপ্তি কহিল, এ দয়ার একটা কণারও প্রত্যাশা করি না! এ দয়ার একটা কণাও যেন কোনদিন গ্রহণ না করি!…

সান্ত্বনাকে সে নিষেধ করিয়া দিল, ডাক্তারবাবুর সঙ্গে যেন সে দেখা না করে! তাঁর সঙ্গে কথাও না কয়!…

সান্ত্বনা অবাক হইয়া মার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। দীপ্তি

কহিল,—ডাক্তারবাবু কি করেছেন, তা এখন বুঝবে না, সান্ত্বনা? বড় হলে তোমায় সব কথাই বলবো'খন...

এ নিষেধ তুলিয়া দিলেও ঘটনার স্রোত কিন্তু আর এক-রকম দাঁড়াইল।

পাঁচ-সাত দিন পরে স্কুল হইতে জ্বর লইয়া সান্ত্বনা গৃহে ফিরিল। সন্ধ্যার পরক্ষণেই জ্বর এমন প্রবল হইয়া উঠিল যে জ্বরের ঘোরে তার আর কোন হুঁশ রহিল না! দীপ্তি মহা-ভাবনায় পড়িল। ক্ষিতীশ তার একমাত্র বন্ধু! তাকে খপর দেওয়া ছাড়া অন্ত উপায় নাই। কিন্তু কে বা খপর দেয়! সে-ই শুধু বাড়ী জানে—কিন্তু তা বলিয়া মেয়েকে দাসীর কাছে এ অবস্থায় ফেলিয়াও তো যাওয়া যায় না!...চিঠি লিখিলে ক্ষিতীশ কাল সেই তুপুর বেলায় চিঠি পাইবে...তখন যদি সে বাড়ীতে না থাকে! নূতন বিবাহ করিয়াছে, যদি শ্বশুর-বাড়ীই গিয়া থাকে! হিরণদের খপর দিবে কি? তাও কি ঠিক হইবে! একে ওরা নিজেদের জ্বালায় অস্থির হইয়া আছে, তার উপর আজ তিনদিন তার মার অসুখও বাড়িয়াছে!...নিরুপায়, ঘোর নিরুপায়! অথচ একদণ্ড বিনা-চিকিৎসায় সান্ত্বনাকে ফেলিয়া রাখা চলে না!...সেই বহুকাল পূর্ব্বে এমনি জ্বর সে দেখিয়াছিল—প্রথমটা কিছু নয় বলিয়া অগ্রাহ্যও করিয়াছিল! সেই জ্বর লইয়া গৃহে ফেরা!... না, না! বয়স তখন তরুণ ছিল, ঘা খাইয়া এমন মুসড়িয়া পড়ে নাই! আজ একটুতেই ভয় হয়! এ জ্বর কিছুই নয়,...মানি! তবু চুপ-করিয়া থাকা যায় না। একটা দীর্ঘ রাত! কি

জানি, যদি এ জ্বর বাঁকা পথে চট্ করিয়া ঢুকিয়া পড়ে!...অভয় মিত্র!...তাকেই খপর দিবে?...তাই বা কি করিয়া হয়! হিরণদের ভৃত্য তাঁর বাড়ী জানে—কিন্তু তাঁকে অমন করিয়া বিদায় দিবার পর আবার তাঁর দ্বারে দাঁড়ানো!...সে যে বড় গলায় বলিয়াছিল, পরের কাছে হাত পাতিবে সেও ভালো, তবু তাঁর কাছে এক-কণা করুণাও ভিক্ষা করিবে না! এ কি ভীষণ পরীক্ষায় সে পড়িল আজ! শেষ কথাটা কি ক্ষণেই যে মুখ দিয়া বাহির হইয়াছিল!...এ পৃথিবীতে পরের উপর মানুষকে এতখানি নির্ভর করিয়াও চলিতে হয়! এমন বাঁধন চারিদিকে বিছানো রহিয়াছে! হারে মানুষ, এ বাঁধনের মাঝে মন তার স্বাধীনতার গর্ব্ব কি সাহসে করে! বাঁধন, আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধন, চারিধারে বাঁধন!...

রাত তখন নয়টা। সান্ত্বনার জ্বর আরো বাড়িল। মুখ সিঁদুরের মত রাঙা! দীপ্তির অত্যন্ত ভাবনা হইল। তাইতো, উপায়? আরো রাত্রে এ জ্বর যদি আরো বাড়ে! কোথায় ডাক্তার! কোথায় ঔষধ! কে তখন আনে! হিরণদের বাড়ীই খপর দিবে? তার মার অসুখ বাড়িয়াছে! তাদের সে দুর্ভাবনার উপর আবার তার বিপদ তাদের ঘাড়েই চাপাইবে!...কিন্তু উপায়ও তো আর নাই!

হঠাৎ সান্ত্বনা ডাকিল,—মা...

দীপ্তি কহিল,—কেন মা?

—জল...বড় তেষ্টা! দীপ্তি তার মুখে জল ঢালিয়া দিল।

সান্ত্বনা জল গিলিতে পারিল না, গালের কষ বহিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

দীপ্তি ডাকিল,—সানু...মা...

সান্ত্বনা কোন সাড়া দিল না—বিস্ফারিত নেত্রে মার পানে চাহিয়া রহিল।

দীপ্তি আবার ডাকিল,—সানু জল খাবে বললে যে মা,...জল দিচ্ছি, খাও...

সান্ত্বনা কোন জবাব না দিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।...

দীপ্তির ভাবনা বাড়িল। এইটুকু সময়ের মধ্যে জর এমন বাড়িল!...আর এই সব লক্ষণ! এ-সব যে তার খুব চেনা!... দাসীকে ডাকিয়া সান্ত্বনাকে আগলাইতে বলিয়া দীপ্তি পাগলের মত ছুটিল হিরণদের বাড়ী।

দালানে ষ্টোভ জ্বালিয়া হিরণ জল গরম করিতেছিল—ঘরের মধ্যে রোগীর কাছে আর সকলে ভিড় করিয়া বসিয়া!

দীপ্তি আসিয়া ডাকিল,—হিরণ...

হিরণ চমকিয়া চাহিয়া দেখে, দীপ্তি! সে কহিল,—আপনি? খপর কি?

দীপ্তি কহিল,—সানুর বড্ড জর...কেমন ভুল বকছে—কোথায় ডাক্তার, কি যে করি...বড় ভাবনা হয়েছে!

হিরণ কহিল,—সানুর জর!...কৈ, আমরা তো জানিনা কিছু!

দীপ্তি কহিল,—আজই স্কুল থেকে জর নিয়ে ফিরেছে...

দেখতে-দেখতে সেই জ্বর এমন বেড়ে উঠলো যে আমার ভারী ভয় হচ্ছে! এখনো তো সমস্ত রাত পড়ে রয়েছে!...

হিরণ কহিল,—তাই তো! তা...আমরা কাকেও পাঠাই ডাক্তার আনতে!...আপনার তো লোক-জন নেই!

দীপ্তি কহিল,—সেইজন্যই আমি এসেছিলুম, কাকেও যদি একটিবার পাঠাতে পারো ..

হিরণ কহিল,—আচ্ছা, আমি এখনি নেপালকে পাঠাচ্ছি।... ডাক্তার নিয়ে আসবে...আপনি বাড়ী যান—সে একলাটি রয়েছে!

দীপ্তি জিজ্ঞাসা করিল,—মা কেমন আছেন?

হিরণ কহিল,—বিকেলের পর থেকে একটু ভালো আছেন! ...একটা ধাক্কা কাটলো...তা আপনি আর দাঁড়াবেন না, যান শীগগির।

দীপ্তি লৌকিকতার খাতিরে দাঁড়াইল না, তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিল।

বাড়ী ফিরিয়া দেখে, সান্ত্বনা তেমনিই আছে!...হঠাৎ তার মনে হইল, মাথায় একটু বরফ দিলে হয়! কিন্তু বরফ, আইস-ব্যাগ ...হায়রে, একা নারীর পক্ষে সংসার নির্ব্বাহ করা এত কঠিন!...

দীপ্তি উঠিয়া একটা চায়ের পেয়ালায় জল ঢালিয়া তাহাতে কানি ভিজাইল। সেল্‌ফে অডিকোলোনের একটা শিশি ছিল—সেটা লইয়া দেখে, দু ফোঁটা মাত্র পড়িয়া আছে! তাড়াতাড়ি

একটা ছোট কাগজে অডিকোলোন নামটা লিখিয়া দাসীকে বলিল,—একবার খপ্ করে যা না ভাই, হিরণ-দিদিমণির কাছে, তাকে এই কাগজটা দিস্—দিলে সে যে-শিশি দেবে, সেইটে শীগগির নিয়ে আয় দিকি...

লেখা লইয়া দাসী বড় বাড়ীর দিকে ছুটিল। দীপ্তি অসহ্য চিন্তা-ভার বুকে লইয়া নিঃশব্দে সান্ত্বনার শিয়রে গিয়া বসিয়া রহিল!...

ঘণ্টাখানেক পরে মোটরে চড়িয়া ডাক্তার অভয় মিত্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁকে দেখিয়া দীপ্তি চমকিয়া উঠিল।...

অভয় মিত্র কহিলেন,—ওদের বাড়ীর চাকর গিয়ে বললে, বাগানের ছোট বাড়ীতে যাঁরা থাকেন, তাঁদের সেই ছোট মেয়েটির বড্ড অসুখ! তুমি কখনোই আমায় খপর দিতে বলনি! ...কারণ আমার কাছ থেকে কোন-কিছুরই তুমি প্রত্যাশা কর না! আমিও একটু ভাবছিলুম, আসবো কি না!...কিন্তু আজীবন অভ্যাস এমন দাঁড়িয়েছে যে কারো অসুখ, আর সে ডাক্তার চায়, এ খপর পেয়ে কখনো নিশ্চিন্ত বসে থাকিনি, তাই এসেছি। তাছাড়া আরো একটা কারণ আছে... স্বীকার করি। মেয়েটিকে আমি ভালো বেসে ফেলেছি! অরুণ না বুঝে অপরাধ করেছিল, কিন্তু তার মেয়ে...নেহাৎ কচি, সে তো কোন অপরাধে অপরাধী নয়! সে তো নির্ম্মল, নিষ্কলঙ্ক—তা, তোমার দেখতে দিতে কোন আপত্তি নেই?

এত চিন্তার মাঝেও দীপ্তি মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হইল। তার পর বলিল,—দয়া করে আমার মেয়েকে আপনি দেখে সারিয়ে দিন...

অভয় মিত্র সান্ত্বনাকে দেখিলেন: দেখিয়া কহিলেন—হঠাৎ জ্বর এত বেড়ে উঠলো?

দীপ্তি কহিল,—হঁ্যা।

দীপ্তি কহিল,—মাঝে মাঝে কেমন ভুল বকচে...

অভয় মিত্র কহিলেন,—আমার সঙ্গে আইস্-ব্যাগ আছে, বরফও কিছু এনেছি...মাথায় বরফ দাও··· একা না পারো, বলো, বাড়ী গিয়ে আমার কম্পাউণ্ডারকে আমি পাঠিয়ে দি...

দীপ্তি কহিল,—তার কি দরকার হবে?

অভয় মিত্র কহিল,—সে জানে-শোনে, অনেকটা তদ্বির করতে পারবে।

দীপ্তি কহিল,—তা'হলে দেবেন।

গাড়ী হইতে আইস্ব্যাগ ও বরফ আনাইয়া নিজেই ব্যাগে বরফ পূরিয়া অভয় মিত্র সান্ত্বনার মাথায় দিলেন। পাঁচ-সাত মিনিট পরে সান্ত্বনা চোখ মেলিয়া চাহিল, ডাকিল,—দাদু···

অভয় মিত্র সস্নেহে কহিলেন,—হঁ্যা দিদি, দাদু।···কেমন আছ এখন, বলতো?...বড্ড কষ্ট হচ্ছে—মাথায়, না?···

সান্ত্বনা কহিল,—হঁ্যা।

অভয় মিত্র কহিলেন,—এই যে ওষুদ দি, এবার ঘুমোও—ঘুমোলেই অসুখ সেরে যাবে।

তার পর অভয় মিত্র দীপ্তিকে কহিলেন,—খানিকটা জল গরম করে দাও—ওকে স্পঞ্জিং করিয়ে দি...

আদেশ-মত দীপ্তি জল গরম করিয়া আনিলে অভয় মিত্র সান্ত্বনার গা মুছাইয়া বেশ করিয়া গরম কাপড়ে তাকে ঢাকা দিয়া শোয়াইয়া চেয়ারে বসিলেন। চেয়ারের সামনেই টীপয়। টীপয়ের উপর অরুণের ফটো—ফটোর ফ্রেমে ফুল সাজানো। ফটোখানা একদৃষ্টে লক্ষ্য করিয়া তিনি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, পরে দীপ্তির পানে চাহিলেন। দীপ্তি তখন সান্ত্বনার মুখের পানে চিন্তায়-ভরা দুই চোখের দৃষ্টি লইয়া চাহিয়া আছে। তার সেই ম্লান মূর্ত্তি, আর সামনে ঐ ফুলে সাজানো অরুণের ছবি...কঠিন তপশ্চর্য্যা ও স্মৃতিপূজার মহিমায় পরিপূর্ণ তার মুখখানিতে অভয় মিত্র এমন আলোর দেখা পাইলেন...!

অভয় মিত্র কহিলেন,—মেয়েটাকে আর কষ্ট দাও কেন!... নিজেরা তো যথেষ্ট ভুগেচ···এটিকেও এই অভাব আর দারিদ্র্যের মধ্যে ফেলে রেখে, পরিচয়-হীনা অনাথার মত, এমন করে কষ্ট দাও কেন···!

দীপ্তি অভয় মিত্রর পানে চাহিল,—পরে শান্ত সহজ স্বরেই কহিল,—আমি মা। মা কখনো তার সন্তানকে ত্যাগ করতে পারে?···

অভয় মিত্র কহিলেন,—তা যদি না পারে, তা হলে বাপের বুক থেকে তার আদরের ছেলেকে কেড়ে নিতে গেছলে কেন!···কি

আশা নিয়ে কি সুখেরই না কল্পনা করেছিলুম···সব ভেঙে চুরমার হয়ে গেল !···পরে একটু থামিয়া কহিলেন,—তোমারই বা কি হলো !···তার চেয়ে আমার কথা যদি শুনতে···জগতে নাম থাকতো তবু···এ রকম নির্জ্জন বনবাসেও বাস করতে হতো না—মানুষের সঙ্গ ছেড়ে, মানুষের স্নেহ-মায়ার সব বাঁধন কেটে, এমন নিঃসঙ্গ, একলা...এই তো মেয়ের অসুখে অস্থির হয়ে পড়েছ, কে এখন দেখে তাকে··· !

সে কথা ঠিক ! তবু দীপ্তি কহিল—ও-সব পুরোনো কথা কেন তুলছেন ! ফেরার তো পথ নেই আজ···

অভয় মিত্র কহিলেন,—ফেরার পথ নেই !...ফেরার পথ সব সময়েই পড়ে আছে—তবে ফেরবার মন চাই !

দীপ্তি কহিল,—সমাজ আমায় ফিরে নেবে ?

অভয় মিত্র কহিলেন,—নেবে···তবে সমাজের বিপক্ষে বিদ্রোহিতা করেছিলে তুমি,—সে বিদ্রোহের প্রায়শ্চিত্ত করা চাই আগে !

দীপ্তি কহিল,—কি প্রায়শ্চিত্ত ?

অভয় মিত্র কহিলেন,—অনুতাপ করে সমাজের পায়ে মিনতি জানাতে হবে···

দীপ্তি কহিল,—কিন্তু কোথায় এ সমাজ···?

অভয় মিত্র কহিলেন,—তোমার সমাজ আমি, তোমার বাপ-মা, তোমার আত্মীয়-স্বজন ! তাঁদের কাছে অনুতপ্ত মনে ফেরার আকাঙ্ক্ষা জানালে তাঁরা বিমুখ হয়ে থাকবেন না !···

আমায় দিক থেকে বলতে পারি, আমি সব ভুলে যাবো। তোমায় অনুরোধ করছি, শুধু যদি এই মেয়েটীকে আমার ঘরে ফিরিয়ে দাও—তুমি তাকে দেখাশোনা করতে পারবে অনায়াসে...শুধু তোমার ঐ উন্মাদ মতগুলোকে ত্যাগ করতে হবে !

দীপ্তি কোন কথা কহিল না। অভয় মিত্র কহিলেন,—তুমি যে-মত নিয়ে এত ব্যথা পেয়েছ, তার ফলে কি লাভ হলো তোমার !...ক'জনকে তোমার মতে ফেরাতে পেরেছ ! ক'জন তোমার পানে গাঢ় সহানুভূতি নিয়ে চেয়ে দেখেচে ? কেউ না !...ভেবেচো, উপন্যাস লিখে দেশের লোককে তোমার দলে টানবে ! এর চেয়ে বাতুল আশা আর নেই। মানুষ উপন্যাস পড়ে ক্ষণেক তৃপ্তি পায়, তার চরিত্র-সৃষ্টিতে বৈচিত্র্য থাকে যদি ! তার উপর তোমরা যাকে মনস্তত্ত্ব বল, সেই মনস্তত্ত্বের লীলা যদি ফুটোতে পারো, তাহলে তার তারিফও লোকে করে—তা বলে তুমি যদি সনাতন সত্যকে উড়িয়ে দিতে চাও তো লোকে তাতে মুগ্ধ হবে না, হাসবে মাত্র !·· স্নেহ মায়া-মমতা, এগুলো সবার আগে, তার পর তোমার সমাজ-সমস্যা, ধর্ম্ম-সমস্যা। স্নেহ-মমতাই যদি ছিঁড়ে চুরমার করে দিলে তো রইল কি !···একটা কথা শুধু ভেবে দেখো,—তোমার হঠাৎ একটা খেয়ালের ঝোঁকে তুমি মা-বাপকে ত্যাগ করে চলে এসেছ !···এখন এই মেয়েটিকে আঁকড়ে ধরে পড়ে আছো, একে তোমার নিজের মনের ছায়াতেই বড় করে তুলবে, ভাবচো !

কিন্তু এই মেয়ে বড় হয়ে যদি তোমার স্নেহের শিকল ছিঁড়ে চলে যায় তো তোমার চোখে অশ্রু দেখে লোকে তখন বলবে, তুমিও তো বাপু তোমার মা-বাপকে এমনি কাঁদন কাঁদিয়ে এসেছ! বিদ্রোহীর কন্যা বিদ্রোহী হয়েছে!··· তখন···? শুধু নিজের মনটিকে নিয়ে থাকলে,—নিজের পানে চেয়ে আর কারো মনের পানে না চেয়ে,—সংসার থাকে না! তাছাড়া সমাজ-ধর্ম্ম, এ-সবেরও কোন অস্তিত্ব থাকে না!···মানুষের কাজই হলো, নিজের মনের সঙ্গে অপরের মনের সামঞ্জস্য রেখে চলা—greatest good of the greatest number—এইটাই লক্ষ্য হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি!···যাক্, এখন আর বকবো না। তবে তোমাদের কথা এক মুহূর্ত্তও আমি ভুলতে পারি না। যদি বা ভুলতুম, এই মেয়েটি আবার সে-সব কথা নতুন করে মনে জাগিয়ে তুলেছে! কতকগুলো কথা তো বলে ফেল্‌লুম, ভেবে দেখো একবার!····· আজ তাহলে আসি। বারোটা বাজে। আমি গিয়ে কম্পাউণ্ডারকে পাঠিয়ে দি···তারপর কাল সকালেই আবার আসবো। ভয় নেই—ভাববার মত কিছু হয়নি এখনো!

অভয় মিত্র চলিয়া গেলেন। দীপ্তি মেয়ের মাথায় আইস-ব্যাগ চাপাইয়া কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল।

— ২১ —

আট-দশদিন ভুগিয়া সান্ত্বনার জ্বর ছাড়িল। অভয় মিত্র এ কয় দিন দুইবার করিয়া তাকে দেখিতে আসিতেন, আসিয়া বহুক্ষণ থাকিতেন; এবং নানা কথায় তিনি অবগত হইলেন, দীপ্তি কি করিয়া সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহ করে। কম্পাউণ্ডার নিবারণ এ কয়দিন দিবারাত্র রোগীর সেবায় রত রহিল, শুধু দিনে দুইবার বাড়ী গিয়া আহার করিয়া আসিত। হিরণ এবং কিরণ দুই বোনও সর্ব্বদা দেখিতে আসিত, তাদেব মার শরীর এ কয়দিন একটু ভালো ছিল।

নিবারণ অনেক কথা বলিত—অরুণের জন্য অভয় মিত্রর প্রাণটা সর্ব্বক্ষণ কি যে হা-হা করে! বড় আশার ছেলে ছিল সে—তার উপর বাবুর প্রাণটা একেবারে ঢালা ছিল! তাঁর মৃত্যুর পর হইতে বাবু অসম্ভব গম্ভীর হইয়াছেন—তাঁর অমন যে ঝাঁজালো মেজাজ, তাও যেন জল হইয়া গিয়াছে! তার পর কয় বৎসর ধরিয়া দীপ্তির কত সন্ধানই তিনি করিয়াছেন! ছেলে হইল, না, মেয়ে হইল, জানিবার জন্য কি আকুলতা! ...যেদিন সানুর দেখা পাইলেন, সেদিন গৃহে ফিরিয়া চাকর-দাসীদের হঠাৎ এত টাকা বখশিস্ দিয়া ফেলিলেন যে সকলে অবাক হইয়া গেল। শুধু নিবারণকে তিনি বলিয়া ছিলেন, তার চিহ্নটুকু মিলিয়াছে! বাবুর চোখে নিবারণ সেদিন জলবিন্দুও দেখিয়াছিল!...অরুণের মৃত্যুতেও সে-চোখে

সে জল দেখে নাই!...শুনিয়া দীপ্তি সবেগে একটা নিশ্বাস ফেলিল। নিবারণ কহিল,—চলো না মা, বাড়ীতে!...তুমি একটিবার বললে বাবু বুকে করে সব নিয়ে যান্!...

দীপ্তি সান্ত্বনার উপর উদাস চোখের দৃষ্টি ন্যস্ত করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। যাওয়া চলে না—যাইবার উপায় নাই! তার যে পণ শিরোধার্য্য করিয়া এতদিন এত বিপদ মাথায় করিয়াও সকলের সঙ্গে যুঝিয়া আসিল, আজ মন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে বলিয়া সে পণটাকে চুরমার করিয়া এই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে মাথায় তুলিয়া লইবে!...না! তা হয় না গো! তাছাড়া অভয় মিত্র প্রায়শ্চিত্তের কথা বলিয়াছেন!...প্রায়শ্চিত্ত কিসের? সে তো অন্যায় কিছু করে নাই! পরাজয়ের লাঞ্ছনা গায়ে মাখিয়া আজ কৃপা-প্রার্থিনীর মত সে সবার সামনে দাঁড়াইবে! বিশেষ অভয় মিত্রর কাছে! সান্ত্বনাকে সারাইয়া তুলিয়াছেন, তিনি। তার জন্য কৃতজ্ঞতা...দীপ্তি সে কৃতজ্ঞতা অস্বীকার করে না! কিন্তু সেই দণ্ডে তার মনে পড়িল, কোদার্ম্মার সেই জন-হীন ঘর, শয্যায় লুণ্ঠিত অরুণের মৃত দেহ...অভয় মিত্র নির্ম্মম প্রাণে তা দেখিয়াও চলিয়া আসিলেন! সেই ভীষণ মুহূর্ত্তেও তাঁর রাগটাই এত বড় হইল...

দীপ্তির চোখ জলে ভরিয়া আসিল, আষাঢ়ের মেঘের মত! ...না, না, সে কথা সে জীবনে ভুলিবে না!...এ সংগ্রামে প্রাণ যদি তার ছেঁচিয়া পিষিয়া যায়, তবু সে অভয় মিত্রর কৃপার ভিখারিণী হইবে না! কি তুচ্ছ পরিশ্রমের কথা

তোলে সকলে !...নিজের হাতে খাটিয়া অর্থ উপার্জ্জন করায় কি সুখ, তা যে করিয়াছে, সে-ই জানে। সেখানে সেই অধীনতার শৃঙ্খল পায়ে আঁটিয়া পালিত পশুর মতই পড়িয়া থাকিবে—কোন কথা তার সেখানে খাটিবে না—মানুষ সম্বন্ধেও না!...

কিন্তু আবার যদি তার এমনি অসুখ হয়!...দীপ্তি ভয়ে শিহরিয়া উঠিল! তখন তো পরের মুখ চাহিতেই হইবে!

অভয় মিত্র কহিলেন, তার এই মত লইয়া সে করিল কি! কটা লোককে সে তার এ মতে দীক্ষিত করিতে পারিয়াছে! ...সত্য, কাহাকেও পারে নাই। গৃহ-কোণে বসিয়া শুধু সেই কথার ধ্যানেই সে জীবন কাটাইয়া দিল! একটা জীবনই সে যে এমন নীরবে কাটাইয়া দিল,...কে বুঝিবে, কেন! তবে ..? সে যে মস্ত-বড় আশা লইয়া এ পণকে বরণ ছিল, কি হইল তার? কি করিল সে? দু'খানা বই লেখা? অভয় মিত্র ঠিক বলিয়াছেন, দু'দণ্ড লোককে তা তৃপ্তি জোগাইয়াছে মাত্র! ...এই যে পৃথিবীর বুকে আলো আর মুক্তির বাণী যুগে যুগে কত মহাত্মা ঘোষিত করিয়াছেন, কয় জন তা শুনিয়াছে! প্রকাণ্ড যন্ত্রশালার মানুষ মৌন যন্ত্রের মতই চলিয়া ফিরিয়া জীবনগুলাকে শেষ করিয়া গিয়াছে!...তবে কি সে একটা দারুণ ভুলকে লইয়া নিজেকেই হত্যা করিতেছে!...স্নেহ-মায়া-মমতা-প্রীতির বাঁধন কাটিয়া মোহ-গহ্বরে অন্ধকারের মাঝেই এই দীর্ঘকাল কাটাইয়া দিয়াছে!...দীপ্তি একটা নিশ্বাস ফেলিল,—

যাহাই হউক, ফিরিতে গেলে আজ পরাজয়ের কালি মুখে মাখিয়া ফিরিতে হইবে!...

দীপ্তির প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিল!...এ যে চারিদিক হইতে সমস্যা জটিল হইয়া উঠিতেছে!...পরকে স্বার্থপর বলিয়া ত্যাগ করিয়া নিজের স্বার্থকেই সে প্রকাণ্ড করিয়া তুলিতেছে যে!...

বাহিরে অভয় মিত্রর স্বর শুনা গেল। তিনি ডাকিলেন,—সানু দিদি...

দীপ্তি ধড়মড়িয়া উঠিয়া পড়িল। অভয় মিত্র ঘরে ঢুকিয়া কহিলেন,—এই যে সানু জেগে আছে!...কোন কষ্ট হচ্ছে আর দিদি?

সানু হাসিয়া কহিল—না।

নিবারণ কাছেই ছিল; তার পানে চাহিয়া অভয় মিত্র কহিলেন,—নিবারণ, তুমি আমার গাড়ীতে করে যাওতো একবার—কিছু পথ্য আনা দরকার। ফর্দ্দ আছে, এই নাও—আর এই নাও টাকা। চট্ করে নিয়ে এসো। তুমি এলে আমি কামাখ্যা বাবুর স্ত্রীকে দেখতে যাবো—দেখে তবে ফিরবো।

তার পরে সানু পথ্য পাইলে ব্যবস্থা হইল, প্রত্যহ গঙ্গার ধারে সকালে-বিকালে অভয় মিত্রর গাড়ীতে চড়িয়া সে হাওয়া খাইবে! অভয় মিত্র আপনার প্রতি সানুর মনটিকে এমন অনুরক্ত করিয়া তুলিলেন যে তাঁকে না পাইলে সানু অস্থির হইয়া ওঠে।

সেদিন অভয় মিত্র আসিয়া বলিলেন,—সানু আজ আমার

ওখানে থাকবে, বাড়ীতে একটা কাজ আছে—সবাই ওকে দেখতে চায়!

দীপ্তি এ কথায় না বলিতে পারিল না। মেয়েকে যিনি এত বড় রোগ হইতে সারাইয়া তুলিয়াছেন, মেয়েকে যিনি এমন করিয়া যত্ন করিতেছেন, তাঁর সে স্নেহে আঘাত দিতে দীপ্তির মন কেমন কুণ্ঠিত হইল।

কিন্তু এই বিলাস-ঐশ্বর্য্য এমন মায়ায় সান্ত্বনাকে ঘিরিয়া ধরিতেছিল যে, সান্তুর শেষে মার এই ক্ষুদ্র কুটীরখানি নেহাৎ একটা ক্ষুদ্র বদ্ধ খাঁচার মত মনে হইতে লাগিল। এখানে না আছে খেলার সঙ্গী, না আছে মস্ত বারান্দা, না ছাদ! সেখানে দাতুর বাড়ীতে কত সঙ্গী, কত খেলার সাথী...আর কি সে আদর! সে সেখানেই থাকিবে।

মা শিহরিয়া উঠিল। ও-দিকটা এভাবে মেয়েকে তার কাছ হইতে কাড়িয়া লইতেছে!...মা মেয়েকে বুঝাইল, মেয়ে কিন্তু দুর্জ্জয় গোঁ ধরিল, সে যাইবে না, কিছু করিবে না!...

হিরণ আসিয়া এ ব্যাপার দেখিয়া দীপ্তির পানে চাহিল, কহিল,—মা আপনাকে ডেকেছেন। অনেক কথা আছে!

দীপ্তি কহিল,—যাবো। দেখ্ দেখি এখন মেয়ের বায়না...

হিরণ কহিল,—তা দু'দিন পাঠিয়ে দিন না। পরের কাছে যাচ্ছে না তো!...

দীপ্তির ভাবনা হইল। একটু সে অসতর্ক হইয়াছে, অমনি সেই ফাঁকে চারিদিককার বাঁধন এমন শিথিল হইয়া গেছে!

হিরণের মা বলিলেন,—ডাক্তার বাবুর কাছে সব কথা শুনেচি, মা!...ওঁর যখন আগ্রহ হয়েছে, সব নিয়ে যাবেন, তখন অমত করো না। তাঁর কাছে যাও—এখানে আলাদা থেকো না। তোমার বয়সও এমন হয়নি যে আত্মজন সবাইকে ছেড়ে এমনি বনবাসে একলা পড়ে থাকবে!

দীপ্তি চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সকলের মুখে ঐ এক কথা!

মা বলিলেন,—এই যে মেয়ের এত-বড় অসুখ হলো—ভাগ্যে উনি ছিলেন!...তুমি মেয়ে মানুষ, যতই লেখাপড়া জানো, যতই সব দেখো-শোনো, তবু পুরুষ পুরুষ, মেয়ে মেয়েই! ঝড়-ঝাপটায় পুরুষের সাহায্য না পেলে নিস্তার পাওয়া যায় না! মেয়ে-মানুষ স্নেহ-মায়াই দিতে পারে। পৃথিবীতে আরো যে বড় বড় বিপদ, তাতে মাথা দিয়ে যোঝা মেয়ে-মানুষের কাজ নয়! ...যার পুরুষ অভিভাবক নেই, সে কি করবে, বল...কিন্তু তোমার যখন সব আছে, এত বড় সহায়, তখন তা ত্যাগ করে অভিমানটাকেই শুধু নিয়ে থেকো না।...সংসারে যুদ্ধ করবে পুরুষ, আর তারা যুদ্ধ করে শ্রান্ত হয়ে ফিরলে মেয়েরা স্নেহে-মায়ায় তাদের সে শ্রান্তি ঘুচিয়ে দেবে।

হিরণ কহিল,—রবিবাবুর একটি চমৎকার কবিতা আছে,

এসো এসো তুমি নারী
আনো তব হেম-ঝারি!......

দীপ্তি কহিল,—কিন্তু মেয়েরাও তো মানুষ,—তাদের মনও

পুরুষের মনের মতই, ব্যথায় কাতর হয়, আনন্দে দীপ্ত হয়ে ওঠে…এতটুকু তফাৎ নেই!

মা বলিলেন,—কিন্তু দুয়ে মিলে এক হতে হবে তো। পুরুষ আর নারীর সৃষ্টি যে হয়েছে, দুজনেই কুড়ুল কোদাল ধরে মাটী কাটতে যাবার জন্য নয়!…দুজনের যদি একই কাজ হতো, তাহলে শরীরের গড়নও দুজনের এক হতো,—মেয়েদের মত পুরুষও তাহলে শিশুর জন্ম দিত, শিশুকে পালন করতো!… মেয়েরা এখন এই যে একটা গোঁ ধরেছে, যে, সর্ব্বত্র পুরুষের সঙ্গে সমান চালে চলবে, সব বিষয়ে সাম্য চাই, এ তো ঠিক নয় মা। আমি তো বুঝি, শিক্ষা দুজনের সমান চাই বটে! আর স্ত্রী যেমন স্বামীকে মানবে, শ্রদ্ধা করবে, স্ত্রীকেও স্বামীর তেমনি মানা চাই! আর সাম্য মানে আমি এই বুঝি, দুজনে মিলে-মিশে সবদিকে সামঞ্জস্য রেখে চলবে! হয়তো এ আমার ভুল,—তবু ঠিকটা যে আজকালের মেয়েরাই বলচে, তাও তো মনে-প্রাণে মানতে পারছি না! পর্দ্দার কড়াকড়ি বদ, এও আমি মানি—তবে পুরুষের মত মেয়েরাও যে ভিড়ের মাঝে অকুতোভয়ে অসঙ্কোচে বুক দিয়ে গিয়ে পড়বে, তাও আমি সহ্য করতে পারি না।…তোমার এই মেয়েটি আছে—তাকে দেখবার আপন-জনও আছে, তার বিপদ-আপদ আছে… তার মুখ চেয়ে তোমায় আত্মজনকে মেনে চলতেই হবে।…

পরের দিন অভয় মিত্রর সঙ্গে বেড়াইতে গিয়া সান্ত্বনা বাড়ী ফিরিল না। অনেক বেলায় নিবারণ আসিয়া কহিল,—সান্তু

দিদি বললে, আজ এখানে আসবে না।...তাই কর্ত্তাবাবু আমায় পাঠিয়ে দিলেন, খপর দিতে, আপনি হয় তো ভাববেন! ...সে বেলা হলে আসবে। কর্ত্তাবাবু কত বললেন, মা ভাববে, মার মন কেমন করবে! তা তাঁর বুকে উঠে গলা জড়িয়ে ধরে বললে, আমি সেখানে যাবো না, এখানে খেলা করবো।... খেলার সাথী পেয়েছে সেখানে, শিশুর মন!...আর সবাই ওকে এত ভালোও বাসে!

ঠিক! দীপ্তি ভাবিল, তাদের সে ভালবাসা এত-বড় যে মার ভালবাসা তার পাশে দাঁড়াইতে পারে না! হায়রে, সেকালে লোকে যে বলিত, ছেলেমেয়ে যাদের, তাদেরই থাকে! মা শুধু পেটে ধরিয়া পালন করিয়াই মরে, বড় হইলে মার পানে সন্তান ফিরিয়াও চায় না!...অমনি নিজের কথা মনে জাগিল!... মা-বাপকে সেও তো ছাড়িয়া আসিয়াছে!...এ কি তারি শাস্তি তবে?...

সারাদিন দীপ্তি নানা কথা ভাবিতে লাগিল। ক্ষিতীশ আসিয়া তাড়া দিয়া গেল, নূতন উপন্যাসের কি হইল!

দীপ্তি কহিল,—সানুর অসুখ হয়ে অবধি আর লিখতে পারি-নি!

ক্ষিতীশ কহিল,—এবার শেষ করে ফেলুন!...বলিয়াই সে ঘরের চারিধারে চাহিয়া কহিল,—সানু কোথায়? কামাখ্যা বাবুর বাড়ী গেছে বুঝি?

দীপ্তি কহিল,—না।

ক্ষিতীশ কহিল,—স্কুলে...? না, আজ তো রবিবার!...

দীপ্তি কহিল,—ডাক্তার মিত্রর ওখানে গেছে।

ক্ষিতীশ কহিল,—ও, আপনার শ্বশুর-মশায়ের কাছে!

দীপ্তি কহিল,—হ্যাঁ।

ক্ষিতীশ কহিল,—উঠি তাহলে···ক্ষিতীশ যাইবার উদ্যোগ করিল।

দীপ্তি কহিল,—যাচ্ছেন?

লজ্জায় কুণ্ঠিত হইয়া ক্ষিতীশ কহিল,—একটু দরকার আছে। মাধুরী ধরেছে, তাকে বায়োস্কোপ দেখাতে নিয়ে যেতে হবে!··· তাই তাড়া! দোকান হয়ে একবার যেতে হবে...

ক্ষিতীশ চলিয়া গেল। সে চলিয়া গেলে দীপ্তি ভাবিল, সেই ক্ষিতীশ! তার প্রতি কি অসহ্য প্রেমেই প্রাণটা বৈরাগ্যে ভরাইয়া তুলিতেছিল, তারপর তার হাত ধরিয়া যেমনি বাঁধা গণ্ডীর মধ্যে দীপ্তি তাকে পুরিয়া দিল, অমনি শান্ত বালকের মত সেই গণ্ডীতে কেমন সে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে! সকলেই নিজেকে লইয়া বেশ সহজ ভঙ্গীতে জীবনের পথে চলিয়াছে, সেই শুধু সারা জীবন এমনি যুদ্ধ করিয়া, প্রচণ্ড কোলাহলে জর্জ্জরিত হইয়া দিন কাটাইতেছে!···সান্ত্বনার কথা মনে হইল,—ঠিক তো! আজ যদি দীপ্তি মারা যায়, কাল তাকে কে দেখিবে? কোথায় সে দাঁড়াইবে?

চিন্তার অজস্র সূত্র কোথা হইতে উঠিয়া প্রচণ্ড একটা জটিলতার সৃষ্টি করিয়া তুলিল!···তার জন্য সান্ত্বনাও ভাসিয়া যাইবে? তার এই পুষ্পিত জীবনটুকু...?

দীপ্তি একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল, ফেলিয়া ভাবিল, চারিদিকে যখন এক সুর উঠিয়াছে, তখন তাই হোক! সে কিন্তু পুরানো গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে লইয়া আর ফিরিতে পারিবে না! তার ভাগ্যে যা ঘটে, ঘটুক! তবে সে যেমন কারো বাধা-নিষেধ মানে নাই, তেমনি সান্ত্বনাকেও কোন বাধা-নিষেধে ঘিরিয়া রাখিবে না।

অসহ্য উচ্ছ্বাসের ভরে দীপ্তি কাগজ-কলম লইয়া চিঠি লিখিতে বসিল। অভয় মিত্রকে সে চিঠি লিখিল,—

সান্ত্বনার নামে একটা চিঠি দিলাম—বড় হইলে তাকে দিবেন! আর আপনার কথাই আমি রক্ষা করিয়াছি...সানুকে আপনার হাতেই দিয়া গেলাম। তার সব ভার আপনার। আমি চলিলাম। কোথায়, জানি না! তবে এটা বুঝিতেছি, আমিই সানুর জীবনে মস্ত বাধা! সে বাধা আজ দূর হইল!

দীপ্তি।

সান্ত্বনাকে দীপ্তি লিখিল,—

সান্ত্বনা, মা,

মাকে তোমার আর দরকার নাই! মার ঘরে দারিদ্র্য, অভাব! আর তোমার আপন-জন তোমার পিতামহ... তাঁর ওখানে অজস্র সুখ, ঐশ্বর্য্য! মাকে তাই ভুলিয়াছ! ভুলিয়াই থাকো। মার অভাব তুমি আর বুঝিবেও না!

যখন বুঝিবে না, তখন আমি আর মিছা গণ্ডী টানিয়া

তোমায় বাঁধিয়া রাখি, কেন! আমি একদিন মনের গতি রোধ করিতে না পারিয়া সব ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলাম,—তুমিও আজ মনের গতি রোধ করিতে না পারিয়া নিজের পথে যাইতে চাহিয়াছ! তাই যাও—আশীর্বাদ করি, সুখী হও!

আমি বুঝিয়াছি, ত্যাগে বাঁচা যায় না, মানুষ বাঁচিতে পারে না। আর পারে না বলিয়াই যার আপন-জন নাই, সে পরকে আপন করিয়া সুখে থাকিতে চায়! আমি এ সুখ চাহি নাই। আমার লক্ষ্য ছিল খুব-বড়র দিকে! কিন্তু তা ঐ লক্ষ্য মাত্র! তা পাইবার জন্য কি করিলাম, কি-বা পাইলাম!

তবু একটা কথা কিছুতেই মানিতে পারি না—সে এই সমাজের স্বেচ্ছাচার! সমাজকে আমি মানি না। মনে করিয়ো না, সমাজের ভয়ে চলিয়া গেলাম কোন্ নিরুদ্দেশের পথে! তা নয়। সমাজের যে মিথ্যা আচার চারিদিক হইতে মানুষের মনকে পিষিয়া মারিতেছে, সে মিথ্যা আচারের দাস্য কোনদিন করিয়ো না,মার এই শেষ কথাটুকু রক্ষা করিয়ো! তাহা হইলেই মার এ ত্যাগ সার্থক হইবে!

এ চিঠি আজিকার জন্য লিখিতেছি না, বড় হইয়া সব যখন বুঝিবে, তখন এ চিঠি পড়িয়ো!...

আমি যখন সব ত্যাগ করিতে পারিয়াছি, তখন তোমাকেও ত্যাগ করা আমার পক্ষে বিচিত্র নয়!...যুঝিয়া শ্রান্ত হইয়াছি! তোমার জন্যই যুঝিয়াছি। কিন্তু আমার কাছে যখন তোমার সুখ নাই, তখন আর মিথ্যা যুঝিয়া মরি কেন!

যে-মতের পায়ে আপনার সমস্ত আমি বলি দিয়াছি, তার কিছুই করিতে পারিলাম না! তোমার পিতামহ ঠিক বলিয়াছেন, ঘরের কোণে বসিয়া মতটাকে আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিলে কোন ফল হয় না।…আজ বুঝিতেছি, জন-বল, অর্থ-বল না থাকিলে কোনো মতকে খাড়া করা যায় না, সমাজের অতি-ছোট একটা ত্রুটিও শোধরানো যায় না!

এ নিষ্ফলতায় ক্ষোভ নাই!…এর পর যদি পর-জন্ম থাকে, তাহা হইলে আবার আসিব। আসিয়া এই মত লইয়া প্রাণপণে আবার সংগ্রাম সুরু করিব! জন্ম-জন্ম এই পণ লইয়া আসিব,—মিথ্যা লোকাচার ভাঙ্গিয়া মানুষে-মানুষে সত্যকার সম্পর্ক, সমবেদনা-সহানুভূতিতে-ভরা সার্থক সম্পর্ক গড়িবার সঙ্কল্প লইয়া যুঝিব!…

আজ এই অবধি!…কোথায় যাইব, জানিনা। তবে এখানে আর নয়। তুমি সুখী হও, এই আশীর্ব্বাদ করি। আমি যে যুদ্ধ করিয়া ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছি, তেমন যুদ্ধ তোমায় না করিতে হয়।

মা কি সহিয়াছে আর কেন সহিয়াছে, সেটুকু বুঝিবার চেষ্টা করিয়ো। তোমার মা সতী—ইহাও জানিয়ো। এ জানিয়া মার কথা বিরলে কখনো ভাবিয়া দু ফোঁটা চোখের জল ফেলিয়ো—মার এই শেষ মিনতি।

মা।

… … …

চিঠিখানা অভয় মিত্রর হাতে পৌঁছিল সন্ধ্যার পূর্ব্বক্ষণে। চিঠি পাইয়া সান্ত্বনাকে লইয়া তিনি মাণিকতলার বাগান-বাড়ীতে আসিয়া দেখেন, জিনিষপত্র যেমন তেমনি পড়িয়া আছে,...শুধু দীপ্তি নাই!...আর সেই ফটোখানা...? সেখানাও নাই!

দাসীকে প্রশ্ন করিলে দাসী কহিল, মা পশ্চিমে গিয়াছেন। এ সব জিনিষ-পত্র সে আগুলিয়া রহিয়াছে। মা বলিয়া গিয়াছেন, ডাক্তারবাবু যদি এ-সব তাঁর ওখানে লইয়া যান তো তাই হইবে। আর যদি না লইয়া যান্, তাহা হইলে তাকেই সব লইতে বলিয়াছেন।

সান্ত্বনা মাকে দেখিতে না পাইয়া কাতরভাবে অভয় মিত্রর পানে চাহিয়া কহিল,—মা ...?

অভয় মিত্র তাকে আদর করিয়া বলিলেন,—মা পশ্চিমে গেছে। ভয় কি সান্থু? যদ্দিন মা না ফেরে, আমার কাছে থাকবে তুমি! দাসীকে কহিলেন,—এ সব জিনিষ আগ্‌লে রাখ্ তুই—আমার লোক এসে নিয়ে যাবে কাল।...আর তোকে সে এর জন্য বখশিসও দিয়ে যাবে।...তোর মাইনে সব পেয়েছিস্?

দাসী কহিল,—হ্যাঁ। মা সকলকে সব চুকিয়ে দিয়ে গেছেন,—কারো সিকি-পয়সা পাওনা রেখে যান্ নি।

অভয় মিত্র একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন—সান্ত্বনা কাতর নয়নে তাঁর মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

শেষ

# এই লেখকের লেখা অন্য বই

## উপন্যাস

| | | | |
|---|---|---|---|
| আঁধি | ... | ... | ২॥০ |
| কাজরী | ২য় সংস্করণ | ... | ১॥০ |
| দরদী | ২য় সংস্করণ | ... | ১৲ |
| সোনার কাঠি | ২য় সংস্করণ | ... | ১৲ |
| প্রেয়সী | ৩য় সংস্করণ | ... | ১৲ |
| ছোট পাতা | ... | ... | ১॥০ |
| বাবলা | ... | ... | ১॥০ |
| নিরুদ্দেশের যাত্রী | ... | ... | ১॥০ |
| মাতৃঋণ | ... | .. | ১॥০ |
| নবাব | ... | ... | ২॥০ |
| বন্দী | ২য় সংস্করণ | ... | ১৲ |
| নেপথ্যে | ... | ... | ॥০ |
| স্ত্রীবুদ্ধি | ... | ... | ১৸০ |
| পথের পথিক | ... | ... | ।৵০ |
| কালোর আলো | ... | ... | ১॥০ |
| লাল ফুল | ... | ... | যন্ত্রস্থ |
| নিশীথ-দীপ | ... | ... | যন্ত্রস্থ |
| পিয়ারী | ... | ... | যন্ত্রস্থ |

## ছোট গল্প

| | | | |
|---|---|---|---|
| শেফালি | ২য় সংস্করণ | ... | ৸০ |
| পরদেশী | ২য় সংস্করণ | ... | ১৲ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| নির্ঝর | ২য় সংস্করণ | ... | ১৲ |
| পুষ্পক | ... | ... | ১৲ |
| মণিদীপ | ... | ... | ১৲ |
| বৈকালি | ... | ... | ॥০ |
| পিয়াসী | ... | ... | ১।০ |
| মৃণাল | ... | ... | ১।০ |
| তরুণী | ... | ... | ১।০ |

## ছেলেমেয়েদের গল্প

| | | | |
|---|---|---|---|
| সাঁঝের বাতি | ... | ... | ॥০ |
| ফুলের পাখা | ... | ... | ॥০ |
| তারার মালা | ... | ... | ॥০ |
| চাঁদের আলো | ... | ... | ॥০ |

## নাট্য-গ্রন্থ

| | | |
|---|---|---|
| যৎকিঞ্চিৎ...ষ্টারে অভিনীত | ... | ॥০ |
| দশচক্র...ষ্টারে অভিনীত | ... | ।৵০ |
| গ্রহের ফের...কোহিনূরে অভিনীত | ... | ।০ |
| দরিয়া...মিনার্ভায় অভিনীত | ... | ॥০ |
| রুমেলা...মিনার্ভায় অভিনীত | ... | ॥০ |
| শেষ বেশ...ষ্টারে অভিনীত | ... | ।৴০ |
| হাতের পাঁচ...মিনার্ভায় অভিনীত | ... | ।৴০ |
| পঞ্চশর...ষ্টারে অভিনীত | ... | ।৵০ |

সকল গ্রন্থই কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে; ও ৮২।৩ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে গ্রন্থকারের নিকট পাওয়া যায়।